

শ্রীমদ্ ভেনু দেয়ার

ঈশ্বাজ নান

আগাথা ব্রিটিশ



সূচিপত্র

০১.....	3
০২.....	32
০৩.....	62
০৪.....	86
০৫.....	100
০৬.....	118
০৭.....	134
০৮.....	146
০৯.....	166
১০.....	197
১১.....	212
১২.....	227
১৩.....	241

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা । অষ্টাদশ অধ্যায় । উপনিষৎ

১৪.	252
১৫.	266
১৬.	285

০১.

ট্রেনটা ছুটে চলেছে হাওয়ার বেগে.....

প্রথম শ্রেণীর কামরার এক প্রান্তে বসে আছে মিঃ ওয়ারথ্রেভ, সদ্য অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি। হাতে জ্বলন্ত সিগার, চোখের আগ্রহ দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ দি টাইমস-এর রাজনৈতিক সংবাদ-স্তম্ভে।

সিগারের লম্বা একটা টান দিয়ে ভোলা জানালা পথে বাইরে চোখ মেলে তাকালেন ওয়ারথ্রেভ। সবুজ ঘাসে ছাওয়া মাঠের পর মাঠ। মাঠ পেরিয়ে দূরে, বহুদূরে ভূমিতে মাথা নুইয়ে আকাশ যেন বলছে, প্রণামি তোমায়। দৃশ্যটা অপূর্ব। যেন অকৃপণ হাতে সব সৌন্দর্য বিলিয়ে দিয়েই প্রকৃতি খুশি সেখানে। সামারসেটের এমন প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী সত্যিই অতুলনীয়।

কজি ঘড়ির ওপর দৃষ্টি দিলেন ওয়ারথ্রেভ। পোঁছতে এখনো ঘণ্টা দুয়েক বাকি। তার গন্তব্যস্থল নিগার দ্বীপ। দ্বীপটা যেন রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। প্রায় প্রতিটি মানুষের মুখে মুখে শুধু একটি নাম নিগার দ্বীপ। আর খবরের কাগজগুলোই বা কি? দ্বীপটা নিয়ে কাগজগুলো কদিন কত রোমাঞ্চকর লেখাই না লিখল। সেই সব লেখাগুলো এক এক করে ভাবতে বসলেন ওয়ারথ্রেভ। সেই কোটিপতি আমেরিকাবাসী, সমুদ্রের

জলে ইয়াট চালাতে যিনি ভালোবাসেন, এই মুহূর্তে তার নামটা ঠিক মনে করতে পারলেন না ওয়ারথ্রেভ। সে যাইহোক এই দ্বীপের তিনিই প্রথম মালিক হন। ডিভনের উপকূলে ছবির মতো একটা বিরাট বিলাসবহুল প্রাসাদ বানালেন তিনি ফুর্তিতে কাটানোর জন্যে-এ সব খবরই খবরের কাগজগুলোতে বেরিয়েছে। আরো আছে, লেখার মতো খোরাকও বটে। সেই কোটিপতি আমেরিকাবাসীর ভাগ্য বোধ হয় নেহাতই খারাপ ছিল, তা না হলে তার, তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীটি কেনই বা টিকলো না বেশিদিন। ভদ্রলোক মনের দুঃখে তার সেই সাধের দ্বীপটি ছেড়ে একদিন হঠাৎ উধাও হয়ে গেলেন।

এরপর সেই দ্বীপের মালিক হয়ে এলেন অখ্যাত একজন যার নাম মিঃ ওয়েন। তার ভাগ্যে বাড়িটা সহ্য হলো না। একটা মাসও পূর্ণ হলো না, খবরের কাগজগুলো খবরের মুখর হয়ে উঠল। নতুন করে সত্যি-মিথ্যা মেশানো যত সব আজগুবি খবর ছাপালো, যার মধ্যে বেশির ভাগই থাকত সব কেছা কাহিনী। খবরের কাগজের সূত্রেই জানা গেলো হলিউডের বিখ্যাত অভিনেত্রী মিস গ্যাব্রিয়েল টার্ল মাস কয়েকের জন্যে নিশ্চিন্তে ছুটি কাটাতে এসেছেন এই দ্বীপে। তাকে ঘিরে শুরু হলো খবরের কাগজগুলোর জল্পনা-কল্পনা। নানান গবেষণা। কোন এক সাংবাদিক লিখলেন, এতদিনে বুঝি এবার যথার্থ এক মধুকুঞ্জে পরিণত হলো নিগার দ্বীপটি। কোথায় হলিউডে চিত্র সাংবাদিকদের প্রশ্রবানে বিদ্ধ হওয়ার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে নিগার দ্বীপে নির্ঝঞ্ঝাট ছুটি উপভোগ করবেন গ্যাব্রিয়েল। আর হতে দিলো না খবরের কাগজগুলো! কোন কোন কাগজ আবার একটা চাঞ্চল্যকর খবরের বোমা ফাটালো-ইংল্যান্ডের রাজপরিবারে জনৈক লর্ড নাকি এই দ্বীপটির বর্তমান মালিক। আবার কারোর মতে সেই নামী দামী লর্ডকে পঞ্চশর বিদ্ধ করতে এমন একটা আদর্শ জায়গা নাকি সারা বিশ্বে আর কোথাও নেই।

শোনা যায় লর্ড নাকি এতদিনে জনৈক যুবতীর প্রেমে ভালোবাসায় আবদ্ধ হয়েছেন, এবং খুব শীগগীর তাকে বিয়ে করছেন। তিনি বিয়ের পর তার নবপরিণীতা বধূকে সঙ্গে নিয়ে মধুচন্দ্রিমা যাপন করবেন। কিন্তু কয়েকদিন যেতে না যেতেই আর একটা কাগজ বোমা ফাটালো, হ্যাঁ এবার সত্যিকারের বোমা ফাটানোর মতো ব্যবস্থাই বটে। সেই কাগজের খবর হল এই রকম জনৈক লর্ড ও তার নবপরিণীতা বধূর মধুচন্দ্রিমা যাপনের জন্যে নিগার দ্বীপের সেই প্রাসাদটা কেনা নয় আসলে ব্রিটেনের নৌবাহিনীর প্রতিরক্ষা গবেষণা দপ্তর সেখানে নতুন ধরনের অস্ত্র পরীক্ষা চালাবার উদ্দেশ্য নিয়ে সেই দ্বীপটি এবং প্রাসাদটা কিনেছে। পরিশেষে শেষ সংবাদ সূত্রে আর একটি কাগজ লিখেছে, বিশ্বস্ত সূত্রে আমরা জানতে পেরেছি, হলিউডের সেই অভিনেত্রী মিস্, টার্নের কোন এক স্ত্রাবকই নাকি এই দ্বীপটি তাকে কিনে দিয়েছেন। প্রেমিকের এই মূল্যবান উপহারটি পেয়ে প্রিয়া নাকি দারুণ খুশী।

সেই সময় কাগজগুলো এমনি কত খবরই না ছাপিয়েছিল। তার মধ্যে কোনটা সত্যি আবার কোন্টাই বা মিথ্যে যাচাই করার প্রয়োজন বোধ কেউ করেননি। অমন সব মুখরোচক খবর পড়েই সন্তুষ্ট সবাই, এবং ওয়ারথ্রেভও।

ওয়ারথ্রেভ তার চিন্তার ইতি টেনে এবার তার কোটের পকেট থেকে অতি সন্তর্পণে চিঠিখানি বার করে চোখের সামনে মেলে ধরলেন। হাতের লেখা অতি জঘন্য, তার ওপর আবার অস্পষ্ট, অনেক জায়গায় আবার ভাল করে বোঝাই যায় না। তবে সেই বোঝা না বোঝার সমস্যাটা কাটিয়ে উঠে কোনক্রমে চিঠির বক্তব্যটা পাঠোদ্ধার করলেন ওয়ারথ্রেভ :

প্রিয় লরেন্স,

কতদিন তোমার কোন খবর নেই বল তো? যাইহোক, নিগার দ্বীপে তোমার কিন্তু আসা চাই-ই। তোমার নিশ্চয়ই খুব ভাল লাগবে, ভারী চমৎকার জায়গা। চিঠিতে বোঝানো যাবে না। চলে এসো এখানে। নিজের চোখেই প্রত্যক্ষ করে যাও। সেই যে তোমার হারিয়ে যেতে নেই মানা। তোমার সঙ্গে দুজনে মিলে স্মৃতিচারণ করা যাবে। প্রকৃতির নির্মল পরিবেশে রোদুরে পিঠ রেখে বালুকাবেলায় শরীরটাকে এলিয়ে দিয়ে আকাশ পানে উন্মুখ হয়ে, তার একটা আলাদা মাদকতা আছে। প্যাডিংটন থেকে বারোটা চল্লিশের ট্রেন ধরে রওনা হবে। ওকব্রীজ স্টেশনে আমাদের দেখা হবে.....

তোমার বিশ্বস্ত কনস্টান্স কালসিংটন

লেডি কনস্টান্স কালসিংটনের সঙ্গে শেষ কবে যেন দেখা হয়েছিল, স্মৃতির পাতা উল্টে খেয়াল করার চেষ্টা করলেন ওয়ারথ্রেভ.....সাত বছর? না সাত নয়, আট-হা মনে পড়েছে। আট বছর আগে সেই শেষ দেখা তার সঙ্গে। একটার পর একটা দেশ ঘুরে বেড়াচ্ছে সে তখন। তখন সে চলেছে ইতালির পথে, সেখানকার রোদে পিঠ দিয়ে সে তার শরীরটা চনমনে করে তুলতে চলেছে। গায়ের রঙ তামাটে করে তোলা, এবং সেই সঙ্গে আকর্ষণ কন্টাডিনি (মদ) পান করাটাও উদ্দেশ্য ছিল তার। তারপত্র ওয়ারথ্রেভ খবর পেয়েছিলেন কালসিংটন সেখান থেকে পাড়ি দেয় সিরিয়ায়, সেখানকার মরুভূমির রোদ নাকি আরো উজ্জ্বল আরো মিষ্টি। এ ছাড়া আরো একটা আকর্ষণ ছিল বেদুইন। তাদের সঙ্গে মেলামেশা করার ফাঁকে তার ইচ্ছা ছিল, প্রকৃতির সঙ্গে সার্বিক একাত্মতা অনুভব করা-সেইরকম একটা মানসিকতা নিয়েই গিয়েছিল সেখানে সে।

লেডী কনস্টান্স কালসিংটন। বড্ড বেশী খামখেয়ালী। টাকা-পয়সার কথা চিন্তা করেনি সে। তা না হলে এতো দাম দিয়ে এমন একটা দ্বীপ কিনে ফেলল সে? মনের জোর থাকা দরকার, মেজাজ থাকা দরকার। ওয়ারগ্রেভ তখনো ভেবে চলেছেন। নিজের মনেই বলে উঠলেন তিনি, মহিলাটি সত্যিই যেন এক রহস্যময়ী। একটা দ্বীপের মধ্যে এমন একটা বিলাসবহুল প্রাসাদ আর কেই বা কিনতে যাবে? তাকনস্টান্সের পক্ষেই সম্ভব।

নিজের যুক্তির সমর্থনে ট্রেনের পুলিশের সঙ্গে তর্ক করতে করতেই ওয়ারগ্রেভের চোখের চাহনি কেমন যেন একটু ঘোলাটে হয়ে উঠতে থাকে। এদিকে খোলা জানালা পথ দিয়ে দমকে দমকে আসা সেই মিঠে বাতাস, ভালভাবে উপভোগ করার আগেই কোথা থেকে যে রাজ্যের ঘুম এসে জড়ো হল তার দুচোখে, সে খেয়াল তার ছিল না। তার চোখের পাতা ভারী হয়ে এলো, ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি।

ওদিকে তৃতীয় শ্রেণীর ছোট একটি কামরায়, যাত্রী মোট ছজন। মিস্ ভেরা ক্লেথর্ন তাদের মধ্যে একজন। জানালা পথে এতক্ষণ নৈসর্গ শোভা দেখছিল ভেরা। শেষে বড় একঘেয়ে লাগল তার কাছে। সেই একই দৃশ্য। ভাল না লাগা চোখ দুটো বুজিয়ে পিছনের আসনে হেলান দিয়ে বসল।

আজ গরমও পড়েছে প্রচণ্ড, অসহনীয়। রোদের তাপে নীরস পাথুরে মাটি গনগনে অঙ্গারের মতো দেখাচ্ছে। তবে নিগার দ্বীপে এতটা গরম হবে না বলেই মনে হয়। চারদিকে সমুদ্র, মাঝখানে নিগার দ্বীপ। তাছাড়া শোনা যায়, সেখানকার আবহাওয়া নাকি

এমনিতেই ঠাণ্ডা, এবং বেশ মোলায়েম। সেই সুন্দর মনোরম আবহাওয়ায় সমুদ্রের শীতল জলে গা ভাসিয়ে দেওয়ার জন্যে প্রায় সব ট্রেন যাত্রীই অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করে রয়েছে। কখন, কখন তাদের ট্রেনটা ওকব্রীজে গিয়ে পৌঁছবে।

বেশ কিছুদিন ধরে কাগজগুলো একটানা কতো গুজবই না রটালো, সত্যি-মিথ্যে মেশানো একটার পর একটা আধা সত্য কিংবা স্রেফ বানানো কাহিনী কাগজে ছাপিয়ে সব না হলেও অন্তত কিছু করতে পেরেছে বৈকি। ভেরা ক্লেথনও তাদের ব্যতিক্রম নয়। তবে বুদ্ধিমতী মেয়ে সে। সব কিছুর চুলচেরা বিচার হয় তার মনের নীরিখে, তার অনুমানের দাঁড়িপাল্লায়, ফুট করে কোন ব্যাপারে বিরূপ সমালোচনা করা, কিংবা কারোর সম্পর্কে ভাসা ভাসা প্রশংসা শুনে সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছ্বাস প্রকাশও করেনা সে কখনো। ঠাণ্ডা মাথায় সব কিছু ভাল করে দেখে শুনে তবেই সে তার মতামত প্রকাশ করে থাকে। গোড়ায় এই নিগার-দ্বীপ সম্পর্কে তার মধ্যে কোন আগ্রহই দেখা যায় নি। অথচ ঘটনাচক্রে সেই নিগার দ্বীপেই যেতে হচ্ছে তাকে শেষ পর্যন্ত। এবার আর শোনা কথা নয়, পরের মুখে ঝাল খাওয়া নয় একেবারে নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পাওয়া। দেখা যাক এমন একটা সুযোগ হাতে পেয়ে ভেরা মনে মনে ঠিক করে ফেলে কিভাবে এই কেসটা নিয়ে গবেষণা চালাবে সে। সঙ্গে সঙ্গে সে আবার ভাবে, কি মহার্ঘ বস্তু লুকিয়ে আছে সেখানে কে জানে।

সত্যিই ভাগ্যটাও হেলাফেলা করার মতো নয়। আর ভাগ্য সুপ্রসন্ন না হলে এমন একটা লোভনীয় চাকরী কজনেরই বা কপালে জোটে। সাধারণত ছুটির দিনের চাকরী মানেই তো এক গাদা বাচ্চাকাচ্চার ঝঙ্কি সামলান, চূড়ান্ত ঝামেলা, সেসব কিছুই নয়। স্রেফ

ছুটির দিনে সময় মারফিক হাজিরা দেওয়া। মিসেস ওয়েনের সেক্রেটারীর কাজ, ব্যস-এ পর্যন্তই।

বুদ্ধি করে একদিন এজেন্সিতে নামটা লিখিয়ে রেখেছিলাম। এখন তার সুফল ফলল। সেই এজেন্সি মারফতই তো এই সুখের চাকরিটা পাওয়া গেলো। গোটা গোটা অক্ষরে লেখা চিঠিখানা, চিঠির প্রতিটি শব্দ যেন আমার মনের মত, তাই বোধহয় গেঁথে গেছে মনে, স্পষ্ট এখনো-

মহিলা এজেন্সি সুপারিশে আপনাকে একটা চাকরির খবর দিচ্ছি। আপনার উপযুক্ত বেতন আপনি পাবেন। প্যাডিংটন স্টেশন থেকে বারোটা চল্লিশের ট্রেন ধরে ওকব্রীজ স্টেশনে নামবেন। সেখান থেকে অপলকে আপনার চাকুরী স্থলে নিয়ে আসার জন্যে আমার একজন প্রতিনিধি থাকবে। এই চিঠির সঙ্গে আপনার রাহা-খরচ বাবদ এক পাউণ্ডের নোট মোট পাঁচ পাউণ্ড পাঠালাম।

আপনার বিশ্বস্ত

উনা নানসি ওয়েন

চিঠিতে প্রেরকের ঠিকানা লেখা ছিল নিগার আইল্যাণ্ড স্টিকলহ্যাভেন, ডিভন।

নতুন চাকরীর খবরটা পেয়ে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা গেল। এই মাসটা স্কুলের ছুটি, একটা মাস কি করে কাটাবো, ভাবতে ভাবতে হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। এরই মাঝে চিঠিটা ভাগ্যিস এলো। তা এই চাকরীটা মনের মত হলে বরাবরের জন্যে এখানেই থেকে

যাবো। এখানে স্কুলের খেলাধুলো বিভাগের চাকরীটা যে মন আর তেমন টানে না। যা বেতন তাতে পুরো মাসের না মেটে খরচ না ভরে মন। এক এক সময় তো বড় বিরক্তিকর বলে মনে হয় এই চাকরীটা।

কিন্তু সিরিল, সিরিলের ব্যাপারটা—

যা হবার হোক, ও ব্যাপারে আমি আর কিছু ভাবতে পারছি না। যা হয়ে গেছে তা তো আমি আর খণ্ডাতে পারিনা। তাহলে অকারণ চিন্তা করে শুধু মনটাই বা খারাপ করি কেন।

ভাববো না বললেও কি চুপ করে থাকতে পারি। বড্ড জানতে ইচ্ছে হয়, করোনার কি আদৌ আমাকে সন্দেহ করেছেন? আমার ধারণা যদি সত্যি হয়, তাহলে ধরে নেওয়া যেতে পারে করেননি। একটা সুখের ব্যাপার হলো, বরাবর তার ধরা ছোঁয়ার বাইরে থেকে গেছি আমি। আর কেনই বা ধরবেন তিনি আমাকে?

আরো আছে আমার বুদ্ধি আর সাহসের প্রশংসা নিজের মুখেই করেছেন তিনি অনেকবার। তাছাড়া আর একজনের তারিফ করতে হয় বৈকি, তিনি হলেন মিসেস হ্যামিল্টন। আমার ব্যাপারে যথেষ্ট সহৃদয়তার পরিচয় দিয়েছেন তিনি, ওঁর ওপর আমার এখন অগাধ বিশ্বাস। অতএব আমার কিসের ভয়।

যত ভাবি ভুলে যাবো, কিন্তু পারছি কই ভুলতে। উঃ কি ভয়ঙ্কর সেই দৃশ্য। আজো যেন স্পষ্ট ভাসছে চোখের সামনে। যেন মনে হয়, গতকালের ঘটনা, অত্যন্ত স্পষ্ট সেই ছবি, মাথা ঘুরে যাওয়ার ছবি মনে আছে, সিরিলের মাথাটা একবার ডুবছে আবার ভেসে উঠছে। আশানিরাশার দোলায় দুলহিল সে তখন। আর এদিকে সাঁতার কেটে এগুচ্ছি অলস ভঙ্গিতে। আমি তখন বেশ বুঝে গিয়েছিলাম, আমি যতোই চেষ্টা করি না কেন ঠিক সময়ে পৌঁছে তাকে উদ্ধার করা আর সম্ভব হবে না।

সুদূর বিস্তৃত দিগন্ত প্রসারী সেই নীল ফেনিল জলরাশি, প্রায় পাহাড় সমান উঁচু উঁচু ঢেউ এসে বারবার আছড়ে পড়ছে সমুদ্র পারে, যদিকে দুচোখ যায় শুধু বালিয়াড়ি-তার ওপর শুয়েছিলাম আমরা দুজন, মানে আমি আর হুগো, ও নাকি ভালবাসতো আমাকে।

হুগো! ও এখন আমার কাছে স্মৃতি, শুধুই স্মৃতি, ফেলে আসা দিনের যেন একটি অধ্যায়ের এক অস্পষ্ট ছায়া মাত্র। তাই হুগোর কথা আর ভাবতে চাইনা। স্মৃতি শুধুই বেদনা.....

অতীত পেরিয়ে এবার বাস্তবে ফিরে এলো ভেরা। তাকালো চোখ মেলে। এবং চোখ মেলে ভাল করে তাকাতেই বিপরীত দিকের আসনে বসা সেই যাত্রীটির সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হয়ে গেলো ওর। দীর্ঘদেহী পুরুষ দোহারা চেহারা, বাদামী রঙ গায়ের, চোখ দুটি বেশ ছোট ছোট, তার গোটা চেহারার মধ্যে কেমন যেন একটা কাঠখোঁটা ভাব। মুখ দেখলেই বোঝা যায়, বিশ্বের অনেক দেশ তার দেখা হয়ে গেছে, অনেক দেখেছে, জেনেছে। অবশ্যই না হয়েই যায় না।

ওদিকে বিপরীত দিকের আসনে বসে থাকা যাত্রীটিও চুপ করে বসে থাকেনি, মেয়েটিকে কাটা মাছ বাছার মতোন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল ফিলিপ লম্বার্ড।

হ্যাঁ, মেয়েটি সত্যিই সুন্দরী বটে, মনে মনে ওর রূপের তারিফ করল সে, তবে একেবারে অঙ্গুরী না হলেও দেখতে বেশ, চোখে লাগার মতোন। একটা আলগা শ্রী আছে ওর চেহারায়।

গোল গোল সাদামাটা গড়ন। মাস্টারনী মাস্টারনী ভাব। মুখ দেখে মনে হয়, এই মেয়েটির ওপর নিঃসঙ্কোচে নির্ভর করা যায়। ফায়দা কিছু না লুটুক, তবে এটা ঠিক, ক্ষতি-টতি করার সাহস পাবে না। তা একবার একটু পরখ করে দেখলে কেমন হয়।

না, থাক, এখন ওসব চিন্তা মূলতুবি রাখাই ঠিক। যে কাজে আসা, সেটা ঠিক মতো সমাধা না করা পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছি না। আগে সেই কাজটা সারি। তারপর অন্য কাজটা একটু বিচিত্র ধরনের। বুড়ো ইহুদি আইজ্যাক মরিস শোনা যাচ্ছে রাতারাতি দানছত্র খুলে বসেছে। কিন্তু কেন? এর রহস্যই বা কি?

আইজ্যাকের কথাটা মনে পড়ে গেলো, বলেছিল সে, দেখুন কাপ্টেন লম্বার্ড, তাড়াহুড়োর কিছু নেই, বেশ ভাল করে একটু চিন্তা ভাবনা করে বলুন, কাজটা করতে আপনি উৎসাহী কি না।

বলছেন একশো গিনি দেবেন? আমার কথার মধ্যে একটা অনাগ্রহের সুর ছিলো, ইচ্ছে করেই আমি তাকে বোঝাতে চেয়েছিলাম, একশো গিনি আমার কাছে এমন কিছু লোভনীয় নয়। কিন্তু আসলে ঠিক তা নয়, আমার পকেট তখনো একেবারে শূন্য। দুবেলা অন্ত সংস্থান করতে আমার তখন প্রায় প্রাণান্তকর অবস্থা। এ-হেন অবস্থায় স্বভাবতই একশো গিনি আমার কাছে তখন একটা বিরাট কিছু অবশ্যই, হ্যাঁ, সেটা আমার কাছে একান্ত কাম্য বটে।

ভেবেছিলাম বুড়ো আইজ্যাককে বুঝি বোকা বানিয়ে দিলাম। কিন্তু আমার ধারণা একেবারেই ভুল, আসলে ও একটা আস্ত বাস্তবঘুঘু। বরং আমাকেই ফঁদ দেখিয়ে ছাড়তে পারে। ওকে ঠকাবো আমি? না কস্মিন কালেও সম্ভব নয়।

ভাবলেশহীন চোখে তাকালো আমার দিকে সে, তার কালো ছোপ ধরা দাঁতের ফাঁকে সামান্য একটু হাসি ফুটে উঠতে দেখেছিলাম। যেন একটু দৃঢ়স্বরেই বলল সে, একশোর বেশি হবে না, ওর ওপর আর উঠতে চায় না ওরা।

কিন্তু আমাকে কি করতে হবে, মানে আমার কাজটা কি হবে জানতে পারি?

জানি না, তবে একটু বলতে পারি, যে কাজেই হোক না কেন, মাথা ঠাণ্ডা রেখে করবেন, খুব সাবধানে পা ফেলবেন, করার আগে ভাল করে ভাববেন, ব্যস। এই পর্যন্ত। আর আমার কাজ হলো আপনার হাতে একশো গিনি তুলে দেওয়া। এই নিন একশো গিনি। এখন গন্তব্যস্থল হলো নিশার আইল্যাণ্ড। ওকব্রীজ স্টেশনে নেমে তারপর যেতে হবে

স্টিকলহাভেনে, সেখানে থেকে লঞ্চে করে নিগার আইল্যাণ্ড। আমার মক্কেল অপেক্ষা করবেন আপনার জন্যে সেই দ্বীপে।

তা কাদের জন্য কতদিন সেখানে থাকতে হবে আমাকে?

খুব বেশিদিন নয়, বড়জোর সপ্তাহ খানেক।

তা না হয় হলো কিন্তু আপনি তো জানেন, তার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেওয়ার দিকে চোখ রেখে বললাম কোন বে-আইনী কাজে আমার একেবারে আগ্রহ নেই। তাই বলছিলাম কি

আরে আগে থেকেই ওসব চিন্তা করছেন কেন?

আমাকে থামিয়ে দিয়ে আইজ্যাক বলছিল, তেমন বে-আইনি কাজ দেখলে আপনি করবেনই বা কেন। তখন পত্রপাঠ চলে আসবেন বুঝলেন?

ব্যাপার দেখো। বাস্তবঘ্যুটা এমন ভাবে কথা বললো, যেন কিছুই জানে না সে। অথচ আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সব জানে ও ভাঙবে তো মচকাবে না। হতচ্ছাড়াটা সব খবরই রাখে, কিন্তু আমার কাছে চেপে যেতে চাইল। ওকে আমি হাড়ে-হাড়ে চিনি একবার তো ও আমাকে-না, থাক। যা হওয়ার হয়ে গে, পুরনো কাসুন্দি এখন না ঘাঁটাই ভাল, এখন আমার একমাত্র চিন্তার বিষয় হলো নিগার আইল্যাণ্ড-এখন আমার সব মন-প্রাণ জুড়ে

রয়েছে প্রকৃতির সৌন্দর্যে ঘেরা সেই সবুজ দ্বীপটি। আঃ কি মজাই না হবে সেখানে গেলে। কটা দিন দারুণ স্মৃতিতে কাটানো যাবে।

এতো বড়ো ট্রেনটায় মাত্র একটাই কামরা অধূমপায়ীদের জন্য। তাই দেখে শুনে এই কামরাটাতে উঠেছিলেন মিস এমিলি ব্রেন্ট। ধূমপায়ীদের কামরার কথা অনুমান করে নিয়ে ভাবতে গিয়ে তার গা ঘিন ঘিন করে ওঠে। চারিদিকে চুরুট আর তার সিগারেটের ধোঁয়া কুণ্ডলী, উঃ অসহ্য! আচ্ছা রাশি রাশি ধোঁয়া উড়িয়ে কি সুখ যে পায় লোকগুলো, ভেবে পান না তিনি।

সোজা হয়ে বসেছিলেন তিনি তার আসনে। হেলান দিয়ে বসাটা তার ধাতে সয় না, ওঁর মতে যাদের মেরুদণ্ড বলতে কিছু নেই তারাই হেলান দিয়ে বসে। বয়স তার পঁয়ষড়ি। তবু এতো বয়সেও একটুও বুড়িয়ে যাননি তিনি এখনো, রাস্তায় হাঁটেন মেরুদণ্ড টানটান থাকেও তার, বসেনও সোজা হয়ে। কর্ণেলের মেয়ে তিনি, এ সব আদব কায়দা সেই কোন্ ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছেন তিনি, এবং সেই ভাবেই চলে আসছেন সোজা।

আগের দিনের শিক্ষাদীক্ষা তাদের আদব-কায়দার ধরণই ছিল অন্য রকম। স্বাস্থ্য ও চরিত্র গঠনের মধ্যে একটা নিষ্ঠার ভাব ছিলো। কিন্তু এখন। দিনকে দিন সব যেন কেমন উধাও হয়ে গেলো। এখানকার ছেলে-মেয়েরা যেন এক একটা নীর পুতুল, গাল টিপলে দুধ বেরোয়। আজকালকার নব্য মানুষজনদের জীবন ও কাজকর্ম করার পদ্ধতির বিষয়ে এই রকম বিতৃষ্ণা নিয়ে নীরবে বসেছিলেন মিস্ ব্রেন্ট তার আসনে। প্রচণ্ড ভীড় ছিল কামরায়, সেই সঙ্গে প্রচণ্ড গরম, তবু বিন্দুমাত্র বিচলিত নন তিনি। অথচ অন্য সব

যাত্রীদের কতই না অভিযোগ, কতই অস্বস্তি বোধ। তাদের না আছে একটু ধৈর্য, না আছে একটু ভদ্রতাবোধ। এর জন্যে যে তাদের সহযাত্রীদের কি অসুবিধে হতে পারে, সেটা চিন্তা করার প্রয়োজন মনে করে না তারা। কি বিচিত্র মানুষ।

আর মেয়েগুলোও কেমন সমানে তাল দিয়ে চলছে পুরুষদের সঙ্গে আজকাল। ওদের ধিঙ্গি পনা দৃষ্টিকটু। গরমের দোহাই দিয়ে দেখা যাবে, সমুদ্রের তীরে গিয়ে কোন রকমে দেহের সব পোষাক আসাক খুলে ফেলে শরীরটা যতখানি সম্ভব পাঁচজনকে যেন না দেখালেই নয়, রোদ পোহানোর ছুতো করে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়বে বালির ওপর। যতো সব ভণ্ডামি ন্যাকামি।

একরাশ বিরক্তি আর ঘৃণায় ভুরু কোঁচকালেন মিস ব্রেন্ট। সহ্য করতে পারেন না তিনি এ সব ন্যাকামি। তবু নিজের মনেই তিনি বললেন, যার যা খুশি করুকগে, আমি বাবা এসবের মধ্যে নেই। আমি আমার আদর্শ নিয়ে থাকতে চাই। কোন কিছুই বিনিময়েই আমি আমার আদর্শকে বিসর্জন দিতে পারবো না। এসব বেলেল্লাপনাদের কথা ছেড়ে দিয়ে আমি এখন নিজের কথা, শ্রেফ নিজের কথা নিয়েই ভাবতে চাই

হ্যাঁ, এখানে যার আহ্বানে তার নিগার আইল্যাণ্ডে যাওয়া, তার সেই চিঠির প্রতিটি অক্ষর এতদিনে একেবারে মুখস্থ হয়ে গেছে।

প্রিয় মিস ব্রেন্ট,

আমার বিশ্বাস, আপনি আমাকে ভুলে যাননি একেবারে। মনে আছে আপনার সেই বেলহাভেন গেস্টহাউসের কথা, সেখানে কয়েক বছর আগে পুরো আগস্ট মাসটা কাটিয়েছিলাম দুজনে? মনে করতে পারছেন না? ঠিক আছে, আমি আপনাকে সূত্র ধরিয়ে দিচ্ছি—আমাদের দুজনের স্বভাবে এত মিল ছিলো, যার জন্যে আমার পরস্পরের কাছে অচিরেই অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ি, এবার মনে পড়ছে?

তা এবার আর অন্য কোথাও থাকা চলবে না। আপনাকে একটা সুখবর দিই, ডিভনের উপকূল ছাড়িয়ে খানিকটা দূরে নিজেই একটা গেস্টহাউস খুলেছি। এখানে বিলাসিতার বালাই নেই, সাদামাটা খাবারের সুবন্দোবস্ত আছে, পরিবেশে যতোটা সম্ভব পুরনো দিনের ছাপ রাখার ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়েছে। এখানে বেলেপ্লাপনা করার বিন্দুমাত্র সুযোগ দেওয়া হয় না।

এবার গ্রীষ্মে ছুটি উপভোগ করার জন্যে চলে আসুন আমার গেস্টহাউসে, এই আমার ইচ্ছা, আপনাকে অতিথি হিসাবেই রাখতে চাই, তাই খরচ-পত্তর নিয়ে খামোকা চিন্তার কিছু নেই আসুন যতদিন খুশি থাকুন এখানে, ভাল না লাগলে চলে যাবেন, জোর করবে না, তাহলেই হলো তো? কোন দ্বিধা না করে চলে আসুন, পারেন তো চলে আসুন না আগামী আট তারিখে।

—প্রীতি ও শুভেচ্ছান্তে

ইউ. এল. ও

চিঠির বক্তব্য তো খুবই ভাল, আন্তরিকতায় ভরা। কিন্তু মুশকিল হলো, পত্রপ্রেমকের নামটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। সেইটা জড়ানো, খুবই অস্পষ্ট। এরই মাঝে কোন রকমে ঐ তিনটি আদ্যাক্ষর পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। আজকাল সব সই-এর যা বহর, হস্তরেখা বিশারদদের কাছেও সঠিক নাম উদ্ধার করা একেবারেই অসম্ভব।

বেলহ্যাভেনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে চিঠিতে। কে-কে হতে পারে সে? আর সে পুরুষ, নাকি মহিলা? সাকুল্যে দুবার বেলহ্যাভেনে গেছেন তিনি। মনে আছে সেই মাঝবয়সী ভদ্রমহিলার কথা, খুব ভাল লেগেছিল তাঁকে, কিন্তু কি যেন নাম ছিল তার? ঠিক সময়ে আজকাল স্মৃতিশক্তিটা বড় বিশ্বাসঘাতকতা করে, কিছুতেই আর মনে পড়ে না নামটা। হ্যাঁ, এবার যেন মনে পড়েছে তার নামটা। মিসেস অলটোন না, বোধহয় মিসেস অরমেন। না ও দুটোর কোনটাই নয়। অ-অ-অহা, এবার ঠিক মনে পড়েছে, মিসেস অলিভার, হা মিসেস অলিভারই ছিলো ভদ্রমহিলার নাম।

নিগার একটি দ্বীপ-একসময় এই দ্বীপটিকে কেন্দ্র করে প্রচুর লেখালেখি হতে সংবাদপত্রে, সেই সুবাদে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল এই নিগার আইল্যান্ড। সেই সব খবরের তালিকায় এখন নাম শোনা যেত এক চিত্রতারকার, নাকি সেই আমেরিকাবাসী কোটিপতি ভদ্রলোকের কে জানে, ঠিক মনেও নেই আর মনেই বা থাকবে কি করে? উঃ সে কি আজকের কথা? অনেক অনেক আগের কথা।

যাকগে, সঠিক সময়ের হিসাব করতে বসে মিথ্যে সময়ের অপচয় বই তো আর কিছু নয়। ও নিয়ে আমার মাথা ঘামানোরও কোনো প্রয়োজন নেই। আমি যাচ্ছি সেখানে ছুটি

উপভোগ করতে। কয়েকটা দিন থাকবো, আমোদ করবো, ব্যস তাতেই আমার যথেষ্ট। আর বড়তি লাভের মধ্যে সেখানে থাকা খাওয়ার কোন খরচ হবে না আমার এটাই সব থেকে বড় লাভ আমার।

আজকাল আমার আয় যৎসামান্য, সেই দিন আর নেই, শেয়ারের ডিভিডেন্ডের টাকা কমেই শুধু যায়নি, বড় অনিয়মিত হয়ে পড়েছে। এদিক-ওদিক করে, অপ্রয়োজনীয় খরচগুলো ছাটাই করে কোন রকমে চলে যায় সংসার। সে কথা চিন্তা করলে নিখরচায় এমন একটা লোভনীয় বন্দোবস্ত, সেটা কি কম সুখের?

এ পর্যন্ত সবই ভাল চলছিল, সুন্দর এবং সুষ্ঠুভাবে কেবল সেই একটি নাম মিস্ না মিসেস অলটোন, নাকি অরমেন? না অরমেন না, তবে কি অলিভার। সঠিক নামটা যদি জানা যেত?

ট্রেন তখন এক্সেটার জংশনে ঢুকছে, জানলা পথে মুখ বাড়িয়ে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিলেন জেনারেল ম্যাকআর্থার। জিনিসপত্র গোছগাছ করতে শুরু করে দিলেন তিনি-এক্সেটার স্টেশনে নেমে গাড়ি বদল করতে হবে। এটুকু পথ এসেই বিরক্তবোধ করলেন তিনি। ব্রাঞ্চ লাইনের ট্রেনগুলো কতই না মন্তর, নড়তে চড়তে আঠারো মাস। এতো সময় লাগার কথা নয়। সোজা পথে নিগার আইল্যান্ড বলতে গেলে এক রকম ঘরের কাছেই।

গোছগাছ করার ফাঁকে জেনারেল ম্যাকআর্থার ভাবলেন, এই ওয়েন লোকটি কে? স্পুফ লেগার্ড না জানি ডায়ার্স, কার, কার বন্ধু সে?

আপনার অতীত দিনের কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবরা আসছেন এখানে। তা আপনিও চলে আসুন না? খুব ভাল হত, বেশ জমিয়ে আড্ডা মারা যাবেখন

একটা নিঃস্বার্থ আমন্ত্রণ, লোভনীয় আকর্ষণও বটে। পুরনো সব বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হতে কারই বা মন চায় না। এই বয়সে নতুন করে কার সঙ্গেই বা মেলা-মেশা করবেন?

তা ছাড়া এ-প্রসঙ্গে কথা উঠলে আজকাল বন্ধু বান্ধবরা কেমন যেন এড়িয়ে চলে। মনে পড়ে যায় সেই বছরটার কথা। কিন্তু সে তো আজ বছর তিরিশ আগেকার কথা-তামাদি হয়ে গেছে কবেই। সেদিন আমিটের্জ যদি না মুখ খুলতে না আজকাল ছেলে-ছোকরাদের বিশ্বাস করা যায় না। কে কি বললো, কিংবা কে কতখানি জানলো বোঝা মুশকিল, মনে হয় ঈশ্বরই হয়তো জানেন। যাই হোক যে যার খুশী মত বলুক, আমার তাতে কি এসে যায়? কতো লোক আমার অজান্তে কত কিছুই না বলে থাকে। সব কথা সরাসরি আমার কানে না এলেও তাতে কিছু আসে যায় না, গুজবে কান দেবার মতো অতো সময়ই বা কোথায়? তাছাড়া চলার পথে আর বলা মুখতো আর বন্ধ করা যায় না আজকাল। নিগার আইল্যাণ্ডের মানুষগুলোই এই রকম। আর গুজবে কান দেওয়ার ব্যাপারটা বেমালুম চেপে যাওয়াই তাদের কাজ। কিন্তু তা নিয়ে মন খারাপ করাটা উচিত নয়, গুজবের তো আর মা বাপ নেই? যখন খুশি যেখানে খুশি বলেন ও তাতে আমার কি এসে যায়? এক্ষেত্রে গুজব কানে না তোলাই ভালো।

যে যাই বলুক। সেই আমেরিকাবাসী কোটিপতি এলমার রোবসনই না কি এই দ্বীপটির আসল মালিক। বহু টাকা ব্যয় করে তৈরি করেছিলেন সুন্দর একটা প্রাসাদ। নিজের সুখ-স্বচ্ছন্দ্যের জন্য মনের মতো করে গড়িয়েছিলেন সেই প্রাসাদ। কিন্তু

এই সময় বাধা পড়লো তার চিন্তায়। বাইরে তাকিয়ে দেখতে পেলেন তিনি, ট্রেনটা এসে থেমেছে এক্সেসের স্টেশনে, কোন তাড়াহুড়ো নেই, ধীরে ধীরে ট্রেন থেকে নামলেন তিনি। কজি ঘড়ির ওপর চোখ রেখে হিসেব করে দেখলেন, বদলি ট্রেনের জন্য পাক্সা এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে তাকে। ওঃ যন্ত্রণার একশেষ একেবারে।

ডঃ আর্মস্ট্রং তার ছোট মরিস গাড়িটি সালিসবারির রাজপথ ধরে দ্রুতবেগে চালাচ্ছিলেন। একটানা অনেকটা পথ গাড়ি চালিয়ে এসে এখন খুবই ক্লান্ত তিনি, মনে মনে ভাবছিলেন, পথে কোথাও গাড়ি থামিয়ে গলাটা একটু ভিজিয়ে নিলে মন্দ হতো না। আজ তিনি সফল তার পেশায়। তবে এ সাফল্য কুসুমাস্তীর্ণ নয়। মনে পড়ে, এমনও দিন গেছে, হারলি স্ট্রীটের আধুনিক কায়দায় সাজানো গোছানো চেম্বারে বসে রুগীর জন্যে অপেক্ষা করতে করতে সারাটা দিন অতিবাহিত হয়ে গেছে, তবু রুগী আসেনি একটিও। তবে চিকিৎসক হিসাবে বড় একটা খারাপ ছিলেন না তিনি। চিকিৎসা পদ্ধতি বেশ ভালই জানা ছিলো তার। বয়সও কম ছিলো তখন, দেখতে শুনতে বেশ ভাল ছিলেন তা সত্ত্বেও কেন জানি না শুরুতে তেমন পসার কেন যে জমেনি তার কারণ বোধহয় নিজেও জানতেন না তিনি।

অবশেষে একদিন ভাগ্য ফিরল তার। রুগীর সংখ্যা ক্রমশই বেড়ে চললো, জমজমাট চেম্বার। দুহাত ভরে এল অর্থ, এলো সম্পদ, এলো মান যশ সব কিছুই। তার রোগ বিশ্লেষণ একেবারে নিখুঁত। সঙ্গে সঙ্গে দুচারজন বিত্তবান রোগিনীও জুটে গেলো, তারা তাঁর অনুরক্ত হয়ে পড়লো অচিরেই। ব্যস আর পাওয়ার বাকি রইল বা কি? তার প্রশংসা তখন সবার মুখে মুখে। তার অনুরক্ত রুগীদের বক্তব্য ছিলো এই রকম শুধু শুধু অসুখে কষ্ট পাচ্ছেন কেন? আমার কথায় আস্থা রেখে না হয় একবার ডঃ আর্মস্ট্রংকে দেখিয়ে আসুন না কেন-ছোকরা ডাক্তার হলে হবে কি বুদ্ধিতে বয়স্ক ডাক্তাররাও হার মানতে বাধ্য তার কাছে। আর রোগ নির্ণয়? একেবারে নিখুঁত। আরে আমার কথা যদি বিশ্বাস নাই হয় তো আমাদের পামের কথাই ধরুন না। কেন বেচারী কতো ডাক্তারই না বদলালো, কিন্তু রোগের আর সারে না তার। শেষে একদিন আমিই তাকে জোর করে ডঃ আর্মস্ট্রং-এর চেম্বারে নিয়ে গেলাম। ভাল করে দেখে-শুনে প্রেসক্রিপসন লিখে দিলেন তিনি। তার নির্ধারিত ওষুধ কয়েকদিন খেতেই পাম-এর দুরারোগ্য রোগ পালিয়ে যেতে পথ পেল না। কথায় বলে যার ভাগ্য সহায়, তাকে উন্নতির শিখর থেকে নামায় কার সাধ্য। এবং হলোই তাই শেষ পর্যন্ত।

লক্ষ্যে পৌঁছানোর পর চেম্বারে ভর্তি রুগী সামলাতে হিমসিম খেয়ে উঠতে হয় তাকে। এখন দম ফেলবার সময় নেই একটুও। তবে গোড়ায় এমনি কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে ভাল লাগতো তাঁর, কিন্তু এখন ক্লান্তি আসে ভীষণ।

তবে আজ আর ক্লান্তি নয়। আজ সকাল থেকেই বেশ খুশি খুশি ভাব তার। তার কারণ ডিভনের উপকূলে যাচ্ছেন তিনি কটা দিন কাটিয়ে আসবেন, তাতেই তার এত খুশি। এ

যাওয়া যদিও ছুটি উপভোগ করার জন্য নয়, কর্তব্যের খাতিরে যাওয়া, তবু রথ দেখা, সেই সঙ্গে কলা বেচার মতোন একটু বেড়িয়ে আসা মন্দ কি। অবশ্য চিঠিতে স্পষ্ট করে কিছু লেখা নেই, কিন্তু চিঠির সঙ্গে পাঠানো মোটা অঙ্কের চেক। কম লোভনীয় নয়। পনেরোটা দিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করলেও ঐ পরিমাণ অর্থ উপার্জন করা যেতো না।

তবু মিঃ ওয়েনের উদার মন বটে। এক সঙ্গে অভোক্তা টাকা অগ্রিম ছাড়াও সেখানে গেলে আরো কত দেবেন কে জানে। অথচ চিঠিতে উনি যা লিখেছেন, তাতে তোমার মনে হয় না, ব্যাপারটা খুব একটা গুরুতর। স্ত্রীর অসুখে স্বামী বেচারা খুব চিন্তায় পড়ে গেছেন। তার স্ত্রী নাকি ডাক্তার দেখলেই ভয় পান, তাঁর নার্ভে নাকি তাই তার স্ত্রীর অজান্তে কায়দা করে রোগ নির্গয় করতে হবে, রিপোর্ট দিতে হবে মিঃ ওয়েনকে।

স্ত্রীর নার্ভে নাকি খুবই দুর্বল। ভরু কুঁচকে উঠলো ডঃ আর্মস্ট্রং-এর এই সব মেয়েদের রকমসকম দেখলে তাজ্জব বনে যেতে হয়। যাকগে বাপু, আমার তাতে কি? আগাম টাকা যখন হাতে এসে গেছে, রোগিনীর নার্ভে যাই হোক না কেন, তাকে দেখতে তো যেতেই হবে, ডঃ আর্মস্ট্রং এ পর্যন্ত যতোগুলো মহিলা রোগিনীর চিকিৎসা করেছেন, তাদের মধ্যে অর্ধেক নার্ভে-এর অসুখে ভুগছে-এ অসুখের উৎস হলো একাকীত্ব এবং নিঃসঙ্গতা। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, তাদের এই রোগের ব্যাপারে উপদেশ দিতে গেলেই অমনি গোঁসা হয়ে যাবে। সেটা অন্য ভাবে নেবে। আরে বাপু, আমার উপদেশ যদি তোমাদের মনঃপুত নাই হয় তো কে তোমাদের মাথার দিব্যি দিয়েছে একা একা থাকার জন্য, তা একটা সঙ্গী জুটিয়ে নিলেই তো পারো। শুধু শুধু আমার সময় নষ্ট করা কেন।

এ সব রোগিনীদের জন্যে প্রেসক্রিপসনের বয়ান একই রকমের অমুক গ্রন্থি কিংবা অমুক প্রত্যঙ্গ (কয়েকটা বড় বড় গালভরা নাম ঢুকিয়ে দিলেই চলবে) সামান্য একটু অস্বাভাবিকতা, তাতে তেমন গুরুতর কিছু নয়। কিছুকাল চিকিৎসা করলেই আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে পারবে রোগিনী। এর চিকিৎসা অতি সাধারণ।

আরে বাপু, সব সময় রোগ ওষুধে সারে না, বিশ্বাস রাখতে পারলে অনেক রোগ বিনা ওষুধেই সেরে যায়। কথায় আছে ওষুধ না খেলে তিনদিনে, আর ওষুধ খেলে সাতদিন। এই যে আমরা চিকিৎসকরা সময় সময় রুগীর মানসিকতা লক্ষ্য করে (হয়তো এমন কোন রুগী আছে যারা মনে করে থাকে, সদ্য সদ্য ওষুধ খেলেই তার রোগ বুঝি সেরে যাবে) প্রয়োজনে শিশিতে স্রেফ রঙীন জল ঢেলে ওষুধ বলে যে চালিয়ে দিই তা কি কেউ ধরতে পারে? পারে না। ঐ যে বললাম, বিশ্বাসে রুগীর অর্ধেক রোগ সেরে যেতে বাধ্য, আর বাকিটা ওষুধের গুণে সারে।

হ্যাঁ, সঠিক রোগ নির্ণয় তো ছিলোই ডঃ আর্মস্ট্রং-এর। তার ওপর সেই যে তার ভাগ্যের চাকাটা ঘুরতে শুরু করলো, তারপর থেকে দুর্বীর গতিতে বেড়ে চলেছে তাঁর পসার, সঙ্গে সঙ্গে আয়ের অঙ্কটাও। সে আজ দশ, না দশ নয়, পনেরো বছর অতিবাহিত হলো। উঃ ভাবলে আজও বুকটা কেমন কেঁপে ওঠে বেদনায়, অভাব অনটনে দিন কাটছে তখন। মনে একটুও শান্তি নেই, নেই স্বস্তি। দুবেলা পেট ভরে খাওয়ার মতো রোজগার করে উঠতে পারিনি তখনো, মদ খাওয়াটা একটা ভয়ঙ্কর বিলাসিতা বই আর কিছু নয় বলেই মনে হতো তখন। মনে তখন দারুণ চিন্তা প্যাক-প্যা-অ-ক।

হোঁচট খেলো ভাবনা। তীব্র হর্নের আওয়াজে পাহাড় মাঠ প্রান্তর কাঁপিয়ে ঝড়ের বেগে পাশ কাটিয়ে ছুটে গেলা একখানি স্পোর্টস গাড়ি। দেখছ ছোকরার কাণ্ড। কম করেও ঘণ্টায় আশী মাইল বেগে গাড়ি চালাতে আছে গ্রাম-গঞ্জের রাস্তায়? বয়স কম, তাই এমন ডাকাবুকো, এতো তেজ! আর বাপু, এখানে কেন? তেজ দেখাতে হয় তো অন্য কোথাও গিয়ে দেখাও না। এ সব বোকামো ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে। বোকার হৃদ সব।

বেপরোয়া গাড়ি চালিয়ে মরিসকে কাটিয়ে টনি দেখলো, সামনে যতদূর দৃষ্টি ফেলা যায় ফাঁকা নির্জন রাস্তা। বিনা বাধায় গাড়ি চালানো যাবে এবার। সঙ্গে সঙ্গে সে তার মাস্টার্ন গাড়ির গতি দিলো আর একটু বাড়িয়ে।

মরিস, গাড়িটা সেই থেকে জ্বালাচ্ছিল তাকে, গাড়ির গতি বাড়াবে না, আবার অন্যকে পথও ছেড়ে দেবে না কিছুতেই। পুরনো মডেলের গাড়িগুলোর ওপর এই সব সেকালে লোকদের কি যে দুর্বলতা! আরে বাবা তুমি না হয় পুরানো যা কিছু আঁকড়ে ধরে রাখতে চাও, কিন্তু তোমার ঐ শম্বুক গতি সম্পন্ন গাড়িটি যে অন্যের বিরক্তির কারণ হতে পারে এ কথাটাও কি ভেবে দেখেছ? দাও না বেচে গাড়িটা। আর কেনার কোন খদ্দের না থাকলে, পেট্রল ঢেলে দাও দেশলাই জ্বেলে, নিমেষে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। ল্যাটা চুকে যাক। ইংল্যান্ডের মানুষগুলো যেন কেমন। হাজার হাজার বছরের পুরনো ঝরঝরে বাতিল যোগ্য জিনিষগুলো নাকি তাদের কাছে একটা সম্ব্রমের প্রতীক, অভিজাতের ছাপ আছে বলে চালিয়ে দিতে হবে। আজব ব্যাপার। কিন্তু ফ্রান্সে এমনটি হয় না। অনেক, অনেক ভাল ফ্রান্স, এদিক দিয়ে ফ্রান্স বহু যোজন এগিয়ে আছে ইংল্যান্ডের থেকে।

জায়গাটার নাম মেয়র। এখানেই গাড়ি থামিয়ে গলাটা একটু ভিজিয়ে নেওয়া যাক। গলা শুকিয়ে একেবারে কাঠ, আর গাড়ি চালানোই যাচ্ছে না। গাড়ির কলকজা ঠিক থাকলেও তার দেহের কলকজা বিগড়ে যেতে পারে। ঘড়ি দেখল, হাতে সময় আছে অনেক এখনো। শতানেক মাইল কিংবা তারও কিছু বেশি এখনো পাড়ি দিতে হবে তাকে। সামনেই ছিল একটা শুঁড়িখানা, টনির শুকনো মুখে জল নেমে এলো।

শুঁড়িখানায় গিয়ে ঢুকলো টনি গাড়ি থেকে নেমে। হুইস্কির ফরমাস দিলো সঙ্গে একটু বেশি করে বরফ দিতে বললো ওয়েটারকে। উঃ যা গরম। এমন গরম আবহাওয়া থেকে নিগার দ্বীপে গেলে দারুণ জমবে। শুঁড়িখানায় বসে একটু চিন্তা করার অবসর পেলো টনি। এখন সে ভাবছে ওয়েনদের কথা, এরা কারা? এরা যে টাকার কুমির, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বেছে বেছে ওদের মতো বিত্তবানদের ঠিক খুঁজে বার করেছে বাড়গার। বেচারী। নিজে কপর্দকহীন হলে হবে কি, দুনিয়ার বড় বড় ধনী মহাজনদের হাঁড়ির খবর তার নখদর্পনে।

মনে হচ্ছে মদের বন্যা বইবে টেবিলে। টাকার কুমির অথচ মরায় আসক্তি, এ রকম বিচিত্র মানুষ তো চোখে পড়েনি আজ অবধি। আর সেই সঙ্গে যদি গ্যাব্রিয়েল টাকে পাওয়া যায় সেখানে, তাহলে তো আর বলার কিছু নেই। চিত্রতারকার সঙ্গে বলে কথা, দারুণ ব্যাপার। কিন্তু টাল যদি না থাকে? তাতে কিছু এসে যাবে না। আরে অতো বড় একটা প্রসাদে একটা দুটো মেয়েও থাকবে না, সেটা কি হয়।

শুঁড়িখানা থেকে বেরিয়ে এসে গাড়ির সামনে টনি তার শরীরটা সোজা-টান টান করে দাঁড়ালো, ঘুম পাচ্ছিল, হাই তুললো। ট্রাউজারের বকলসে ঝোলানো নীল চশমাটা টেনে নিয়ে চোখে পরলো। গাড়িতে উঠে ইঞ্জিন চালু করলো সঙ্গে সঙ্গে।

পথ চলতে গিয়ে কয়েকটি মেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে, তাদের শ্যেন দৃষ্টি তখন নিবদ্ধ টনির ওপর। ভাবছে তারা, এ আবার কে? কোন চিত্রতারকা টারকা। নাকি দেখতে সুপুরুষ। দীর্ঘদেহী এক মাথা কোকড়া চুল, বাদামী রঙ গায়ের, সব চেয়ে সুন্দর তার নীল গভীর দুটি চোখ। চিত্রতারকার সবকটি গুণ যেন মিশে আছে ছোকরাটির মধ্যে। কিন্তু কে এই যুবকটি?

গীয়ার বদল করে গাড়ি চালাতে শুরু করল মাস্টার্ন। নিমেষে গাড়ির গতিবেগ বাড়লো। তারপরেই কঁচা রাস্তা থেকে উঠে এলা পাকা রাস্তায়। তার গাড়ির প্রচণ্ড গতি দেখে পথচারীরা সরে দাঁড়িয়ে তার চলার পথ মসৃণ করে দিলো। তাদের সমীহ করার ধরন দেখে মৃদু হেসে গাড়ির গতি আরো বাড়িয়ে দিলো মাস্টার্ন, আশী থেকে এক লাফে একেবারে একশোতে। যেন সে জয়যাত্রায় মেতে উঠেছে। চলেছে কিছু একটা জয় করতে, কিন্তু সে জয় কিসের...আপাততঃ তা নিয়ে মাথা ঘামাতে চায় না সে। তার এক মাত্র লক্ষ্য এখন নিগার আইল্যাণ্ড।

মিঃ ব্লোরও সেই ট্রেনের যাত্রী, উঠেছেন তিনি প্লিমাউথ থেকে। কামায় তার একমাত্র সাহসী একজন পৌড়। নাবিকের মতো চেহারা ঘোলাটে চোখ তার। আশ্চর্য কি করতে

পারে লোকটা। মুখ ব্যথা হয় না। যাই হোক, একটু আগে সে তার বকবকানী থামিয়েছে, ঘুমোচ্ছে ঘাড়-মুখ গুঁজে।

এই ফাঁকে পকেট থেকে একটা ছোট নোটবই আর পেন্সিল বার করে কি যেন লিখলেন তিনি। লেখা বন্ধ করে স্বগোষ্ঠি করলেন তিনি আমাকে বাদ দিয়ে বাকি কজন হলো এইরকম, এমিলি, ব্লেন্ট, ভেরা, ক্লেক্সন, ডঃ আর্মস্ট্রং, অ্যান্টনি মাস্টার্ন, বিচারপতি ওয়ারথেন্ড, জেনারেল ম্যাকআর্থার, ফিলিপ লম্বার্ড, মিঃ রগার্স ও তার স্ত্রী মিসেস রগার্স। শেষোক্ত দুজন একাধারে ভৃত্য এবং খানসামা।

নোটবই এবং পেন্সিল পকেটে চালান করে দিয়ে সামনের ঘুমন্ত ভদ্রলোকটির দিকে একবার আড়চোখে দেখে নিয়ে ভাবলেন তিনি, তাহলে আমাকে নিয়ে হলো মোট দশজন। চমৎকার জমবে.....

তারপর তিনি তাকালেন খোলা জানালাপথের দিকে-শুরু থেকে ভাবতে বসলেন ঘটনাটা, কাজটা তাহলে বেশ সহজ হবে বলেই মনে হচ্ছে। হঠাৎ কেন জানি না তার মনে হলো কে ঠিক চাকুরী প্রার্থী বলে মনে হচ্ছে তো। সন্দেহ নিরসন করার জন্য এগিয়ে গিয়ে বেসিনের আয়নাটায় নিজের চেহারাটা একবার দেখে নিলেন তিনি। কদিন দাড়ি-গোঁপ না কামানোর দরুন মুখটা বেশ ভারিক্কী দেখাচ্ছে। মুখে একটা মিলিটারী মেজাজ এসেছে। বাদামী চোখ হা, সব মিলিয়ে নিজেকে বেশ উপযুক্ত চাকুরী প্রার্থী বলেই মনে হচ্ছে, তাই না নিজের একজন মেজর বলেও চালিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু দলে যে একজনে মিলিটারী

আছে, যদি ধরা পড়ে যাই তার কাছে, না থাক, অত বড় একটা ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না।

আমার পরিচয় কি যেন হবে? হ্যাঁ দক্ষিণ আফ্রিকার লোক হবো আমি। হুঁ দক্ষিণই ভাল। ঐ অঞ্চলে বড় একটা যায় না কেউ। আর মনে হয় না, দলের কেউ দক্ষিণ আফ্রিকায় গেছে কখনো। টুরিস্টগাইড পড়ে ঐ অঞ্চলের সব জায়গাগুলো মোটামুটি ভাবে মুখস্থ হয়ে গেছে, মনে হয় প্রশ্নবানে কেউ আমাকে নাজেহাল করতে পারবে না। দক্ষিণ আফ্রিকা উপনিবেশ হওয়ায় সুবিধে অনেক, পৃথিবীর সব দেশের লোকজনদের যাতায়াত আছে ওখানে। আমিও যেন গিয়েছিলাম সেখানে ভাগের অশেষণে, মোটা টাকা রোজগার করে ফিরছি। এটাই যথেষ্ট, সমাজে মিশতে আমাকে কে আর আটকায় এখন?

নিগার আইল্যান্ড। ছোটবেলায় একটা অস্পষ্ট স্মৃতি এখন মনে পড়ছে, নদীতীর থেকে মাইল খানেক দূরে সেই পাহাড় শৃঙ্খলিলের ঝাঁক আকাশে অনেক উঁচু আকাশে তাদের কতকটা ফুলস্টপের মতো মনে হতো, পাহাড়টা দেখতে ছিলো অনেকটা। মানুষের মাথার মতো কালো কুচকুচে মাথা, পুরু ঠোঁট, নামটাও তাই নিগার আইল্যান্ড, নিগার অপভ্রংশ নিগার।

সত্যি ভাবতে অবাক লাগে, এমন এক নির্জন অখ্যাত দ্বীপে গিয়ে যে কেউ অমন বিরাট প্রাসাদ বোঝাতে পারে। জায়গাটা তেমন আকর্ষণীয় কিংবা লোভনীয় তেমন নয়। তাছাড়া ওখানকার আবহাওয়া শোনা যায় মাঝে মাঝে খুব বিশ্রী হয়ে ওঠে। তবে কোটিপতিদের কাছে সব রকম খেয়ালই শোভা পায়। অটেল টাকা থাকলে কারোর মাথায় এমন অদ্ভুত

অদ্ভুত খেয়াল আসে বৈকি। তা না হলে...থাক, বিভবানদের খেয়ালীপনা নিয়ে আমার অতো চিন্তা কিসের? যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমি যাচ্ছি সেটা পূরণ হলেই যথেষ্ট।

সেই এক মাত্র যাত্রীটির ঘুম ভাঙতেই তাকালো তার দিকে, সমুদ্রের তীরে তো যাচ্ছেন, তবে সমুদ্রকে যেন বিশ্বাস করবেন না কখনো।

হ্যাঁ যা বলেছেন

ঝড় এলো বলে। লোকটি আপন মনে বিড়বিড় করে বকলো।

ঝড়? অবাকই হলেন মি. ব্লোর ঝড় আসতে যাবে কেন.এখন সেখানকার আবহাওয়া তো শুনেছি চমৎকার।

চমৎকার! আবহাওয়া কারোর কোনো কথার তোয়াক্কা করে না, বুঝলেন মশাই। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ঝড় আসছে সেখানে প্রচণ্ড বেগে।

লোকটির অনুমান নিয়ে অহেতুক তর্কে যেতে চাইলেন না মিঃ ব্লোর, তাই চুপ করে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করলেন তিনি।

একটা স্টেশনে ট্রেনটা থামতেই উঠে দাঁড়ালো লোকটি। এখানে আমাকে নামতে হবে। দরজার সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে আবার সে, পিছনে ফিরে সেই সাবধান বাণীটি

উচ্চারণ করতে ভুললো না, মনে রাখবেন, ঝড় আসছে। ঈশ্বরে নাম জপ করুন। এবার বিচার হবে সেখানে, সবার। সমাধান। ট্রেন থেকে নেমে আর একবার মনে করিয়ে দিলো সে কথাটা কিন্তু মনে রাখবেন। আপনাদের বয়স কম, আর অভিজ্ঞতাও কম। তাই বলতে বাধ্য হচ্ছি, এবার বিচার হবে মরার শেষ বিচার। ঝড় এলো বলে.....

তাতে কোন দ্রক্ষেপ নেই মিঃ ব্লোর-এর। নিরাসক্ত ভঙ্গীতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে আপন মনে ত্যাচ্ছিল্য ভরে বললেন শেষ বিচার যদি কারো হয় তো আগে তোমারি হবে বুঝলে বাপু। বয়স তো প্রায় কাবার করে এসেছে।

বলার পরেই সঙ্গে সঙ্গে তার আবার মনে হলো বোধহয় ভুলটা তারই হলো। তাই কি বিচারের কাঠগড়ায় তাকেই দাঁড়াতে হলে সবার আগে—

০২.

এই সময় ট্রেনটা থামলো ওকব্রীজ স্টেশনে, একে একে তারা চারজন নেমে দাঁড়ালেন ট্রেন থেকে। তাদের দেখে একজন ট্যাক্সি চালক এগিয়ে এলো কে যাবেন নিগার আইল্যাণ্ডে?

আমি-প্রায় একই সঙ্গে বলে উঠলেন চারজন। তারপর এ ওর মুখের দিকে তাকালেন অবাক চোখে।

ওঁদের মধ্যে মিঃ ওয়ারথেন্ডই ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ, তাই ট্যাক্সি চালক জিন তাকেই দলনেতা বলে ধরে নিয়ে তার উদ্দেশ্যে বললো, এখানে ট্যাক্সি মোটে দুখানা স্যার। আর একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেন না আসা পর্যন্ত একখানা এখানেই থাকবে। ঐ ট্রেনে আরো কয়েকজন আসছেন। আমার ট্যাক্সিতে আপনাদের মধ্যে তিনজন চলে আসুন, বাকি একজন থেকে যান, উনি এলে ওর সঙ্গে যাবেন।

তাহলে আমি বরং থেকে যাই, আপনারা ওর ট্যাক্সিতে চলে যান, বললো ভেরা ক্লেথর্ন।

ধন্যবাদ, মিস ব্লেন্ট এগিয়ে গেলেন জিনের ট্যাক্সির দিকে। সাবধানে মাথা নিচু করে শরীরটাকে ট্যাক্সির ভেতরে গলিয়ে দিলেন তিনি। তার পিছনপিছন ঢুকলেন বিচারপতি ওয়ারথেন্ড।

তখনো রাস্তায় দাঁড়িয়ে লম্বা একটু ইতস্ততঃ করে সবশেষে তার মনের কথাটা বলেই ফেললো, ভাবছি আমিও থেকে যাই কি বলেন মিস-

ক্লেথর্ন-আমার নাম ভেরা ক্লেথর্ন।

আর আমি হলান ফিলিপ লম্বা। ভেরার দিকে সে তার হাতটা বাড়িয়ে দেয়।

ওদের দুজনকে নিয়ে জিনের ট্যাক্সি ছুটে চললো ওকব্রীজের দিকে। ট্যাক্সির আসনে হেলান দিয়ে বিচারপতি ওয়ারথেন যেন হাফ ছেড়ে বাঁচলেন, রোদটা আজ তেমন চড়া নয় বলেই যা রক্ষে।

হ্যাঁ তা যা বলেছেন। আবহাওয়া তো বেশ ভাল বলেই মনে হচ্ছে। মিস ব্লেন্ট আড়চোখে একবার ওয়ারথেনকে দেখে নিয়ে নিজের মনেই বললো, দেখে তো মনে হচ্ছে সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক।

জানালায় দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বললেন ওয়ারথেন এই প্রথম নাকি এর আগে কখনো এসেছেন এদিকে?

না ডিভনের এদিকে এই প্রথম আমার আসা।

এবং আমারও । এর আগে এখানে আসা আমার সৌভাগ্য হয় নি ।

ট্যাক্সি তখন ছুটে চলেছে তীব্রবেগে ফাঁকা রাস্তায় ।

ভেরা ও লম্বার্ড মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভাবছিল, কে প্রথম আলোচনা শুরু করবে । এই সময় দ্বিতীয় ট্যাক্সিচালক তাদের কাছে এসে সবিনয়ে অনুরোধ করল, বাইরে না দাঁড়িয়ে আপনারা আমার ট্যাক্সিতে উঠে বসতে তো পারেন স্যার; প্রস্তুতাবস্থা লম্বার্ডকে উদ্দেশ্য করে বলা ।

কেন, বাইরে তো বেশ ভালই আছি তার হয়ে উত্তরটা দিলো ভেরা ।

তা যা বলেছেন তাকে সমর্থন করে একটা সিগার ধরালো লম্বার্ড । ট্রেনে যা ধকল গেছে তার ওপর একটানা বসে থেকে হাতে পায়ে খিল ধরে গেছে । এখন একটু এদিক-ওদিকে চলে ফিরে না বেড়ালে পরে আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারব না ।

দুপা এগিয়ে গিয়ে প্রসঙ্গের জের টেনে বললো লম্বার্ড আপনি এর আগে কখনো আসেননি এখানে?

না এই তো প্রথম আসা । তাও আবার চাকরীর তাগিদে তা না হলে

সে কি । লম্বার্ডের দু চোখে গভীর বিস্ময়, আপনি নগর দ্বীপে চাকরী করতে যাচ্ছেন?

হ্যাঁ মিসেস ওয়েন এখন আমার মনিব, অর আমি ওর সেক্রেটারি। কিন্তু মজার ব্যাপার কি জানেন, মিসেস ওয়েনকে দেখার সৌভাগ্য এখনো আমার হয়নি।

ভারি তাজ্জব ব্যাপার তো?

হ্যাঁ, তাজ্জব ব্যাপারই বটে। শুনেছি ওঁর নিয়মিত সেক্রেটারি নাকি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মহিলা এজেন্সিকে টেলিগ্রাম করে একজন প্রার্থী চেয়ে আর এজেন্সি আমাকেই সুপারিশ করে পাঠালো এখানে।

তাই নাকি।

কি আর করার থাকতে পারে তখন, হতাশ গলায় বললো ভেরা, তখন ফিরে যাবো। এমনিতেই তো এ-চাকরী মাত্র একটি মাসের জন্য। একমাস পরে ঠিক ফিরে যেতেই হতো। তাছাড়া আমি তো আর একেবারে বেকার নই। আমি স্কুলে চাকরী করি, এখন এই ছুটির দিনগুলিতে অস্থায়ী একটা চাকরী জুটে গেলো। তাই প্রস্তাবটা গ্রহণ করলাম। ছুটির মাসে বাড়িতে বসে না থেকে বাড়তি কিছু টাকা রোজগার করলে মন্দ কি বলুন? এখানে আসার আগে এই নিগার দ্বীপ সম্বন্ধে কত কাহিনীই না শুনেছি, চাকরীর সুবাদে জায়গাটা নিজের চোখে দেখে নেওয়া যাবে। খাসা একটা জায়গা। আপনার কি মনে হয়?

আমার ঠিক জানা নেই। ভুরু কুঁচকে উঠলো লম্বার্ডের, আগে তো কখনো এখানে আসিনি, তা জানবো কি করে বলুন।

শুনেছি ওয়েনদের নাকি অগাধ টাকা। কিন্তু ওরা লোক হিসাবে কেমন জানেন কিছু?

আচ্ছা ঝামেলায় পড়া গেল তো, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সেই একই প্রশ্ন। এমন ভাব দেখাচ্ছে মেয়েটি যেন আমার মুখ থেকে ওয়েনদের সম্পর্কে সব জেনে-শুনে নিয়ে ভাল লাগলে তবে উনি চাকরীটা গ্রহণ করবেন। যত তো নেকামি আর কি?

প্রসঙ্গ পাল্টাতে লম্বার্ড জিজ্ঞেস করলো আচ্ছা আমরা এখন কার জন্য অপেক্ষা করছি বলুন তো?

জানি না তো। নিরুত্তাপ গলায় বললো ভেরা।

এই সময় যান্ত্রিক আওয়াজ তুলে একখানা ট্রেন এসে থামলো স্টেশনে। যাত্রীদের হৈ চৈ কোলাহলে আর এক প্রস্থ গম গম করে উঠলো প্ল্যাটফর্ম। এই ট্রেনে ঐ বোধহয় তিনি এলেন। বললেন লম্বার্ড।

লম্বার্ডের অনুমানই ঠিক। দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারার এক পৌড়কে স্টেশন থেকে বেরিয়ে, আসতে দেখা গেলো। কাঁচা-পাকায় মেশানো মাথা ভর্তি চুল ঠোঁটের ওপরে মিলিটারি গোঁফ, চোখে সন্ধানী দৃষ্টি, তার পিছনে লটবহর মাথায় একটা কুলি।

এগিয়ে গিয়ে বললো ভেরা, আমিই মিসেস ওয়েনের সেক্রেটারী। আসুন আমার সঙ্গে, আপনার জন্য ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। তারপর লম্বার্ডের দিকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে ভেরা বললো, আমার সঙ্গী মিঃ লম্বার্ড।

একজোড়া ধোঁয়াটে নীল চোখ স্থির নিবদ্ধ হয়ে রইলো লম্বার্ডের মুখের ওপরে। অনেকক্ষণ পরে মুখ ফেরাতে গিয়ে তার চোয়াল দুটো কঠিন হয়ে উঠতে দেখা গেল। স্বগোষ্ঠি করেন তিনি দেখতে তো বেশ খাসা, কিন্তু।

কথাটা অসমাপ্ত রেখেই, ভেরাকে অনুসরণ করে সেই দ্বিতীয় ট্যাক্সিতে উঠে বসলেন জেনারেল ম্যাকআর্থার। তাকে অনুসরণ করলো ভেরা এবং লম্বার্ড। তারপর ওক ব্রীজ স্টেশন ছেড়ে এসে প্লিমাউথ রোড ধরে দ্রুত বেগে ট্যাক্সি ছুটে চললো। গ্রাম্য পথ।

ডিভনের একদিকটায় আমার এই প্রথম আসা, ধরা গলা পরিষ্কার করে বললেন। জেনারেল ম্যাকআর্থার। আমার বাড়ি পূর্বে ডরমেটের সীমান্তে কিন্তু তার গণ্ডি ছাড়িয়ে এদিকে আমার সময় আর করে উঠতে পারিনি এর আগে।

জায়গাটা দারুণ চমৎকার। ভেরার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, দেখুন, দেখুন কেমন ছোট ছোট পাহাড় মাটি কেমন রুক্ষ লাল সবুজ অরণ্য, একটা সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ।

তা যতোই সুন্দর হোক না কেন, মৃদু আপত্তি করে উঠলো লম্বার্ড, খোলামেলা জায়গাই আমার বেশি পছন্দ। এইসব পাহাড় অরণ্যের পরিবেশ চারিদিক থেকে ঘিরে ধরেছে আমাদের। এর বাইরে দুনিয়ার আর কোথাও কি ঘটছে না ঘটছে তা কিছুই বোঝবার উপায় নেই এখান থেকে।

মনে হচ্ছে দুনিয়াটা চষে বেড়িয়েছেন আপনি। হাক্কা হাসি হেসে বললেন ম্যাকআর্থার। তা একটু আধটু ঘুরেছি বৈকি। তার চোখের দিকে ভাল করে তাকাতে পারলো না লম্বার্ড। তার ভয়, এই বুঝি তিনি আবার প্রশ্ন করে বসেন এরপর তা আপনি যুদ্ধে গিয়েছিলেন তো? জিজ্ঞেস করলে কি উত্তর দেবে সে।

যাইহোক লম্বার্ডের আশঙ্কা সত্য হলো না, জেনারেল ম্যাকআর্থার প্রশ্নটা আদৌ করলেনই না।

একটা পাহাড় উপকূলে রাস্তাটা শেষ পর্যন্ত এসে মিশেছে সমুদ্রের প্রশস্ত বালিয়াড়িতে। জায়গার নাম স্টিকলহ্যাভেন। সমুদ্রতীর সংলগ্ন ছোট্ট একট গ্রাম, সমুদ্রের ধারে মাছ ধরার নৌকো ইতস্তত ছড়ানো।

পাকা টম্যাটোর মতো লাল সূর্যটা তখন অস্তাচলে। আকাশে বেলা শেষের রক্তিমভা। দূরে দক্ষিণদিক ঘেঁষে সমুদ্রের মাঝখানে অন্তহীন আকাশের পটভূমিকায় মাথা উঁচু করে ধ্যানমগ্ন যোগীর মতো সারি সারি পাহাড়, প্রহর গুণছে-আর ওটাই হল নিগার আইল্যান্ড।

ভোরের দুচোখে গভীর বিস্ময়, আপন মনে বিড়বিড় করে বললো সে, ওঃ। এ তো দেখছি অনেক দূর।

কিন্তু তার অনুমান বাস্তবের সঙ্গে খাপ খেলো না। একটু আগেই তার কল্পনায় ভাসছিল, তীরের কাছাকাছি সুন্দর একটি দ্বীপ, সেই দ্বীপের মাঝখানে একটি বিরাট শ্বেতপাথরের প্রাসাদ। কিন্তু কোথায়, কোথায় সেই প্রাসাদ? আর কোথায়ই বা দ্বীপ। কেবল চোখে পড়ে বিরাট এক পাহাড়ের চূড়া, কোনো এক বিরাট দৈত্যের ততোধিক বিরাট একটা মাথা, দ্বীপটা কেমন যেন অদ্ভুত দেখতে, ভুতুড়ে ভুতুড়ে ভাব।

সমুদ্রের দিক থেকে চোখ ফেরাতেই তাদের তিনজনের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হয়ে গেল তার। ছোট একটি সরাইখানার সামনে একটি বেঞ্চের ওপর বসেছিলেন তারা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে। বৃদ্ধ ওয়ারথেন্ড তার পাশে বসেছিলেন মেরুদণ্ড সোজা করে মিস ব্লেন্ট। আর মিস ব্লেন্টের পাশের দীর্ঘকায় লোকটি নাক উঁচু, হ্যাঁ উনি নিজেই উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে এলেন।

এখানে একটু বসে ভালই করেছি, কি বলেন? মৃদু হেসে বললেন তিনি, সঙ্গী হিসাবে আপনাদের পেয়ে গেলাম, ভালই হলো, এক সাথে যাওয়া যাবে। একটু থেমে তিনি আবার বললেন, এবার পরিচয়টা সেরে নেওয়া যাক। আমার নাম ডেভিস, দক্ষিণ আফ্রিকার নাটালে আমার কর্মক্ষেত্র-দেবী করে লাভ নেই। আমাদের অপেক্ষায় কর্তারা বসে আছেন।

সবাই এতক্ষণ চুপচাপ অনড় হয়ে বসেছিলেন। কর্তাদের কথা উঠতেই সবাই নড়ে চড়ে উঠলো। ডেভিস তখন ইশারায় ডাকলেন একটি লোককে, সরাইখানার দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল সে। অনুমতি পেয়ে এগিয়ে এলো সে। তার চলার ভঙ্গি দেখেই বোঝা গেলো, সে নাবিক। কাছে আসতেই আরো স্পষ্ট হলো ওর চেহারাটা। রোদে জলে পোড়া রুক্ষ চেহারা কোটরগত দুই চোখে ধারালো দৃষ্টি। কাছে এসে বিনীত গলায় জিজ্ঞেস করলো সে, তা কতারা, এখনই রওনা হবেন নাকি? তাহলে আমার ঐ লঞ্চ উঠে বসুন, আরো দুজন গাড়িতে আসার কথা আছে। তবে মিঃ ওয়েনের হুকুম আছে, তাদের আসতে দেরী দেখলে আগেই আপনাদের পৌঁছে দিতে। তারা তো এখনো এলেন না। চলুন, আপনাদের আগে পৌঁছে দিয়ে আসি।

একটা ছোট পাথরের জেটি, সমুদ্রের ছোট ছোট ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছিল সেই পাথরের জেটির ওপরে। জেটির পাশেই নোঙ্গর করা ছিল একটি লঞ্চ।

লঞ্চ দেখে ভুরু কোঁচকালেন এমিলি ব্লেন্ট ওমঃ এই ছোট লঞ্চ? এতগুলো লোক ধরবে কি করে ওতে?

দেখতে ছোট হলে হবে কি? লঞ্চের মালিক হেসে উড়িয়ে দিতে চাইলো মিস ব্লেন্টের নাক সিটকানো ভাবটা। পক্ষীরাজ ঘোড়ার মতো হাওয়ায় উড়ে যেতে পারে আমার এই লঞ্চখানি। নিমেষে আপনাকে পলক ফেলতে না ফেলতেই প্রিমাউথ এক চক্রর ঘুরিয়ে আনতে পারে আমার এই ছোট লঞ্চখানি।

তাদের কথার মধ্যে বাধা দিয়ে হঠাৎ ওয়ারথ্রেভ বলে উঠলেন, আমাদের সদস্য সংখ্যা কিন্তু খুব কম নয়।

তাতে ভয় পায় না আমার প্রিয় এই লঞ্চখানি। আপনাদের দ্বিগুণ যাত্রী নিয়েই স্বচ্ছন্দে ঘুরে আসতে পারি। তা একটু পরখ করেই দেখুন বাবু সাহেবরা।

পরখ নয়, মেনে নিলাম বাবা তোমার লঞ্চ-এর বিশেষ কৃতিত্ব আছে। তাগাদা দিলো লন্সার্ড এমন সুন্দর পরিবেশে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে ঠিক গিয়ে পৌঁছবো নিগার আইল্যান্ডে। তারপর সে তার সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে বললো, চলুন, আগে ওঠা তো যাক।

সবাই একটু নড়ে-চড়ে উঠলো, বুঝি বা একটু ব্যস্ততাও লক্ষ্য করা গেল তাদের মধ্যে। প্রথমেই উঠলেন মিস ব্লেন্ট। তাকে অনুসরণ করলো বাকি সবাই। লঞ্চ উঠে কেউ কারোর সঙ্গে বাক্যালাপ করলো না, সবার দৃষ্টি তখন সমুদ্রের দিকে, সমুদ্রের মাঝখানে সেই দ্বীপটির দিকে।

নোঙর তুলে প্রস্তুত হলো নাবিক। লঞ্চ চালু করতে যাবে, এমন সময় দেখা গেলো ধুলো উড়িয়ে একখানা গাড়ি তীব্র বেগে ছুটে আসছে জেটির দিকে। কি চমৎকার গাড়ি, দূর থেকে দেখে মনে হলো যেন একটা পক্ষীরাজ ঘোড়া উড়ে আসছে হাওয়ায়। আর গাড়ির চালকটি আরো কত না সুন্দর। সুপুরুষ, এলোমেলো চুল হাওয়ায় উড়ছে, ধবধবে সাদা রঙ গায়ের চোখে রঙীন গগলস।

প্যা-প্যাক-প্যাক, ক্রমাগত হর্ণ বাজাচ্ছিল মাস্টার্ন নাবিকের কর্ণগোচর করার জন্যে। হর্ণের তীব্র শব্দটা পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড়ে প্রতিধ্বনিত হতে থাকলো।

কি বিচিত্র মানুষ। সকলের দৃষ্টি তখন থমকে দাঁড়িয়েছিল আশুয়ান এ্যান্টনি মাস্টার্নের দিকে। ঠিক এই মুহূর্তে তাকে এ-জগতের মানুষ হিসাবে ভাবতে কারোরই মন চাইছিল না।

ইঞ্জিন আর চালু করা সম্ভব হল না। ইঞ্জিনের সামনের আসনে বসেছিলেন ফ্রেড নারাকট। আর ভাবনা এখন অন্যরকম। লোকগুলো কেমন যেন অদ্ভুত ধরনের? তার ধারণা ছিলো বেশ মানানসই পোষাক পরিহিত দেখতে সুন্দর উজ্জ্বল এবং চঞ্চল স্বভাবের এক ঝাক মুখ দেখতে পারে, কিন্তু না কোথায়, সেরকম হিসেবে কোথায় যেন একটা

একথা ঠিক যে, নিয়োগকর্তা মিঃ ওয়েনকে চোখে দেখার সৌভাগ্য এখানো হয়নি। আর তার স্ত্রীকেও নয়। মিঃ ওয়েনের হয়ে কাজ করার সব অনুরোধ আদেশ দেয় মরিস নামে লোকটি। পারিশ্রমিকের ব্যাপারে কোন দরদস্তুর নয়, মুখের কথা খসাতে যতক্ষণ, একেবারে কারেন্সি নোটের বাঙিল এসে যাবে হাতে তার মারফত। তাঁর হয় তো অনেক কাজই করলাম আজ পর্যন্ত টাকাও এলো অনেক। কিন্তু আদৌ একটা দুঃখবোধ রয়ে গেল, যাঁর হয়ে খাটা তাকে চোখের দেখা দেখতে পেলাম না, তাই মন ভরলো না আজও। ওয়েনকে নিয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় অনেক লেখালেখি হয়েছিল কয়েকদিন।

ওঁর ব্যাপার-সাপার সব সময়েই যেন কেমন, ধোঁয়াটে একটা অস্পষ্টতার আবরণ। তখন সে সব অদ্ভুত অদ্ভুত খবরে কোন পাত্রা দিইনি, ভেবেছি কতো উড়ো, কতো অদ্ভুত-অদ্ভুত খবর তো বেরোয় পত্রিকাগুলোতে, গুরুত্ব কেই বা দেয়। কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি, কাগজের খবরই ঠিক। ওঁর সব কিছুই কেমন যেন বিচিত্র ধরণের। ওঁর সব কিছুই গোলমেলে।

ওয়েনের কথায় ভরসা নেই, ওসব বাজে কথা। আসলে সেই দ্বীপটির মালিক ঐ ওয়েন নয়, শোনা যায় দ্বীপটির মালিক হলেন সেই সিনেমার নায়িকা। মিস্ গ্যাব্রিয়েল টার্ল। কিন্তু তাই বা কি করে হয়? সিনেমা জগতের অমন স্বনামধন্যা লাস্যময়ী নায়িকার অতিথি এই সব অতি সাধারণ মানুষগুলো হয় কি করে। তাই বিশ্বাস করতে মন সায় দেয় না।

লঞ্চযাত্রীদের মুখের উপর দিয়ে চকিতে একবার দৃষ্টি ফেলে পরক্ষণেই মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নারাকট বিশ্লেষণ করে মিলিটারী গুফে। ঐ বুড়োটা ঐ অল্পবয়সী যুবকটি ঐ খিটখিটে স্বভাবের মেজাজী বুড়িটা। না এদের কারোর চেহারার সঙ্গেই হলিউডের অভিনেতা অভিনেত্রীদের কোন সাদৃশ্য নেই। ঐ যে ফুর্তিবাজ লোকটা কথা নেই, বার্তা নেই, কেবল বিকট শব্দ করে হাসে, আগে নিশ্চয় ব্যবসা-ট্যাবসা করতো সে। আর ঐ যে রোগাটে চেহারার লোকটা না ওঁকে একটু সম্মান দিয়ে দিয়ে ভদ্রলোকই বলবো, যিনি ছোট ছোট চোখ করে, তাকান দলের মধ্যে উনিই যা একটু ব্যতিক্রম। একমাত্র উনিই চিত্রজগতের কেউ একজন হলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

ও হ্যাঁ, আর একজনের কথা তো ভুলেই গিয়েছিলাম-আরে ঐ যে, একেবারে শেষ মুহূর্তে পরীক্ষরাজ ঘোড়ার মতো রাস্তায়, ধুলো উড়িয়ে তার গাড়ি চালিয়ে জোরে জোরে হর্ণ বাজিয়ে জেটির সামনে এলেন, যিনি সবাইকে দীর্ঘ সময় ধরে বসিয়ে রেখে স্রেফ তার ভাল চেহারার গুণে উপস্থিত সবাইকে দর্শন দিয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো বশ করে নিলেন, তার ওপর সবার রাগ অভিমান নিমেষে জল করে দিলেন, আহা, একখানা চেহারা বটে। সত্যি যেন এক রাজপুত্রের এলেন, জয় করলেন এবং চললেন তার অনুরাগীদের সঙ্গে নিয়ে। উনি নিশ্চয়ই কোটিপতি হবেন। তা না হলে এমন একখানা দামী গাড়ি স্টিকহ্যাভেনের বাসিন্দারা যে সে গাড়ি জীবনে কখনো চোখে দেখেনি, যার দাম লাখখানেকের কম নয়, কোটিপতি না হলে কেউ এমন দামী গাড়ি ব্যবহার করতে পারে? হাওয়ার গতির সঙ্গে সমানে পল্লা দিয়ে তিনি ছুটে আসছিলেন তার গাড়ি চালিয়ে আহা কি অদ্ভুতই না লাগছিল ওকে।

তবে যে যাই বলুক, একজনকে দিয়ে গোটা একটা দলের মাপকাঠি নির্ণয় করা যায় না। আসলে আমার কি মনে হয় জানেন, সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন একটু গোলমেলে খটমট লাগছে, একটু যেন অস্বাভাবিকই লাগছে আমার....

এক চক্রর পাহাড়টা প্রদক্ষিণ করে জল কেটে এগিয়ে চলছে লঞ্চটা। অনেকক্ষণ পরে দূর দ্বীপের মধ্যে সেই প্রাসাদটা চোখে পড়লো। সমুদ্র-মুখো প্রাসাদটা আধুনিক ডিজাইনে তৈরী। খোলামেলা প্রচুর আলো-বাতাস। এক কথায় অতি উত্তম।

দ্বীপের কিনারার কাছাকাছি পৌঁছে লঞ্চের ইঞ্জিন বন্ধ করলো ফ্রেড। পাহাড় এবং তীরের মাঝখানের একটা খাঁড়িতে লঞ্চ ঢোকালো সে।

তীর ঘেঁষে পাথরে ধাক্কা খেয়ে লঞ্চটা একটা ঘুরপাক খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল একসময়। লঞ্চ থেকে নেমে এক হাঁটু জলে দড়ি ধরে টানতে টানতে লঞ্চটাকে তীরে ভেড়ালো নারাকট। এক এক করে সবাই নেমে গেলো লঞ্চ থেকে। শেষ লোকটি নামমাত্র মুহূর্ত দেরী না করে লঞ্চ উঠে পড়ে ইঞ্জিন চালু করে দিলো সে আবার। সঙ্গে সঙ্গে হাওয়ার গতিতে ফিরে চলল লঞ্চ।

সিঁড়ির ধাপগুলো টপকে উপরে উঠতেই একটা বিরাট চত্বর। প্রাসাদের চারিদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললেন ম্যাকআর্থার বাঃ বেশ চমৎকার জায়গা বটে। মুখে বললেও নিজেরই তার কেমন অদ্ভুত লাগলো জায়গাটা, এবং নিজের মনেই বললেন তিনি জায়গাটা সত্যি অদ্ভুতই বটে এবং সেই সঙ্গে অতি কুৎসিত বলা যেতে পারে।

সেখানে তাদের আগমন দেখে প্রাসাদের প্রবেশ পথের দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল এক খানসামা, মানানসই পোষাকে তার চেহারার মধ্যে বেশ একটা গাঙ্গুয়ি ভাব ফুটে উঠেছিল। তাকে দেখে বুকে বল এলো। এমন একটা বিষ্মী জায়গায় এমন আকর্ষণীয় সাজের খানসামা।

দরজার চৌকাঠ পেরিয়ে এসে মাথা নিচু করে জনে জনে সবাইকে সাদর অভ্যর্থনা জানালো সে। লম্বা ছিপছিপে একটু রোগাটে গড়ন, তা হোক, চেহারার মধ্যে বেশ

সম্রাটের ভাব ফুটে উঠেছে কাঁচাপাকা চুল মাথা ভর্তি। এমন এক বিরাট প্রাসাদে তাকে ছাড়া আর কাকেই বা মানাতো ভালো।

বাইরে কেন, আসুন, আপনারা সবাই ভেতরে চলুন, হাসতে হাসতে পথ দেখালো সে। তার আহ্বানে সবাই সাড়া দিয়ে তাকে অনুসরণ করে একটা বিরাট হলঘরে এসে প্রবেশ করলো। চারিদিকে খোলা আলোয় ভরা হলঘরটা বিরাট, মাঝখানে টেবিল। পানীয়র বোতল থরে থরে সাজানো টেবিলটার ওপর যেন হালে পানি পেলো মাস্টার্ন। হাঁপিয়ে উঠেছিল সে। বুড়োগুলোর রকম সকম যা, তার সঙ্গে কারোরই মিল নেই, না কারোর সঙ্গে নয়, বাড়গার আর লোক পেলো না, এদের মধ্যে আমাকে ভিড়িয়ে দিলো।

মদের যা ঢালাও ব্যবস্থাও সব বুড়ো টুড়ো মানবো না, আমি আকণ্ঠ পান করবো, অন্তত যতক্ষণ হুঁশ থাকে, শুধু মদ আর মদ প্রাতরাশ থেকে শুরু করে মধ্যাহ্নভোজ এবং নৈশভোজে হবে চূড়ান্ত, এখানে বইয়ে দেবো মদের ফোয়ারা।

কিন্তু এদিকে আমরা যার অতিথি হয়ে এসেছি এই প্রাসাদে, তার তো পাত্রাই নেই। খানসামাটি জানিয়েছে মিঃ ওয়েনের আসতে নাকি দেরি হবে। সেজন্য দুঃখ প্রকাশ করেছে সে। দুঃখ? আর এর মধ্যে আবার দুঃখই বা কিসের বরং মিঃ ওয়েনের সামনে লজ্জায় হয়তো খুশি মতো মদের পিপে খালি করতে পারবো না। বরং এদিক দিয়ে আমার বাড়তি লাভই হবে বাপু। খানসামাকে জানিয়ে দিয়েছে আটটায় নৈশভোজের সঙ্গে মদেরও যেন ঢালাও ব্যবস্থা থাকে।...

দোতালায় লম্বা বারান্দায় একেবারে শেষ প্রান্তে একটা বন্ধ ঘরের সামনে এসে থামলো মিসেস রগার্স। নিজের হাতে ঠেলে বন্ধ দরজা খুলে দিলে সে। ঘরে ঢুকে ভেরা তো দারুন মুগ্ধ, তেমনি মুগ্ধ হয়ে তার দৃষ্টি ঘোরা-ফেরা করতে থাকলো ঘরের চারপাশে। চমৎকার ঘরখানি। বড় বড় দুটো জানালা দক্ষিণের ফ্রেমে ছবি হয়ে আছে। দূরন্ত সমুদ্র। চোখ জুড়িয়ে যাওয়ার মতো সেই মনোরম দৃশ্য।

ভেরা এদিক ওদিক তাকিয়ে তার মনের খবর টের পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে মিসেস রগার্স চিন্তা করবেন না, আপনার সব জিনিষপত্র এনে দিয়েছি।

অবাক বিস্ময়ে ঘরের মধ্যে ভল করে তাকাতে গিয়ে ভেরা দেখলো সত্যিই কাবার্ডের সামনে তার সব মালপত্র জড়ো করে রাখা আছে। ঘর সংলগ্ন ছোট্ট একটা বাথরুম ধবধবে দুধ সাদা মেঝে পরিষ্কার ঝকঝকে।

বাঃ না চাইতেই জল ধন্যবাদ তার কাজের প্রশংসা জানাতে এক গাল হেসে বললো সে, আমি খুব খুশি।

প্রয়োজন হলেই দেওয়ালের দিকে ভেরার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললো মিসেস রগার্স, ঐ বোতামটা টিপবেন নিচে ঘণ্টা বাজবে সঙ্গে সঙ্গে আমি এখানে এসে হাজির হবো কেমন?

ঠিক আছে তুমি এখন যেতে পারো

দরজার দিকে পা বাড়ায় মেয়েটি কিন্তু ভেরার ডাকে আবার ফিরে দাঁড়ালো সে। তার দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে বললো ভেরা, আমি যে মিসেস ওয়েনের নতুন সেক্রেটারী হয়ে এখানে এসেছি, এ খবরটা নিশ্চয়ই তুমি শুনে থাকবে।

তাই বুঝি? তার দুচোখের ভুরু বুঝিবা একটু কুঁচকে উঠলো, ভেরার আপাদমস্তক নিরক্ষণ করলো সে, তারপর সে তার কথার জের টেনে বললো কই শুনিনি তো। সত্যি আপনার ব্যাপারে আমি এখনো কিছুই জানি না। কেবল একটা নামের তালিকা আমার হাতে এসেছে-কে কে আসছেন এখানে তাদের মধ্যে কজন পুরুষ আর মহিলাই বা কজন। কার জন্যে কোন ঘর বরাদ্দ করা হবে তার একটা ফিরিস্তি। ব্যস এই পর্যন্ত। এর বেশি আর কিছু লেখা নেই সেই তালিকায়।

আমার ব্যাপারে, মিসেস ওয়েন কি কিছুই বলেন নি তোমাকে।

দেখা হলে তো বলবেন। আমরা এখানে এসেছি গত পরশু। কিন্তু এর মধ্যে দেখার সৌভাগ্য এখনো হয়নি আমাদের।

সে কি। অবাক হয়ে নিজের মনে ভাবে ভেরা-বড় অদ্ভুত ব্যাপারতো? আচ্ছা। এই ওয়েন দম্পতির স্বাভাবিক প্রকৃতির তো। নাকি মাথার গোলমাল আছে।

যাইহোক নিজেকে সামলে নিয়ে ভেরা বলে ঠিক আছে, তবে কাজের লোক কজন আছে বলতে পারো।

দুজন আমি আর আমার স্বামী।

একি কথারে বাবা? আমাকে নিয়ে আমরা মোট আটজন অতিথি, অথচ কাজের লোক মাত্র দুজন। এরা স্বামী স্ত্রী দুজনে সামলাবে কি করে আমাদের?

ভেরার আশঙ্কার কথা টের পেয়ে মেয়েটি মৃদু হেসে বললো, চিন্তার কিছু নেই। আমি বেশ ভালই রাঁধতে পারি। আর ঘরদোরের কাজ ওদিকটা আমার স্বামীটি তার যোগ্যতা দিয়ে অবশ্যই সামলে নিতে পারবেন। তবে আপনারা সবাই যে আসবেন ভাবতে পারিনি। অবশ্য এর জন্য আটকাবে না। দরকার হলে মিসেস ওয়েনকে বলে আমার দু একজন কাজের লোকের ব্যবস্থা করে নেবেন। ওঃ কথায় কথায় অনেক দেরী হয়ে গেলো, এখন আমি যাই, অনেক কাজ পড়ে আছে।

এবার সে চলে যাওয়ার জন্য অলস ভঙ্গিতে শিকারী বেড়ালের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। পলক-পতনহীন চোখে অপস্থ্যমান মিসেস রগার্সের দিকে তাকিয়ে রইলো ভেরা। তারপর জানালার ধারে একটা আরামকেদারায় সে তার গা ভাসিয়ে দিলো।

এখন মনটা তার বড় অস্থির। হওয়ারই কথা, একটার পর একটা যা সব অদ্ভুত ঘটনা ঘটে যাচ্ছে তাতে মন সুস্থিরই বা থাকবে কি করে। আশ্চর্যক ওয়েন দম্পতিদের

অনুপস্থিতি, মিসেস রগার্সের নির্লিপ্তভাবে এসব দেখে শুনে মন চঞ্চল তো হবেই। তার ওপর আরো বেশি অবাক করে তুলছে অতিথিরা। একজনের সঙ্গে আর একজনের মিল নেই প্রত্যেকের মধ্যে কেমন যেন একটা ছাড়া ছাড়া ভাব। অথচ এই ভিন্ন ভিন্ন সমাজের লোকগুলোকে একই জায়গায় সমাবেশিত করা হয়েছে। কি তার উদ্দেশ্য তাও কেউ জানে না।

এমন একটা অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হবে, আগে জানলে ওয়েনদের সঙ্গে দেখা করে আসাটাই ভালো ছিল বোধহয়।

আরাম কেদারায় বসে আরাম করতে আর মন চাইলো না ভেরার। উঠে দাঁড়ালো সে।

চমৎকার বড় মাপের এবং সুসজ্জিত। মেঝেয় দামী কার্পেট, একপাশে ফায়ারপ্লেস, দেওয়ালে প্রমান সাইজের আয়না, আরো কিছু সুন্দর সুন্দর আকর্ষণীয় জিনিষপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ঘরের দেওয়ালের সেলফে। হঠাৎ দেওয়ালের একটা জায়গায় মেহগনি কাঠের একটা ফ্রেম ঝুলে থাকতে দেখে এগিয়ে গেলো সেদিকে সে। কৌতূহল হলো তার ঐ ফ্রেমের কি বাঁধানো আছে দেখার জন্য, কাছে গিয়ে ভাল করে দেখতে গিয়ে তার দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ হলো তুলোট কাপড়ের ওপর কালো কালিতে লেখা কবিতার প্রতি। কি এমন কবিতা যে এমন যত্ন করে ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে? তার কৌতূহল বেড়ে গেলো আরো। বিভূবানদের অন্য সব উদ্ভট উদ্ভট খেয়ালগুলোর মতো মনে হয় এটাও হয়তো তেমন একটা খেয়াল হবে। অফুরন্ত অবসর হাতে কাজে না থাকলে যা হয় আর কি-বসে বসে কবিতা লেখা, মনের উচ্ছ্বাস করার এটাই সহজ অধ্যায়।

যন্তো সব পাগলের প্রলাপ—

মনে মনে বিরক্ত হলেও কবিতাটি পড়ার কৌতূহল দমন করতে পারলো না ভেরা।
আবৃত্তি করার চঙে পড়তে শুরু করলো সে—

দশটি কালোমানিক দশটি কালো হীরে,
একটি ঢোকে জল খেতে গিয়ে, দম
এলো না আর ফিরে।

নয়টি কালোমানিক শুতে গেল রাতে
একটির ভাগ্যে এমন খারাপ, ভাঙ্গলো না
তার ঘুম প্রাতে।

আটটি কালো হীরে, বেড়ায় ঘুরে
পাহাড় পর্বতে,
একটি মানিক হারিয়ে গেলো, রইলো—
মাত্র সাথে।

সাতটি কালোমানিক কাঠ কাটতে
গেল বনে,
একটি কেটে দুখান হলো ঠেকলো
বাকী ছয়ে।

ছয়টি কালেহীরে মারলে ঢিল

মৌচাকে না ভেবে সাত পাঁচ,
হুলের বিষে একটি মলো হাতে
রইল কেবল পাঁচ,
পাঁচটি কালোমানিক গেলো
আদালতে দিতে বিচারে মন,
একটি গেলো কারাগারে ফিরলো
বাকী চারজন।

চারটি কালোমানিক সাগর-জলে
নাচে ধিন্ ধিন,
একটি গেলো সিন্ধু পাখীর
পেটে বাকী রইলো তিন।
তিনটি কালোমানিক দেখতে
গেলো বনের পশুছানা,
একটি খেলো শ্বেতভাল্লুক
ফিরলো দুটি কালোসোনা।
দুটি কালেহীরে রোদে গিয়ে
করে চিক চিক,
একটি কুঁকড়ে পাকায় তালগোল,
রইলো শুধু এক।
শেষ কালোমানিক, শেষ প্রাণের
সোনা,

মনের দুঃখে দিলো (গলায়) দড়ি
রইলো না আর কেউ ।

কালোমাণিকদের নিয়ে লেখা বিষাদে ভরা একটি কবিতা হ্যাঁ ঠিকইতো, ভুলেই
গিয়েছিলাম দ্বীপটার নামও যে নিগার আইল্যাও। নিগার অর্থাৎ নিগ্রো। কালো
নিগ্রোগুলোই তো কবির সেই দশটি কালো মাণিক, কালেহীরে, কালো সোনা। হ্যাঁ, এক
একটি মাণিক, হীরে আর সোনাই বটে।

আবার জানলার পাশে ফিরে গিয়ে বসলো ভেরা। তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো নীল
সমুদ্র। ঢেউ, ঢেউ এর পর ঢেউ, ফেনলি জলরাশি, বিরাট বিরাট মেঘের মতোন আছড়ে
পড়ছে সমুদ্র-তীরে, ঢেউ ভাঙা জল ছড়িয়ে পড়ছে বালিয়াড়িতে। অপরাহ্নের শেষ
আলোয় রক্তিমভা ছড়িয়ে পড়ে ঢেউগুলোর গায়ে। আর বিকেল যতো গড়িয়ে যেতে
থাকে সেই রক্তিমভা রক্ত-রঙে পরিণত হতে থাকে।

রক্ত! শুধু রক্ত! সেই রক্তের হোলিখেলায় ছোট ছোট মাথাগুলো কখনো ডুবছে, কখনো
ভেসে উঠেছে, কখনো বা ভেসে উঠছে আবার ডুবছে, আবার ভাসছে—

না না এখন আর ওসব কথা নয়, ভেবে কোন লাভও নেই, সবই তো শেষে হয়ে গেছে
কবেই।

পাকা টমাতোর মতো লাল সূর্যটা তখন দূরে, বহুদূরে সমুদ্রের ওপারে নেমে এসেছে, একটু পরেই টুপ করে ডুবে যাবে। ঠিক সেই সময় উঃ আর্মস্ট্রং প্রাসাদে এসে পৌঁছুলেন। নারাকট তার লঞ্চে পৌঁছে দিয়ে গেল তাঁকে।

দীর্ঘ পথ গাড়ি চালিয়ে আসার সময় পরিশ্রম তার কম হয়নি। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত দেহ, অবসাদে চোখ দুটো বুজে আসছে, কপালের শিরা দপ দপ করছে। তা হোক গে, ক্লান্তি আমাকে গ্রাস করতে পারবে না। এই তো, আমি স্বাভাবিক হয়ে উঠছি আবার, কিসের ক্লান্তি? ঐ যে ঐ সমুদ্র এমন একটা নির্জন পরিবেশ, ঠিক এমনিটিইতো আমি চেয়েছিলাম। মনেপ্রাণে। দীর্ঘ দিনের ছুটি, না বেশিদিন ছুটি নেওয়াটা ঠিক হবে না। আর্থিক ক্ষয় ক্ষতির থেকে আসল ক্ষতিটা অন্য। বেশিদিন চোখের আড়াল হয়ে তাকলে আজকাল মানুষজন আর মনে রাখতে চায় না, কেমন সহজেই ভুলে যায়। না, তা হলে চলবে কেমন করে? আমার খ্যাতি তো এখন সবে মধ্যাহ্ন গগনে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতে এখনো অনেক দেরি।

তবে এসব খ্যাতি-ট্যাতির চিন্তা ছাড়তে হবে এখন চিরদিনের জন্যে। এখন ভেবে নিতে হবে, সব ছেড়ে-ছুঁড়েই আমি এখানে এসেছি, ফিরে আর যাবো না, কখনো না, কোনদিনই নয়। বিদায় বিদায় হারলি স্ট্রীট।...

এই দ্বীপ, এই নিগার আইল্যান্ড...যেদিকে তাকাই শুধু থৈ থৈ জল, জলের মাঝে ছোট একখানি সবুজ দ্বীপ শহর থেকে দূরে অনেক দূরে, মানুষের কোলাহল থেকে অনেক

দূরে, নিস্তন্ধ নির্জন একটি দ্বীপ, চিন্তা-বিহীন এক অখণ্ড অবসর যাপনের একটা নিশ্চিত আস্তানা। এ যেন এক নতুন পৃথিবী, এই পৃথিবীর মধ্যেই আমার মনের মতোন একটা পৃথিবী। আমার সাধের এই পৃথিবী ছেড়ে আর কোন দিন ফেরার ইচ্ছা নেই।

কোন আকর্ষণই আমাকে ঘরমুখো করতে পারবে না, আমি আমার ঘরের চাবি ফিরিয়ে দিতে চাই। এখন ফিরিয়ে দিতে চাই সবকিছু। আমার ফেলে আসা পৃথিবীর প্রতি কোন আসক্তিই আর নেই। আমার আত্মীয় বন্ধুরা বলুন কে নেবেন আগের পৃথিবীতে ফেলে আসা আমার যথা সর্বস্ব। উত্তর দিন, এগিয়ে আসুন আপনাদের মধ্যে থেকে একজন কেউ..আমি সম্পূর্ণ মুক্ত হতে চাই, আমি আমার আমিত্ব ভুলে গিয়ে নতুন করে আবার এখানে জীবন শুরু করতে চাই।

খাঁচা-ছাঁড়া এক মুক্ত পাখী যেন আমি এখন। খুশি খুশি ভাব নিয়ে পাথরের ধাপটা পেরিয়ে প্রাসাদের সেই উন্মুক্ত চত্বরে এসে দাঁড়ালেন আর্মস্ট্রং।

কিন্তু নিমেষেই তার একটু আগের সেই খুশির ভাবটা মিলিয়ে গেল। প্রাসাদের সামনে উদ্যান আরাম কেদারায় বসে থাকা। ঐ বৃদ্ধ লোকটির দিকে নজর পড়তেই সস্বিং ফিরে পেলেন তিনি। কে, কে ঐ লোকটি? অচেনা জায়গায় চেনা মুখ? আশ্চর্য। তাহলে তো এবার ভাল করে নজর দিতে হয়। মাছ-কাটা বাছার মত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লোকটিকে দেখতে গিয়ে আর্মস্ট্রং-এর মনে পড়লো হা, তাকে তিনি চেনেন, বেশ ভাল করেই, উনি হলেন মিঃ ওয়ারথেন্ড, জাস্টিস ওয়ারথেন্ড। মনে পড়লো আর্মস্ট্রং-এর একবার একটা মামলায় ফাঁসী দেওয়ার জন্য সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছিল। যেই মামলার বিচারক

ছিলেন ঐ বৃদ্ধ লোকটি। সব সময় যেন ঝিমুচ্ছেন, বাদী-বিবাদী পক্ষের উকিলের সওয়ালের সময় কেমন নির্লিপ্ত ভাবে তিনি তার আসনে বসে ঝিমোন তবে আইন নিয়ে একটা কথা বলো সঙ্গে সঙ্গে ওঁর সেই ঝিমুনি ভাবখানা দেখবে উধাও, বেপাত্তা, তখন সচল হয়ে চোখ-কান খুলে রেখে শুরু করে দেন বক্তৃতা, ওঃ সেই বক্তৃতার ভাষা কতো না তীব্র হুল ফোঁটানো, চোখা চোখা বুলি আইনের কচকচি, তার আইনের যুক্তির কাছে দুদে-উকিলেরা হার মেনে যায়, জুরীরা ভয়ে তাদের মতামত জানাতে সাহস পায় না, পাছে তাঁর রায়ের শেষ কথাটি হলো মৃত্যুদণ্ড ফসি। তাই সবাই ওঁর নামকরণ করেছিলো ফাঁসুড়ে বিচারক।

কিন্তু কি আশ্চর্য এই পাণ্ডুবর্জিত নির্জন দ্বীপে মরতেও যেখানে কেউ আসতে চায় না, সেখানে এই বৃদ্ধ লোকটি এল কেন?

দূর থেকে আর্মস্ট্রংকে লক্ষ্য করেছিলেন ওয়ারগ্রেভ। কিন্তু তার মধ্যে তেমন কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেলো না, একই ভাবে বসে রইলাম আরাম কেদারায়। তেমনি বসে থাকতে থাকতেই মনে পড়ে গেল অনেক অনেক দিন আগেরকার পুরনো একটা ঘটনার কথা—

ওঃ কি খেলাই না দেখিয়েছিল আর্মস্ট্রং। সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েও বিন্দুমাত্র টলেনি, অনড় অমল থেকে মাপা কথা দিয়ে মাপা যুক্তি দিয়ে সাক্ষ্য দিয়ে যায়। ভুল কিংবা কোন বেফাঁস কথা বলা নয় সব কথাতেই বুদ্ধির ছাপ স্পষ্ট ছিলো। ডাক্তারগুলো বিশেষ করে হারলি স্ট্রীটের ডাক্তারগুলোর বুদ্ধি শুদ্ধি যে একটু কম হয়, আমার অন্তত সেই রকমই

জানা ছিল। এই তো কদিন আগে গিয়েছিলাম হারলি স্ট্রিটে হাতুড়ে ডাক্তার তার সঙ্গে দুচারটে কথা বলেই তার বুদ্ধির দৌড় যে কতদূর টের পেতে অসুবিধে হলো না। কিন্তু এই আর্মস্ট্রং ডাক্তারটি তাদের ব্যতিক্রম।

আর্মস্ট্রং কাছে আসতেই দৃষ্টি বিনিময় হয়ে গেল তার। কোন ভূমিকা না করেই তিনি বলে উঠলেন, সোজা হলঘরে চলে যান গ্লাস সাজানো আছে।

কি যে বলেন মশাই, এগিয়ে যেতে গিয়ে বললেন আর্মস্ট্রং, গ্লাসে চুমুক দেয়ার আগে বাড়ীর কর্তা গিন্নীকে অভিবাদন জানিয়ে আসতে হয় না।

সে গুড়ে বালি, ওয়ারগ্রেভের ঠোঁটের কোনে মৃদু হাসি ফুটে উঠলো, চোখ বুঝলেন দুজনের একজনও বাড়িতে নেই।

বিস্মিত হলেন আর্মস্ট্রং এরকম তো কথা ছিল না, যার আহ্বানে এখানে আসা তিনিই অনুপস্থিত। তার মুখ দিয়ে কথা বেরুলোনা।

আপনি লেডী কনস্টান্স কালসিংটনকে তেমনি চোখ বন্ধ রেখেই জিজ্ঞেস করলেন বৃদ্ধ চেনেন নাকি?

না মানে ঠিক বলতে পারছি না তবে ঐ নামের কাউকে যেন আমি ঠিক মনে করে উঠতে পারছি না,

তা মনে না রাখার মতোই একটা নাম বটে, তিনি তো আর বিখ্যাত কেউ নন। এক অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ তিনি, ভাল করে লিখতেও শেখেননি। কি যেন ছাই-পাঁস লিখলেন-এখন মনে হচ্ছে ভুল জায়গায় এসে পড়লাম না তো।

তারপর সেখানে আর দাঁড়ালেন না আর্মস্ট্রং, দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলেন হলঘরের দিকে।

এদিকে কালসিংটনের কথা ভাবতে গিয়ে অতিথিদের মধ্যে সেই দুজন মহিলার কথা মনে পড়ে গেলো ওয়ারথের। একজন বেশ বয়স্ক, গম্ভীর, কথা একেবারেই বলেন না। আর অন্যজনের বয়স বেশ অল্প, কিন্তু এই অল্পবয়সী মেয়েদের আদৌ ভাল লাগে না তার। যুবকদের পাকিয়ে তুলতে ওস্তাদ যেন ওরা।

কিন্তু ওদের দেখতে পাচ্ছি না, গেলো কোথায় ওরা। এতো বড় প্রাসাদে মাত্র তিনজন তো মহিলা। মিসেস রগার্সকে মহিলাদের দলে রাখতে হচ্ছে কারণ কোন কারণেই ফেলনা নয় সে। তাছাড়া মিসেস রগার্সের ব্যাপার স্যাপারই যেন কেমন, ভয়ে আতঙ্কে তার চোখ মুখ কেমন বিবর্ণ, সিটকে আছে সব সময়। ভয়ে সিটকে থাকে নাকি ওটা ওর একটা ভাগ মাত্র।

রগার্স বোধ হয় কোন কাজে প্রাসাদের বাইরে এসে থাকবে। তার পায়ের শব্দ শোনা মাত্র চোখ মেলে তাকালেন ওয়ারথের, এবং ব্যস্ত সমস্ত ভাবে জানতে চাইলেন, শোনো

রগার্স লেডী কনস্টান্স কালসিংটনের এখানে আসার কোন খবর-টবর আছে তোমার কাছে?

আজ্ঞে না, কোন খবর তো নেই জোরে জোরে মাথা নেড়ে জবাব দিলো সে, এখানে আমার তালিকায় ওঁর নামই নেই।

সে কি? শুধু অবাক নয়, আহতও হলেন তিনি। বেদনার্লান্ত চোখ দুটি তার আবার বুজে এলো ধীরে ধীরে।

বাথরুমে ঢুকেছিল মাস্টার্ন স্নান করার জন্যে। ফোয়ারার নিচে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে তপ্ত শরীরটা শীতল করতে চাইছিল সে। দীর্ঘ পথের ক্লান্তিতে শরীরটা কেমন নুইয়ে পড়েছিল। শীতল জলের স্পর্শে সে যেন আবার চাঙ্গা হয়ে উঠলো। স্নান সেরে দাড়িটা কামিয়ে নিতে হয়। তারপরেই ককটেলের গ্লাসে চুমুক দেওয়া। রাত আটটায় নৈশভোজের পর আবার এক গ্লাস জ্বরদস্ত ককটেল।

কোন রকমে টাইটা গলায় ঝুলিয়ে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন মিঃ ব্লোর। নিজেই নিজের চেহারার প্রশংসা করে বিড়বিড় করে বললেন, দারুণ মানিয়েছে একজন কেস্ট বি বলে মনে হচ্ছে এবার। হ্যাঁ তা তো হতেই হবে। আজ আর কোন ক্রটি রাখলে চলবে না। কিন্তু অন্য সব অতিথিদের রকম-সকম কি। সোজাসুজি আমার দিকে তাকাচ্ছে না কেউ। অথচ দেখার লোভটুকুও সামলাতে পারছে না, ঠাড়ে ঠাড়ে দেখছে,

আর কি যেন আন্দাজ করার চেষ্টা করছে। ওদের চোখ তো তাই বলছে বলে মনে হয়। তবে কি কেউ আমার ব্যাপারে কিছু জেনে ফেলেছে?

জানুক গে, শেষ পর্যন্ত কি হয়। আমার সাফ কথা হলো, আমি কি ডরাই সখী ভিখারি রাখবে। কাউকে ভয় করে তুরূপের তাসটা হাতছাড়া করবে না, সে বান্দা আমি নই। আমি শেষ দেখতে চাই-হাতের কাপলিং লাগিয়ে ঘরের বাইরে বেরুবার জন্যে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে তার দৃষ্টি আটকা পড়লো দেওয়ালের দিকে ফ্রেমে বাঁধানো তুলোট কাগজে লেখা একটি কবিতা ঝুলছে সেখানে। কবিতাটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ার পর নিজের মনে তারিফ করলেন তিনি, খাসা লিখেছে, কবির হাত যথেষ্ট ভাল, ছন্দজ্ঞান টনটনে পড়তে মন্দ লাগে না। এইসব কালোমৌনবাদের দ্বীপে এসছিলেন এর আগে আর একবার, সেই কোন্ ছেলেবেলায়। তখন কে ভেবেছিলো এমন একটা উদ্ভট কাজে আবার আমাকে ফিরে আসতে হবে নিগার আইল্যাণ্ডে।

এই মুহূর্তে ম্যাকআর্থারকে দেখলে ভয়ডরহীন লোক বলে মনে হবে। রাগে-উত্তেজনায় তার সারা শরীর থরথর করে কাঁপছিল। আগে জানলে কেউ কি সেধে এখানে আসতো। এ যেন উল্টোপুরানের দেশে এসে পড়লাম,এখানকার সব কিছুই যেন উল্টো। যিনি আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে ডেকে নিয়ে এলেন এখানে, আশ্চর্য তিনিই অনুপস্থিত। ফিরে যে যাবো, তারও কোন উপায় নেই, আর এখন, লঞ্চটা সেই যে নামিয়ে দিয়ে চলে গেলো, তারপর তার আর কোন পাত্তা নেই। এ যেন এক গভীর ষড়যন্ত্র। আমার বিরুদ্ধে একটা সুপরিকল্পিত চক্রান্ত দেখছি এখানে, রাত্রিবাস না করে উপায় নেই।

আর অন্য সব অতিথিদের সঙ্গে প্রাণখুলে যে একটু কথা বলবো তারও যো নেই। সবাইকে এখনো দেখার সুযোগ না হলেও ঐ যে লম্বার্ড, লোকটাকে একবার দেখেই কেন জানিনা আমার মনে হয়েছে, ঠিক সুবিধের নয় সে। আমার আশঙ্কা লোকটা না আমাদের উটকো ঝামেলায় ফেলে দেয়?

নৈশভোজের ঘণ্টা পড়তেই নড়ে-চড়ে উঠলো লম্বার্ড। ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির ধাপগুলো গুণে গুণে নিচে নামতে শুরু করলো। তার পায়ে ছিলো হালকা রবার সোলের জুতো, তাই একটুও শব্দ হল না, তার একটুও শব্দ হল না, তার চলার ভঙ্গি দেখে মনে হলো শিকারের সন্ধানে অতি সন্তর্পণে পা টিপে টিপে চলেছে একটা কালো চিতা আর ঠোঁটে একটা অদ্ভুত রহস্যময় হাসি।

সাত সাতটা দিন, বেশ ভালভাবেই কাটবে বলে মনে হয়।

চোখের দৃষ্টিতে একটা আনমনা ভাব মিস্ এমিলি ব্লেন্টের, পরণে কালো সিল্কের গাউন, বিছানায় শায়িত অবস্থায় হাতে একখানি বাইবেল নিয়ে তিনি তখন মৃদু কণ্ঠে পড়ে চলেছেন

নৈশভোজের ঘণ্টা পড়তেই বাইবেল মুড়ে রেখে উঠে দাঁড়ালেন মিস্ ব্লেন্ট। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন ডাইনিং রুমে।

০৩.

এক সময় নৈশভোজ শেষ হলো। রান্না বেশ ভাল মিসেস রগার্সের। খেয়ে সকলেই

আবার পানীয়, রীতিমতো পুরানো মদ, এবং সুস্বাদু। দুএক পেগ পেটে পড়তেই সবাই বেশ চাঙ্গা। সবার মনের মেঘ তখন কেটে গেছে, বাধা সরে গেছে অপরিচিতের। মেতে উঠেছে গল্প-গুজবে।

সব থেকে সতেজ সজীব যেন বৃদ্ধ ওয়ারথেন্ড, কয়েক মিনিটে তার বয়েস যেন অর্ধেক নেমে এসেছে। কথার ফুলঝুরি ফুটছে তার মুখে, চমকদার সব গল্প-ডঃ আর্মস্ট্রং এবং টনি মাস্টার্স এখন তার প্রধান শ্রোতা। ওদকে মিস ব্লেন্ট ও জেনারেল ম্যাকআর্থারের জুটিও কমতি যায় না। আর ভেরাও চুপ করে বসে থাকে না। দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাপারে তার প্রচণ্ড কৌতূহল, একের পর এক প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে চলেছে সে ডেভিসকে, তুখোড় ডেভিস তার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছে গড়গড় করে। আর প্রশ্নোত্তর পর্ব বেশ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছে লম্বার্ড মুদিত নয়নে।

হঠাৎ টেবিলের ওপর রাখা একটি কাঁচের ওপর চোখ পড়তেই মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো মাস্টার্স, দারুণ চমৎকার পুতুলগুলো তো সঙ্গে সঙ্গে তার দৃষ্টি অনুসরণ করে বললো ভেরা কি আশ্চর্য। এতক্ষণে চোখে পড়েনি তো আমার আপনাদের কারোরই নয়

বোধ হয়। আর কতগুলো পুতুলই বা-এক, দুই, চার, ছয়, আট, দশ দশ দশটি কুচকুচে কালো রঙের পুতুল, কালোমানিক, কালো নিগার। দেওয়ালের টাঙ্গানো সেই কবিতাটির কথা মনে পড়ে গেলো তার দশটি কালোমানিক কালো সোনা।

জানেন, পুতুলগুলোর দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে অতিথিদের দিকে ফিরে তাকালো ভেরা, আমার ঘরের দেওয়ালে ফ্রেমে বাঁধানো একটা অদ্ভুত কবিতা আছে কবিতাটির প্রথম কটা লাইন, হা এবারে মনে পড়েছে দশটি কালো হীরে-সুর করে পড়তে ভারী ভালো লাগে।

এ আবার নতুন কি এমন কথা। সবজান্তার মতো মৃদু হেসে সঙ্গে সঙ্গে লম্বাড বলে উঠলো, ও কবিতা আমারো পড়া, আমার ঘরের দেওয়ালেও টাঙ্গানো আছে।

আমারও! আমারও! আমারও! আমারও! প্রায় একই সঙ্গে বলে উঠলেন উপস্থিত সকলে।

ভেরার ঠোঁটে হাসি এরই নাম শখ। বুঝলেন শখ। কবিতা লিখবো অমনি হাতের কলমে বেরিয়ে এলো কবিতাটা প্রচার করতে হবে, তাই সেই কবিতাটার এক একটা নকল টাঙ্গিয়ে দেওয়া হলো প্রতিটি ঘরের দেওয়ালে মেহগনি কাঠের ফ্রেমে ঐটে। একেই বলে ধনী লোকেদের অদ্ভুত খেয়াল।

আরে না না ওসব কিছু নয়। শ্রেফ ছেলেমানুষী আর কি। বুড়ো খোকার বয়স ভাড়িয়ে বিদ্যের বহর দেখানো।

হাসছেন ওয়ারথেন, সেই ফাঁকে মদের গ্লাসে ঘন ঘন চুমুক দেওয়ার কথাটি ভোলেন নি তিনি।

ভেরার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হলো এমিলির। চোখে চোখে কি যে কথা হলো তাদের কে জানে। তবে পরক্ষণেই উঠে দাঁড়িয়ে বসবার ঘরে চলে গেলেন তারা।

গরাদবিহীন সব জানালা। সমুদ্র ঝড় উঠেছে, স্পষ্ট দেখা গেলা বসবার ঘর থেকে ঝড়ো বাতাস পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড়ে এক একটা বিকট শব্দ তুলছে।

সেই প্রাকৃতিক দৃশ্যের সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে চোখে উদাস দৃষ্টি ছড়িয়ে বললেন এমিলি অপূর্ব।

যাই বলো তুমি, সমুদ্রের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললো ভেরা, সমুদ্র আমার একেবারেই ভাল লাগে না।

তার কথা শুনে এমিলি তো অবাক। বুঝতে পেরে প্রসঙ্গ পাল্টালো ভেরা, আমি কিন্তু ভুল বলিনি, এই ধরুন না, আমাদের এই নিগার দ্বীপের কথা। এভাবে সমুদ্রে ঝড়ের দাপাদাপি চলতে থাকলে আমাদের অবস্থা কি দাঁড়াতে পারে। সে কথা কি ভেবে দেখেছেন একবারও? কতো রকম অসুবিধেই না হতে পারে। চাকর-বাকরদের ঠিক

সময়ে পাওয়ার জো নেই, এখন একবার স্টিকলহাভেনে যেতে হবে-যদি দয়া করে কেউ আসেন তবেই স্বস্তি, আপনার আনন্দ।

হ্যাঁ একটুও বাড়িয়ে বলা নয়, তবে যে দুজন কাজের লোককে পেয়েছেন মিসেস, অলিভার রগার্স আর তার স্ত্রীর কথাই ধরা যাক না কেন। রগার্সের বৌ-এর যেমন মিষ্টি হাত, তেমনি মিষ্টি মুখ। হাসি যেন লেগে আছে সব সময়।

সে কি মিসেস অলিভার কি বলছেন? যাঃ এরই মধ্যে নামধাম সব ভুলে বসে আছেন। এ যেন বুড়ো বয়সে ভীমরতি।

মুখ টিপে হাসি চাপলো ভেরা, হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন মিসেস ওয়েন সত্যিই একজন ভাগ্যবতী মহিলা বটে।

মিসেস ওয়েন? অবাক চোখে তাকালেন এমিলি যেন এই প্রথম নামটা শুনছেন তিনি।

কেন উনিই তো এ বাড়ির সব কিছু। এ বাড়ির কর্ত্রী।

এই সময় দরজা ঠেলে বাকী অতিথিরা সবাই এক এক করে ঢুকলো এ ঘরে।

এমিলির পাশের খালি চেয়ারটি দখল করলেন ওয়ারথেন্ড। ভেরার ঠিক উল্টো দিকে বসলেন আর্মস্ট্রং। ব্লোর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফায়ার প্লেসের ওপরকার ব্রোঞ্জের একটি সুদৃশ্য

মূর্তি নিরীক্ষণ করতে থাকেন। একটা চেয়ারে দেহখানি এলিয়ে দিয়ে একখানা বই-এর পাতা উল্টাতে থাকলেন, ওয়ারথ্রেভ আর ম্যাকআর্থার দেওয়ালে পিঠ দিয়ে সিগার ধরালেন।

কফির ট্রে থেকে যে যার কফির কাপ তুলে নিলো। নৈশভোজের পর কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে গিয়ে সবার মুখে একটা পরিপূর্ণ তৃপ্তির ভাব ফুটে উঠতে দেখা গেলো, এখানকার আতিথেয়তার ব্যাপারে সবাই মুগ্ধ।

ওদিকে রাত্রি গড়িয়ে চলে একটু একটু করে। ঘড়ির কাঁটা একটু একটু করে। ঘড়ির বাঁটা দুটি থেমে নেই, চলছে টিক টিক শব্দ করেনটা বেজে কুড়ি।

আর ঠিক তখনই হঠাৎ ঘরের নিস্তব্ধতা ভেঙে রেণু রেণু করে গুঁড়িয়ে দিয়ে একটা ব্রজগম্ভীর কণ্ঠস্বর ধাক্কা খেতে থাকলো ঘরের এ-দেওয়াল থেকে ও-দেওয়ালে। অলক্ষ্যে বলা সেই গায়ের লোক খাড়া করা কণ্ঠস্বর-উপস্থিত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাগণ দয়া করে আপনারা একটু শান্ত হয়ে মন দিয়ে আমার কথাগুলো শুনুন।

সুন্ধ, হতবাক সবাই, ওর মুখের দিকে তাকালেন, ভাবখানা এই যে ব্যাপারটা কারোর জানা আছে কি না। সেই ঘরের দরজার জানালাগুলোর দিকেও তাকালেন তারা, যদি সেখানে দেখা যায় কোন অপরিচিত মুখ, যে কিনা-না, কাউকেই তো চোখে পড়লো না। তাহলে কে-কে কথা বললো অমন করে?

শ্রীমদে দেব দেহার গুহাজ নান । শ্রীগাথা ত্রিষ্টো উপন্যাস

তাদের ভাববার জন্য একটু সময় দিয়ে ভেসে উঠলো আবার সেই বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর, অতিথিদের উপস্থিতিতে প্রচণ্ড বিদ্রূপ করে সেই অদৃশ্য মানুষের কণ্ঠস্বর ঘরের চার দেওয়ালে অণুরণিত হয়ে ফিরতে থাকলো বিধাতার অমোঘ বিধানের মতো।

তাহলে এবার খোলাখুলি ভাবেই বলি, আমার বিচারে আপনারা প্রত্যেকেই কেউ না কেউ এক একটি অপরাধের আসামী। আপনাদের অপরাধগুলো শুনুন তাহলে

এডওয়ার্ড জর্জ আর্মস্ট্রং আপনার মনে পড়ে, ১৬ই মার্চ ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে আপনি লুইজা মেরী ব্লিজের মৃত্যুর জন্য দায়ী আপনিই।

এমিলি ক্যারোলিন ব্লেন্ট, ৫ই মার্চ ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে বেট্রিস টেইলরের মৃত্যুর জন্য আমি আপনাকেই দায়ী করছি।

ফিলিপ লম্বার্ড, তারিখটা ঠিক আমার মনে নেই তবে ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসের কোন এক তারিখে পূর্ব-আফ্রিকার একুশজন আদিবাসিকে ভয়ঙ্কর নৃশংস ভাবে হত্যা করার অপরাধে আমি আপনাকেই অভিযুক্ত করছি।

আচ্ছা জন গোরদোন ম্যাকআর্থার বলুন তো কেন আপনি ১৪ই জানুয়ারি ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে দারুণ বুদ্ধি কাটিয়ে আপনি আপনার স্ত্রীর প্রেমিক আর্থার রিচমণ্ডকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন?

অ্যান্টনি জেমস মাস্টার্স গত নভেম্বরের ১৪ তারিখে আপনার জন্যই জন কোম্বস ও লুসি কোম্বসকে মৃত্যুবরণ করতে হয়।

টমাস রগার্স আর ইথেল রগার্স আর মনে পড়ে ৬ই মে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে মিস্ জেনিফার ব্র্যাডি কার হাতে খুন হয়েছিলেন? হা, হা আপনাদের হাতেই।

আর শেষ অভিযোগ হলো লরেন্স জন ওয়ারথের বিরুদ্ধে ১০ই জুন ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে এডওয়ার্ড সিটনের মৃত্যুর জন্য মূলতঃ দায়ী।

উপস্থিত অপরাধীগণ আপনাদের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগগুলো তো শুনলেন আমার তো মনে হয় না আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য আপনাদের কোন বক্তব্যই থাকতে পারে, থাকতে পারে কি?

নীরব হল সেই ভয়াবহ কণ্ঠস্বর। সেই সঙ্গে ঘরে নেমে এল বুক নিস্তব্ধতা। সেই অদৃশ্য মানুষের বজ্রগম্বীর স্বর বন্ধ হয়ে গেলেও রেশটুকু যেন অগুরণিত হয়ে ফিরতে থাকলো ঘরের মধ্যে।

আর সেই নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে খান্ খান্ করে একটা কান্নার শব্দ উঠলো। শব্দটা কোথেকে আসছে দেখার জন্য চোখ তুলে তাকালেন সবাই এদিক ওদিক, রগার্সের হাত থেকে কফির ট্রেটা পড়ে যাওয়ার শব্দ

ঠিক তখনি ঘরের বাইরের কোন কান্নারত নারী আত্ননাদ করতে করতে যেন মাটির ওপরে লুটিয়ে পড়লো ।

প্রথমে লম্বার্ড ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটে এলো বাইরে । মিসেস রগার্সকে বারান্দায় পড়ে থাকতে দেখলো সে । সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠলো সে মিঃ মাস্টার্ন তাড়াতাড়ি একবার বাইরে আসুন তো ।

দুজনে মিলে ধরাধরি করে ইথেল রগার্সের অচৈতন্য দেহটা বহন করে নিয়ে এলো বসবার ঘরে । শুইয়ে দিলো একটা সোফার উপরে ।

ডঃ আর্মস্ট্রং রুগিনীর নাড়ি পরীক্ষা করে জানিয়ে দিলেন ভয়ের কিছু নেই, দু, এক মিনিটের মধ্যেই জ্ঞান ফিরে পাবে ।

জলদি একটু ব্রাণ্ডি নিয়ে এসো তো, রগার্সের দিকে ফিরে বললল লম্বার্ড ।

কাজগের মতো সাদা ফ্যাকাসে মুখ করে বললো রগার্স হ্যাঁ এখুনি নিয়ে আসছি স্যার ।

ঘর থেকে পায়ের শব্দ মিলিয়ে যেতে না যেতেই প্রথমে ভেরাই চিৎকার করে উঠলো, কিন্তু কার সেই কণ্ঠস্বর?

ঠিক বুঝতে পারছি না, একবার চারদিক তাকিয়ে দেখে নিয়ে বললেন ম্যাকআর্থার। কি সব উপদ্রব যে শুরু হলো এখানে। অতিথিদের এখানে নিমন্ত্রণ করে ডেকে এনে কতগুলি এ কেমন রসিকতা? শেষের দিকে তার গলার স্বর কেঁপে উঠলো।

দেখে মনে হলো রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছলেন ব্লোর, কিন্তু আসলে তার মুখের অসহায় ভাবখানি রুমাল দিয়ে ঢাকতে চাইলেন।

কোন অবাস্তব লক্ষ্য করা গেলো না কেবল দুজনের মিঃ ওয়ারথেন্ড ও মিস ব্লেন্টের। দুজনেই স্বাভাবিক ভঙ্গিমায় প্রত্যক্ষ করতে থাকলেন ঘটনাটি।

আর্মস্ট্রংয়ের হাতে ইথেলের দেখাশোনা করার ভার তুলে দিয়ে এবার মুখ খুললো লম্বার্ড, আচ্ছা, কথাগুলো ও-ঘর থেকেই ভেসে এলো বলে মনে হলো না?

কিন্তু তাই বা কি করে সম্ভব? তার কথার জের টেনে বললো ভেরা, তখন আমরা সবাই তো-ঘরেই ছিলাম।

তাই তো খুব চিন্তায় পড়লো লম্বার্ড। ঘরের চারপাশে দৃষ্টি ফেলতে গিয়ে হঠাৎ ফায়ার প্লেসের পাশের একটা ছোট দরজার উপর তার দৃষ্টি আটকে গেলো। ঐ দরজা পথে অনায়াসেই পাশের ঘরে যাওয়া যায়।

কথাটা মনে হতেই দ্রুত পায়ে ছুটে গেলো দরজার দিকে। তারপর দরজার হাতল ধরে, সজোরে টান দিতেই খুলে গেলো পাল্লা আর ওপাশের ঘরের দিকে বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে তাকিয়েই অস্ফুটে ছোট্ট একটি শব্দ বেরিয়ে এলো তার ঠোঁট কাঁপিয়ে ওটা কি?

ইতিমধ্যে তাকে অনুসরণ করে হাজির হয়েছিলেন সবাই, কেবল মিস্ ব্লেন্ট ছাড়া তিনি তেমনি নির্লিপ্তভাবে বসে রইলেন।

পাশের ঘরে প্রবেশ করার প্রয়োজন হলো না, বাইরে থেকেই সবাই স্পষ্ট দেখলেন সেই যন্ত্রটি একটি সাবেকি চোঙওলা গ্রামাফোন। একটা রেকর্ড ডিস্কের ওপরে, তখনো ঘুএছিল ডিস্কটা। চারটি ছোট গর্ত দেয়ালে, রেকর্ডের কথাগুলো এই গর্তগুলোর ভেতর দিয়ে এসেই এপাশের ঘরের অতিথিদের চমকে দিয়েছে।

ঝুঁকে পড়ে সাউণ্ড-বক্সের পিনই রেকর্ডের প্রথম দাগটার উপর রাখা মাত্র সেই অদৃশ্য মানুষটির বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর আবার জেগে উঠলো এপাশের ঘরে। উপস্থিত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাগণ দয়া করে আপনারা একটু শান্ত হয়ে মন দিয়ে আমার কথাগুলো শুনুন—

দয়া করে বন্ধ করুন, আর শুনতে চাই না, উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠল ভেরা। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামাফোনের বোতাম টিপে বন্ধ করে দিলো লম্বার্ড।

এতোক্ষণ ডঃ আর্মস্ট্রং যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন, উঃ এমন বীভৎস রসিকতা জীবনে এই প্রথম দেখলাম।

তার মানে এই প্রথম মুখ খুললেন ওয়ারথ্রেভ । ওটাকে আপনি কি শ্রেফ রসিকতা বলেই ধরে নিলেন?

এ ছাড়া, আর কি ভাবতে পারি?

ঠিক আছে, তবে এব্যাপারে এখন আমি আমার মতামতটা জানাতে চাই না ।

রাখুন আপনার মতামত ।

মধ্যে কে গিয়ে এ-গ্রামাফোনটা চালিয়ে এসেছিলেন?

হু আমার প্রশ্নও তাই, বাকী অতিথিদের মুখের ওপরে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললেন অভিজ্ঞ বিচারপতি ওয়ারথ্রেভ আগে এর উত্তরটা জানা দরকার ।

এই সব ব্রাণ্ডির গ্লাস হাতে বসবার ঘর প্রবেশ করলেন রগার্স । স্ত্রীর কানের কাছে মুখ নামিয়ে এনে উদ্বিগ্ন স্বরে শুধালো রগার্স, ওঠো, ওঠো ইথেল ... এখন তুমি কেমন বোধ করছে ইথেল?

তার ডাক শুনে ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকালো মিসেস রগার্স, তার দৃষ্টি ছাদের দিকে উদ্ভ্রান্ত । কথা বলল না সে ।

আরো একটু চিন্তিত হয়ে এবার সে তার প্রায় কানের ওপর ঠোঁট রেখে জিঙেস করলো
রগার্স কথা বলো ইথেল চুপ করে থেকো না প্লিজ

ডঃ আর্মস্ট্রং এগিয়ে গিয়ে মিসেস রগার্সের একখানি হাত তুলে নিয়ে নাড়ি টিপে বলে
উঠলেন ভয়ের কিছু নেই এখন আর। ইথেলের উদ্দেশ্যে তিনি এবার বললেন, একটু
চেষ্টা করলেই তুমি ঠিক উঠে বসতে পারবে, চেষ্টা করো

কিন্তু আমার কি হয়েছে? এভাবে আমাকে শুইয়ে রেখেছেনই বা কেন? আর্মস্ট্রংয়ের
দিকে তাকিয়ে জিঙেস করলো ইথেল।

কিছুই হয়নি তোমার, মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলে।

হ্যাঁ, এবারে মনে পড়েছে তার চোখ দুটি আবার কি যেন খুঁজে ফেরে, আর মন যেন বলে
উঠে, আমার কিছু হয়নি, উনি বললেই হলো নাকি। আমি যে নিজের কানে শুনেছি, সেই
ভয়ঙ্কর কণ্ঠস্বর, সেই মারাত্মক অভিযোগ, অদৃশ্য মানুষটি আমাদের অপরাধের বিচার
করছিলেন। কিন্তু আমাদের কি অপরাধ? তারপরেই ইথেনের চোখের পাতা বুজে গেলো।
জোরে জোরে নিশ্বাস টানতে থাকলো, বেশ বোঝা যাচ্ছিল তার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল।

কই ব্রাণ্ডির গ্লাসটা দেখি। হাত বাড়ালেন আর্মস্ট্রং। ব্রাণ্ডির গ্লাসের সবটুকু পানীয়
গলধঃকরণ করার পর ইথেলের মুখের ফ্যাকাসে ভাবটা কেটে গিয়ে তার মুখের ওপর

আগের মতো আবার গোলাপী আভা ফুটে উঠতে দেখা গেলো। এবং স্বাভাবিক স্বরেই বললো সে এবার আর আমার কোন কষ্ট নেই, সম্পূর্ণ সুস্থ আমি এখন। তবে সেই বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বরটা শুনে ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।

তা ঘাবড়াবারই তো কথা। তার মুখের কথাটি কেড়ে নিয়ে গার্স বলে উঠলো, ওঃ তার সেই সব অভিযোগগুলোর ভাষাই বা কি ভয়ঙ্কর। শুনে তো ভয়ে আমার হাত থেকে ট্রেটাই পড়ে গেলো। যতো সব-সে হয়তো আরো কিছু বলতো কিন্তু পারলো না। শেষ শব্দটা তার মুখ থেকে উচ্চারিত হওয়ার পরমুহূর্তেই কে যেন কাশলেন সঙ্গে সঙ্গে থামলো সে। কাশির শব্দকো খক্ খক্ একটা শব্দ, আর তাতেই থামতে হলো তাকে।

ওদিকে আর একবার কাশি দমন করলেন বিচারপতি ওয়ারথেন্ড রুমালে মুখ চেপে। তারপর রগার্সের দিকে ফিরে বললেন তিনি, আমি কিন্তু সেই প্রশ্নটার জবাব এখনো পাইনি, আচ্ছা রগার্স সত্যি করে বলতো গ্রামাফোনটা কি তুমিই চালিয়ে দিয়েছিলে আমাদের সবার অলক্ষ্যে।

হ্যাঁ আমিই চালিয়েছি। কিন্তু বিশ্বাস করুন স্যার, কান্নার মতো শোনালো রগার্সের কণ্ঠস্বর, ঐ রেকর্ডে কি আছে আগে আমি কিছুই জানতাম না। জানলে কি আর চলাই

তা না হয় মেনে নিলাম। কিন্তু কেনই বা তুমি চালাতে গেলে বলতো?

হ্যাঁ নিশ্চয়ই বলবো স্যার, একটু দম নিয়ে সে তার কথার জের টেনে বললো, আমার ওপর নির্দেশ ছিলো।

কার নির্দেশ?

মিঃ ওয়েনের।

তাই বুঝি। মিঃ ওয়েন তোমাকে আর কি নির্দেশ দিয়েছিলেন বলো।

ড্রয়ার খুলে রেকর্ডটা বার করে ডিস্কের ওপর বসিয়ে দিয়ে যাই। ভাবলাম আপনাদের কফি করার সময় ইথেল এ ঘরে গিয়ে চালিয়ে দেবে গ্রামাফোন। কথা মতো সেইরকম হয়েছে?

বাঃ বাঃ চমৎকার একটা আঘাতে গল্প ফেঁদে বসলে তো, ওয়ারথের ঠোঁটে একটা সূক্ষ্ম ব্যঙ্গের হাসি ফুটে উঠলো।

না স্যার, এটা কোনো আঘাতে গল্প নয়। বিনীত স্বরে বললো রগার্স, ঈশ্বরের নামে আমি শপথ নিয়ে বলছি এ সবই সত্যি, এর মধ্যে এতটুকু মিথ্যার আশ্রয় নেই। ঐ রেকর্ডটার মধ্যে সত্যি কি আছে, আমি তার বিন্দু বিসর্গ জানতাম না। আমার ধারণা ছিলো ওটা কোনো গানের রেকর্ড-টেকর্ড হবে। মিঃ ওয়েন আমাকে বাজিয়ে শোনাতে বলে থাকবেন। তা ঐ রেকর্ডটার ওপর চাকতিতে কি যেন একটা নাম লেখা ছিলো

চিন্তিত ওয়ারথ্রেভ বললেন, তুমি আমাদের গান শোনাতে চেয়েছিলে? তা সেই চাকতিতে কি লেখা ছিল দেখেছ?

তা তো ঠিক মনে নেই স্যার

আমি দেখেছি। সমুদ্র-পাখীর গান। দারুণ মিষ্টি নাম তাই না? দাঁত বার করে হাসলো লম্বার্ড।

মিথ্যে, সব মিথ্যে, সব বানানো গল্প। হঠাৎ রাগে চিৎকার করে উঠলো ম্যাকআর্থার। এই অন্যায় অভিযোগের একটা প্রতিকার দরকার। মিঃ ওয়েনকে ডাকো এখনি। ঐ শঠ, প্রতারক, নচ্ছাটাকে একবার হাতের কাছে পেলে আমি

হাতের ইঙ্গিতে তাকে থামতে বললেন। এমিলি, উনি তো ঠিকই বলেছেন। কে, কে এই মিঃ ওয়েন?

এই প্রশ্নটা আমারও, তাকে সমর্থন করলেন ওয়ারথ্রেভ, এই রসিকবরযিনিই হোক না কেন, তাঁকে আমার সশরীরে একবার দেখতে চাই। শোনো রগার্স, তুমি এক কাজ করো, তোমার অসুস্থ স্ত্রীকে ওর বিছানায় শুইয়ে দিয়ে চট-জলদি ফিরে এসো এখানে, তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।

ইথেলকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে রগার্সকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন ডঃ আর্মস্ট্রং। দুজনে ধরাধরি করে ইথেলকে নিয়ে ঘরথেকে বেরিয়ে যেতেই উঠে দাঁড়ালো মাস্টার্ন, অনেকক্ষণ থেকেই উসখুস করছিল সে। আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে তো আমি তাহলে এক পাত্তর

দয়া করে আমাকেও একটু দেবেন, মাস্টার্নকে অনুসরণ করলো লম্বার্ড।

দুজনে ফিরে এলো একটু পরে পানীয়র গ্লাস সাজানো ট্রে হাতে নিয়ে। ম্যাকআর্থার ও ওয়ারথ্রেভ তুলে নিলেন হুইস্কি গ্লাস। অন্যেরা ব্রাণ্ডি। কেবল এমিলিই ও-রকম অনাসক্ত, নিলেন শুধু এক গ্লাস জল।

খানিক পরে ফিরে এসে সবাইকে সুরা পান করতে দেখে ডঃ আর্মস্ট্রং বললেন, মিসেস রগার্সকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ফিরে আসতে একটু দেরী হলো বলে কি আমি ও রসে বঞ্চিত হবো? এ অধর্মের প্রতি একটু দয়া করুন ভাই।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে চললো পানোৎসব। এক সময় রগার্স ফিরে এলো।

রগার্সের উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে ঘরটা পরিণত হলো যেন এক বিচারকক্ষ। আর বিচারপতির ভূমিকা নিলেন প্রধান বিচারপতি ওয়ারথ্রেভ। শুরু করলেন তার জেরা।

এখনো বলো রগার্স, মিঃ ওয়েনের ব্যাপারে তুমি ঠিক কতটুকু জানো।

এই দ্বীপ, এই প্রাসাদ, সব কিছুই মালিক তিনি ।

নতুন করে সে খবর জানতে চাই না তোমার কাছে থেকে । আমি সেই লোকটার সম্পর্কে জানতে চাই । বলো কি জানো তুমি আমার সম্পর্কে?

কিছুই তো জানি না স্যার । আসলে আমি তাকে দেখিইনি কোনোদিন ।

অবাক চোখে সবাই এ ওর দিকে তাকায় । প্রতিবাদ করে উঠলেন ম্যাকআর্থার, বড় অদ্ভুত কথা তুমি শোনালে তো । কোনদিন দেখনি মানে?

বিশ্বাস করুন সত্যিই তাঁর সঙ্গে আমার সামনা-সামনি দেখা হয়নি । কৈফিয়ত দেয় রগার্স আসলে আমার চাকরী এখানে মাত্র এক সপ্তাহের জন্যে । প্লিমাউথ রেজিনা এজেন্সিতে আমাদের নাম লেখানো ছিলো, তাদের সুপারিশেই আমার এই চাকরী । তা সেই চাকরীর চিঠিতেই লেখা ছিল কবে এখানে আসতে হবে আমাদের । চলে এলাম । এখানে এসে দেখি সাজানো প্রাসাদ, খাবারের ঘরে নানান ধরনের খাবার মজুত, থরে থরে পানীয়ের বোতল সাজানো ওয়াইন ক্যাবিনেটে ।

তারপর

তারপর আর একখানি চিঠি পেলাম। এখানে নাকি একটা ঘরোয়া পার্টি দেবেন মিঃ ওয়েন, ঘরদোর যেন সাফ করে রাখি। তাও রাখলাম। কিন্তু গতকালই এলো তৃতীয় চিঠি। সেই চিঠিতে মিঃ ওয়েন জানিয়েছেন অনিবার্য কারণবশতঃ তিনি আসতে পারবেন না, আর তার স্ত্রীও আসছেন না। তবে আমাদের সেবা-যত্নের ক্রটি আমরা যেন না রাখি। আর সেই চিঠিতেই নির্দেশ ছিলো নৈশভোজের পর কফি দেওয়া হয়ে গেলে যেন গ্রামাফোন

সেই চিঠিখানা দেখাতে পারো?

নিশ্চয়ই সেটা আমার পকেটে আছে। এই দেখুন স্যার। চিঠিটা পকেট থেকে বার করে তাঁর হাতে তুলে দিলে রগার্স।

অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে চিঠিটা দেখলেন ওয়ারথেন্ড। পড়া শেষে মুখ তুলে তাকালেন তিনি, দেখছি চিঠির ওপরে রিৎজ হোটেলের ঠিকানা লেখা আছে। আর চিঠিটাও টাইপ করা, কালির আঁচড় টানা নেই কোথাও।

দেখি চিঠিটা একবার। এরকম ছিনিয়েই নিলেন ব্লোর চিঠিখানা। চিঠির প্রতিটি অক্ষরের উপর তার সতর্ক দৃষ্টি ঘোরাফেরা করে। হ্যাঁ একেবারে নতুন করোনেশান টাইপ মেশিনে টাইপ করা চিঠি। কাগজখানাও বেশ দামী। না, শুধু চিঠি দেখে এর বেশী কিছু

আড়চোখে ব্লোরকে একবার নিরীক্ষণ করে নিলেন ওয়ারথ্রেভ। তারপর এটু নড়েচড়ে বসলেন তিনি, চকিতে একবার সকলের মুখের ওপর দৃষ্টি বোলালেন, একটু কেশে নিয়ে বললেন এ সবার পর আমার মনে হয়, আমাদের এখনো চুপচাপ বসে থাকাটা ঠিক হবে না। কিছু একটা করতেই হবে। তবে তার আগে এখানে আসার ব্যাপারে আপনারা যে যেটুকু জানেন, বলুন। মনে কোন দ্বিধা রাখবেন না, সংকোচ করবেন না। জানার অনেক কিছুই বাকী আছে এখনো। ঘটনাক্রমে আমরা সবাই মিঃ ওয়েনের অতিথি হয়ে এসেছি এখানে। তার সঙ্গে যোগাযোগ পর্ব কি করে সম্ভব হলো, সেটা এখন খতিয়ে দেখতে হবে।

তারপরেই অখণ্ড নীরবতা।

মিস এমিলি ব্লেন্ট মুখ তুললেন, তিনিই প্রথম সেই নীরবতা ভঙ্গ করলেন, দেখুন আমার ব্যাপারটা আগাগোড়াই কেমন যেন গোলমালে। কদিন আগে ডাকে একখানা চিঠি পাই। সেইটা এমনি দুর্বোধ্য যে, প্রেরকের নাম বোঝার উপায় ছিলো না। তবে চিঠিটা ছিল একজন মহিলার। দুতিন বছর আগে গ্রীষ্মের ছুটিতে বেড়াতে গিয়ে কোথাও হয়তো দেখা হয়ে থাকবে তাঁর সঙ্গে। নাম মনে নেই-মিস্ ওরডেন কিংবা মিসেস অলিভারও হতে পারেন, কারণ বেড়াতে গিয়ে এ দুজন মহিলা ছাড়া আর কারোর সঙ্গে আমার আলাপ হয়নি। বিশেষ করে মিসেস ওয়েন নামের কারোর সঙ্গে তো নয়ই।

তা সেই চিঠিখানা দেখতে পারেন?

হ্যাঁ পারি বৈকি । একটু অপেক্ষা করুন আমি এখনি আসছি, ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন মিস ব্রেন্ট । মিনিট খানে পরেই আবার ফিরে এলেন তিনি চিঠি হাতে নিয়ে ।

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চিঠিটা পড়লেন ওয়ারগ্রেন্ড । আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বিজ্ঞের মতো বললেন তিনি ব্যাপার একটু একটু করে পরিষ্কার হচ্ছে, তবে মেঘ এখনো পুরোপুরি কাটেনি । মিস ব্রেন্টের দিকে ফিরে বললেন তিনি, এবারে আপনি বলুন ।

সেক্রেটারীর চাকরীটা প্রাপ্তির ব্যাপারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব ঘটনাই বলে গেলো ভেরা এক এক করে ।

তার কথা শোনার পর মাস্টারের দিকে ফিরে বললেন ওয়ারগ্রেন্ড । আর ডঃ আর্মস্ট্রং আপনি? আপনি এসেছেন কেন এখানে?

চিকিৎসক হিসেবে ।

এ বাড়ির কর্তার সঙ্গে আপনার কি আগে থেকেই পরিচয় ছিলো?

না, একেবারেই নয় । তবে চিঠিতে আমার এক সহকর্মীর নামের উল্লেখ ছিলো ।

আর সেই সহকর্মীটির সঙ্গে বহুদিন আপনার কোন যোগাযোগ নেই এই তো?

ও হ্যাঁ, সেই রকমই বটে।

ঠিক আছে, এবার অন্য দিকে মুখ ফেরালেন ওয়ারথেন্ড, জেনারেল ম্যাকআর্থার এবার আপনার যা বলার আছে বলুন।

নতুন করে বলার কিছু নেই, প্রত্যুত্তর বললেন ম্যাকআর্থার খোদ মিঃ ওয়েনের চিঠি পেলাম, চিঠিতে পুরনো বন্ধুদের নাম উল্লেখ ছিলো, তাদেরও নাকি এই দ্বীপে আসার কথা, তাই চলে এলাম, এই আর কি।

এবার আপনি বলুন মিঃ লম্বার্ড।

আ-আমি? আমতা আমতা করে নিজের মনে মনে ভাবলো লম্বার্ড, আসলে কথাটা এই মুহূর্তে বলা যাবে না এখানে। বললে পরে পস্তাতে হবে। তাই সহজ ভাবে বললে সে চিঠি পেলাম চলে এলাম। এক সময় মিঃ ওয়েনের সঙ্গে আলাপ হয়েছিলো, তাই

এবার ব্লোরের পালা। ডান হাতটা গালের ওপর স্থাপন করে শান্ত এবং দৃঢ় স্বরে বললেন ওয়ারথেন্ড এখন এই অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে দিয়ে আমাদের সময় কাটছে। এই তো একটু আগে এক অদৃশ্য কণ্ঠস্বর নাম উল্লেখ করে আমাদের সকলের অপরাধের ফিরিস্তি দিয়ে গেলো এক এক করে। সে যাইহোক, অভিযোগগুলোর কথায় পরে আসছি। তবে এই মুহূর্তে অতি তুচ্ছ হলেও অতি প্রয়োজনীয় একটা সমস্যার সমাধান না করে স্বস্তি পাচ্ছি না। যে দশজনের নাম একটু আগে উল্লেখিত হলো, তাদের মধ্যে উইলিয়াম

হেনরি ব্লোর একজন। কিন্তু আমি যতটুকু জানি, আমাদের মধ্যে ব্লোর নামে কেউ নেই। একজন বটে, তবে তার নাম ডেভিস। এখন বলুন মিঃ ডেভিস, আপনার কি বলার আছে?

আপনি একজন বিচক্ষণ বিচারপতি, আমি ধরা পড়ে গেছি। ব্লোরের ঠোঁটে স্নান হাসি তাই এখন আর স্বীকার করতে বাধা নেই, আমি হ্যাঁ আমিই সেই ব্লোর উইলিয়াম হেনরি ব্লোর।

উনি যে এখানে শুধু নাম ভাড়িয়ে এসেছেন তা নয়, ওঁর অনেক গুণকীর্তন আছে। ব্লোর এর দিকে সরাসরি তাকিয়ে লম্বার্ড এবার তীক্ষ্ণ স্বরে আক্রমণ করলে তাকে, আপনি প্রতারক, আপনি প্রবঞ্চক। খানিক আগে কথা প্রসঙ্গে আপনি বলেছিলেন, আপনি নাকি জন্ম থেকেই নাটালে কাটিয়েছেন। সে কথাও ডাহা মিথ্যে। আমি বাজি ধরে বলতে পারি জন্ম থেকে তো দূরের কথা জীবনে একটি দিনের জন্যেও আপনি নাটালে যাননি।

যেন একটা শক্তিশালী বোমা ফাটালো লম্বার্ড। আটজোড়া চোখের জ্বলন্ত দৃষ্টি গিয়ে পড়লো ব্লোরের উপর। মাস্টারের রক্ত বোধহয় আরো একটু বেশী গরম, ব্লোরের দিকে ছুটে গেলো সে ঘুষি বাগিয়ে কি সত্যবাদী কি জবাব দেবেন এখন?

তাতে কোনো দ্রক্ষেপ নেই ব্লোরের। তেমনি চেয়ারে পিঠ এলিয়ে ঘরের ছাদের দিকে চোখ তুলে জবাব দিলেন তিনি আপনারা ভুল করছেন। আমি জানি আমার সম্পর্কে এখানে আসার মুহূর্তে থেকেই একটা বাজে ধারণা করে নিয়েছেন। এর পর আমি আর

কেবল নীরব শ্রোতা হয়ে বসে থাকতে পারি না, সত্যি কথাই বলছি শুনুন-আমি একজন অবসর প্রাপ্ত সরকারী গোয়েন্দা, পল্লিমাউথে আমার একটা এজেন্সী আছে। এই কাজে আমাকে নিয়োগ করা হয়েছে বলেই আমি এখানে এসেছি, তা না হলে আসতাম না।

তা আপনার সেই নিয়োগ কতটা কে জানতে পারি? একটু রক্ষস্বরেই জিজ্ঞেস করলেন ওয়ারগ্রেভ।

মিঃ ওয়েন। চিঠির সঙ্গে তিনি আমাকে কিছু আগাম টাকাও পাঠিয়ে দেন। আর চিঠিতে নির্দেশ ছিল, এখানে আমাকে আসতে হবে ছদ্মনামে, পরিচয় গোপন রেখে আপনাদের মানে অতিথিদের দলে মিশে গিয়ে আপনাদের ওপর নজর রাখতে হবে।

নজর রাখতে হবে, তার মানে?

বাঃ নজর রাখতে হবে না? মিসেস ওয়েনের কত না সোনাগয়না এখানে মজুত আছে, চুরি হওয়ার ভয় নেই? ব্যঙ্গ করে বললেন ব্লোর তবে আমার ব্যক্তিগত মতামত যদি জানতে চান তাহলে বলবো আদৌ ওয়েন নামে রক্তমাংসের কোন মানুষের অস্তিত্ব কখনো ছিলো না কোথাও আজও নেই।

আপনার ধারণা অভ্রান্তঃ মিঃ ব্লোর। চিন্তিতভাবে ঘাড় নাড়লেন ওয়ারগ্রেভ আমরা দশ দশজন অতিথি এখানে এসে পৌঁছলাম অথচ কি আশ্চর্য তিনি এখনো এলেন না এখানে। তার থেকেও বড় আশ্চর্য হল, আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে যিনি চেনেন

ওয়েনদের। আমাদের সকলের কাছেই তিনি এখনো অপরিচিত অজ্ঞাত পুরুষ। আড়াল থেকে একে পর এক নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন, আর আমরা মুখের মতো নীরবে তার সব আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি, তার সেই সব উদ্ভট কল্পনার শিকার হয়েছি কেউ, ভবিষ্যতেও হবো কেউ না কেউ। অর্থাৎ তিনি হলেন কি না কে অতি নিপুন শিকারী আর আমরা হলাম গিয়ে মূর্খ শিকার তার।

এসব হলো পাগলের খেয়াল বুঝলে, তার সব কল্পনার মধ্যেই রয়েছে পাগলামির ছাপ, প্রতিবাদ কর উঠলেন ভেরা।

অলক্ষ্যে অতি সন্তর্পণে ভেরার দিকে একবার তাকিয়ে মাথা নিচু করে বিড়বিড় করে বকে গেলেন বিচারপতি ওয়ারথেন্ড। হুঁ তা যা বলেছেন, হ্যাঁ সত্যিই তো পাগলামি ছাড়া আর কিই বা হতে পারে? এখানে আমাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত জেনেও গলা ফাটিয়ে কেন জানি না আমার বলতে ইচ্ছা হচ্ছে, আমরা পড়েছি এমন এক লোকের পাল্লায় যে কি না অমানুষ নরঘাতী, নিষ্ঠুর এক বদ্ধ পাগল।

08.

এক সময়ে ঘরে নামলো এক অদ্ভুত নীরবতা। সময় বসে থাকে না কারোর জন্য। ঘড়ির কাঁটাগুলো তাদের স্বাভাবিক গতিতে টিকটিক ধবনি তুলে এগিয়ে চলে, কোথায় থামতে হয় তাও জানে না। আর ওয়ারথ্রেভও থেমে থাকলেন না। তার দৃষ্টি পরিক্রমা করে ভীত-সন্ত্রস্ত কয়েক জোড়া চোখের ওপর, পরিক্রমা শেষে শান্ত অবিচলিত স্বরে বললেন তিনি তদন্তের প্রথম পর্যায়ের কাজ আপাতঃ শেষ, এর পর শুরু হবে দ্বিতীয় পর্যায়ের তদন্ত। ও হ্যাঁ, ভুলেই একটা চিঠি পাই পকেট থেকে সেই চিঠিটা বার করে রাখলেন তিনি টেবিলের ওপর, উনি আমার পুরনো বান্ধবী। অবশ্যই অনেক বছর হলো তার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ ছিল না। চিঠিটা পড়ে প্রথমে একবারও মনে হয়নি, তিনি ছাড়া অন্য কেউ লিখতে পারেন। সেই পরিচিত ভাষা কাটা কাটা কথা পরিস্কার করে কিছু না বলা, লেখার ভঙ্গিমা সব ছবছ তার মতো। কিন্তু পরে আমার ধারণা পাল্টাতে হলো। আপনাদের ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করার পরেই আমার এই পরিবর্তিত সিদ্ধান্ত আমার যা মনে হয়েছে। তা এই যে চিঠিটা যেই পাঠিয়ে থাকুন না কেন, আমাদের সম্বন্ধে সমস্ত ব্যাপারই আগাগোড়া তার জানা। আমার ও লেডী কনস্টান্সের সম্পর্কে অজানা কিছু লেখা সম্ভব হতো না। ডঃ আর্মস্ট্রং-এর বেলাতেও একই কথা প্রযোজ্য। আবার দেখুন সবজান্তার মতো মিঃ মাস্টার্সের বন্ধু ডাকনামটাও তার জানা রয়েছে কেমন। এরপর আসা যাক মিস্ ব্লেন্টের কথায় দুবছর আগে গ্রীষ্মের ছুটি কাটাতে তিনি যে বাইরে বেড়াতে গিয়েছিলেন, এ খবরটিও সংগ্রহ করে রেখেছেন তিনি। আর জেনারেল ম্যাকআর্থারের সম্পর্কে কম কিছু জানেন না তিনি। অতএব এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে

আমাদের অনেক খবরই তিনি জানেন আর সেই সব খবরের ভিত্তিতেই তাই তো তিনি আমাদের বিরুদ্ধে এমন নির্দিষ্ট অভিযোগ আনতে পারলেন তা তো সবাই আপনারা নিজের কানে শুনলেন।

সঙ্গে সঙ্গে একটা চাপা গুঞ্জন উঠলো। সকলের মুখ বেশ থমথমে। এঁদের মধ্যে ম্যাকআর্থার থাকতে না পেরে ভয়ঙ্কর ক্রোধে ফেটে পড়লেন সব মিথ্যে মিথ্যে অভিযোগ। আমি বিশ্বাস করি না। এই মিথ্যে কলঙ্ক আমি কিছুতেই মেনে নেবো না।

ঠিক কথা, মিথ্যে কলঙ্কই তো। তাঁর ক্রোধ যোগালেন ভেরা, আমিও মানছি না এই মিথ্যে অভিযোগ।

হ্যাঁ মিথ্যেই তো বটে, রগার্সও তার ক্ষোভ প্রকাশ করলো, আমি জোর দিয়ে বলতে পারি আমরা কেউ কোন অন্যায় করিনি করতে পারি না।

এঁকে পাগলা ষাঁড়ের কীর্তি ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? শ্লেষের সুরে বললো মাস্টারন এই নির্জন দ্বীপে আমাদের ডেকে নিয়ে এসে মজা লুটতে চাইছে নচ্ছারটা। ওর বাঁদরামো এখুনি ঘোঁচাতে হবে।

হাতের ইশারায় সকলকে শান্ত হতে বললেন ওয়ারগ্রেভ। তাতে কাজ হলো শান্ত হলেন সকলে। তারপর তিনি আবার বললেন, তা আমার কথাই ধরুন না কেন? এডওয়ার্ড সিটনের হত্যার ব্যাপারে আমি দায়ী না, অপরাধীও নই। কিন্তু সিটনের কেসটা আমার

স্পষ্ট মনে আছে আজও। উনিশশো তিরিশ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের কোনো একটা দিন হবে। আমার, এজলাসেই উঠেছিল তার মামলা। একজন বয়স্ক মহিলাকে হত্যা করার অভিযোগে তার বিচার চলছিল। পুলিশ রিপোর্ট, সাক্ষ্য প্রমাণ সবই তার বিরুদ্ধে। কিন্তু আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সরকার পক্ষের উকিলের জেরার উত্তরে সে তার সব অভিযোগ খণ্ডন করে সে এমন সব তথ্য আদালতের সামনে হাজির করলো যে, তার কথা শুনে জুরীরা শুধু অবাকই হলো না, দারুণ মুগ্ধ হলো। তখন আমি ভেবে দেখলাম, এভাবে চলতে দিলে এ-মামলা তার পক্ষে যেতে বাধ্য। অথচ তার প্রতিটি যুক্তি খণ্ডন করে দিয়ে সকলেই একমত হয়ে তাদের অভিমত জানালেন, এডওয়ার্ড সিটন দোষী যে নিজে খুন করেছে মহিলাটিকে। অতএব তার সেই অপরাধের শাস্তি-মৃত্যুদণ্ড। আপীল করলো সে তার সেই কঠিন শাস্তি মকুব করার জন্য। আমার অন্যায় রায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলো সে। কিন্তু আমার বিরুদ্ধে তার কোন অভিযোগই গ্রাহ্য হলো না। উচ্চ আদালতে ফাসী হয়ে গেলো সিটনের।

এর থেকেই বোঝা যায়, আমার বিচারের কোন ত্রুটি ছিলো না, আমি কোনো অন্যায় করিনি। বিচারক হিসেবে আমি শাস্তিই দিয়েছি। এখানে এসে থামলেন বিচারপতি ওয়ারথেন্ড নতুন করে একটা সিগার ধরালেন অতঃপর।

এক এক করে পুরো ঘটনাটাই মনে পড়ে গেলো আর্মস্ট্রংয়ের। এক সময়, তার মনে পড়ছে সিট-মামলা দারুণ একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল জনমানসে। সবাই ধরে নিয়েছিলো বেকসুর খালাস পেয়ে যাবে সিটন। সিটনের উকিল ম্যাথিউ তো ধরেই নিয়েছিলেন, তার মক্কেল বেঁচে যাচ্ছে এ-যাত্রায়। কিন্তু রায় বেরোবার পর সবাই কম

অবাক হয়নি। পরে দেখা হতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ম্যাথিউ বলেছিলেন, সিটনের ভাগ্যটাই খারাপ। শুরু থেকেই ওর প্রতি মন বিরূপ করে তোলেন বিচারপতি। অবশ্য এ সব কিছুই বেআইনী নয়, অভিজ্ঞ আইনজ্ঞ তিনি, আইনের কোনো ভুলচুক করেননি তিনি। তবু সব দিক বিবেচনা করে দেখলে মনে হবে এই মামলার একেবারে শুরু থেকেই সম্পূর্ণ এক ভিন্ন নিরীখে সিটনের তথাকথিত অপরাধের বিচার করতে চেয়েছিলেন তিনি।

এতদিন এই প্রশ্নটা তাকে অহরহ তাগিদ দিয়েছে, কিন্তু প্রকাশ করতে পারেননি, তবে আজ হঠাৎই সেই প্রশ্নটা তার মুখ ফসকে বেরিয়ে এলো, একটা প্রশ্ন করবো মিঃ ওয়ারথেন যদি কিছু মনে না করেন। আপনি কি সিটনের এই মামলা শুরু হওয়ার আগে থেকেই চিনতেন?

আচমকা প্রশ্নে বিব্রত ওয়ারথেন অন্যদিকে মুখ করে জবাব দিলেন না, এই মামলায় তাকে আমি প্রথম দেখি আদালতেই।

স্রেফ মিথ্যে বলছেন বৃদ্ধ বিচারপতি মনে মনে ক্ষেপে উঠলো আর্মস্ট্রং জীবনের প্রায় পুরো অধ্যায় কাটিয়ে এসেও মিথ্যের আশ্রয় নেওয়ার লোভটা সামলাতে পারলো না বৃদ্ধ লোকটি। এই বয়সেও মানুষকে ধোঁকা দিতে বাঁধলো না তার। হ্যাঁ চিৎকার করে আমি বলবো, অবশ্যই তিনি চিনতেন সিটনকে এবং মামলা শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকেই।

এবার ভেরার পালা। ভয়ে কি না কে জানে, অসম্ভব ঘামছিলো সে। রুমালে মুখ মুছে সে আবার তাকালো চোখ তুলে। কথা বলতে গিয়ে তার কণ্ঠস্বর বুঝি বা একটু কেঁপে উঠলো আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আপনারা গুনলেন একটু আগে, সে ব্যাপারে আমার কিছু বলার আছে। আমি ছিলাম সিরিল হ্যামিলটনের গভর্নর্স। ভাল সাঁতার জানতো না সে। তাই খুব বেশীদূরে বড় একটা যেতো না সে। কিন্তু সেদিন কি যে হলো তার হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে কখন যে সে পার থেকে অনেকখানি দূরে চলে গিয়েছিল খেয়ালই করিনি। হঠাৎ তার আঁত চিৎকার শুনে তাকালাম। ভেসে উঠল চোখের সামনে ডুবে যাওয়া তার শরীরটা। গভীর জলে সে কি আকুলি-বিকুলি। ঘটনার আকস্মিকতা কাটিয়ে উঠে দিলাম ঝাঁপ জলে, সাঁতার কেটে এগোলাম খানিকটা। কিন্তু অনেক দেরী হয়ে গেছে তখন। আমার চোখের সামনে দেখলাম সিরিলকে গভীর জলে তলিয়ে যেতে। আমি তো তাকে বাঁচানোর জন্যে চেষ্টার কোনো ক্রটি করিনি। আপনারাই বলুন তার অকাল মৃত্যুর জন্য সত্যি কি আমি দোষী?

ভেরা আবার বলে চলে, তা করোনারের বিচারে আমার কোনো দোষ দেখতে পাওয়া গেল না। সিরিলের মা হ্যামিলটনও যথেষ্ট উদারতার পরিচয় দিলেন, আমার ওপর দোষারোপ করার কথা ভাবতেই পারলেন না তিনি। আর ভাববেনই বা কি করে, সত্যি সত্যি আমি তো কোনো দোষ করিনি। অথচ এখানে এসে কি ভয়ঙ্কর কথাটাই না শুনতে হলো, সেই পুরনো ঘটনার জের টেনে সিরিলের মৃত্যুর ব্যাপারে আমার উপর একটা মিথ্যে দোষ চাপিয়ে দেওয়া হলো। এ যে কত বড় অন্যায় অবিচার-চাপা কান্নায় তার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এলো।

জেনারেল ম্যাকআর্থার তাকে সাঙ্ঘনা দিয়ে বোঝালেন, কেঁদো না। পাগলে কি না বলে ছাগলে কি না খায়। কথাটা তোমার মনে আছে তো? অতএব ঐ ঘেঁদো কথা নিয়ে তুমি আর অহেতুক উত্তেজিত হয়ো না যেন। তারপরেই আচমকা নিজের প্রসঙ্গে বলতে শুরু করে দিলেন তিনি। দেখুন, অন্য সময় হলে ব্যাপারটা আমি উড়িয়ে দিতাম, কোনো গুরুত্বই দিতাম না, কিন্তু আজকের এমন জটিল পরিস্থিতির মধ্যে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগের জবাব না দিয়ে থাকতে পারছি না। কিন্তু আগে এক অদৃশ্য অভিযোগকারী যে আর্থার রিচমণ্ডের নাম উল্লেখ করলেন, চাকরী ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন আমারই অধীনস্থ একজন অফিসার। আমি তাকে একদিন যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা নিজের চোখে দেখে এসে আমাকে রিপোর্ট করতে বলি। কিন্তু তার ফেরা আর হলো না যুদ্ধক্ষেত্র থেকে না ফেরার দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা তো অস্বাভাবিক কিছু নয়। তার জন্যে আমি তো আর অপরাধী হতে পারি না। আর আমার স্ত্রীর স্বপক্ষে একটা কথাই কেবল বলবো তার মতো সৎ কর্তব্যপরায়ণ স্ত্রী অনেক স্বামীর কাছে দুর্লভ। এই পর্যন্ত বলে থামলেন তিনি, তার মুখের উত্তেজনায় রেশ কাটেনি তখনো।

আর আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ হলো আমি নাকি অধিবাসীদের.....লম্বার্ডের ঠোঁটে বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠলো—

কেন কি হয়েছিল তাদের? মাস্টার্ন পারলো না তার কৌতূহল চেপে রাখতে।

আরে তেমন কিছুই নয়। লম্বার্ডের কথায় অবজ্ঞার সুর ধ্বনিত হলো। আসলে আত্মরক্ষার তাগিদ আর কি। শিকারে গিয়েছিলাম দলবল নিয়ে। এক সময় পথ হারিয়ে

ফেললাম জঙ্গলে। তখন কি আর করা যায়? খাবার-দাবার যা অবশিষ্ট ছিলো সঙ্গে নিয়ে আমরা কয়েকজন ফিরে এলাম। ওরা রয়ে গেল।

তার মানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন ম্যাকআর্থার, সজ্ঞানে আপনি তাদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে পালিয়ে এলেন?

আপনার যদি তাই মনে হয়, আমি নাচার। নিজেই নিজেকে সমর্থন করলো লম্বার্ড, জানেন তো, আত্মরক্ষার অধিকার সকলেরই থাকে। তাছাড়া আমাদের মতো মরণে ওদের ভয় নেই, আর তাতেই ওরা বেঁচে যায় কি বলেন? বলে হো হো করে হেসে উঠলো সে।

আঁতকে উঠলো ভেরা জেনে শুনে এমন একটা অন্যায় কাজ আপনি করতে পারলেন?

হুঁ, না পারার কি আছে, পাল্টা প্রশ্ন করলো লম্বার্ড।

আর আমার কি দোষ থাকতে পারে বলুন এবার, কৈফিয়ত দিতে এগিয়ে এলো অ্যান্টনি মাস্টার্স। জন কোম্ব আর লুসি কোম্বস্ খেলছিল রাস্তায়। হঠাৎ তারা আমার গাড়ির সামনে এসে পড়লো আমি তখন মরিয়া হয়ে ব্রেক কষলাম, কিন্তু তাতে কোন লাভ হলো না। আমার গাড়ির চাকার তলায় তখন দু-দুটো তাজা শরীর পিষ্ট হয়ে গেছে। ভাগ্য খারাপ তাই

কারা? আপনার নাকি সেই নিরপরাধ বাচ্চা দুটির। ওয়ারথের কথা আর সুরে হল ফোঁটানো ছিলো।

আমাদের সকলেরই। ফুলের মতো দুটি নিষ্পাপ সম্ভাবনাপূর্ণ জীবন অকালে ঝরে গেলো। আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স এক বছরের জন্যে বাতিল হয়ে গেলো। কিন্তু আমার কি দোষ বলুন।

দোষ আজকালকার নব্য যুবকদের। হাওয়া গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গাড়ি চালানোর কি দরকার শুনি? এ সব বদ অভ্যাস এখনি বদলানো প্রয়োজন।

গলা শুকিয়ে গিয়েছিল মাস্টারের। এক নিমেষে গ্লাসের সব জলটুকু নিঃশেষ করে ফেললো। স্নান বিষণ্ণ গলায় বললো সে। আপনারা যতোই বলুন দোষ আমার একটুও ছিলো না। এটা একটা অঘটন মাত্র। আর অঘটন ঘটে দোষ-গুণ বিচারের তোয়াক্কা না করেই।

একটু ঢোক গিলে এবারে রগার্স বললো এবার আমিও কিছু বলতে চাই স্যার

বেশ তো বলেই ফেলো তাকে ভরসা দিলো লম্বার্ড।

আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আমার স্বামী স্ত্রী দুজনে মিলে নাকি মিস ব্যাডিকে হত্যা করেছি। একেবারে মিথ্যে কথা, আপনারা কেউ যেন বিশ্বাস করবেন না। আসলে কি

জানেন মিস ব্রাণ্ডি সব সময়েই একটা না একটা অসুখে ভুগতেন, ডাক্তার-ওষুধ ছিল তার নিত্য সঙ্গী। ঝড়-জলের রাতে হাঁটা পথে ডাক্তারের বাড়িতে পৌঁছতে অনেক দেরী হয়ে যায়। ডাক্তারবাবুকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এসে দেখি সব শেষ। তিনি তখন সব চিকিৎসার বাইরে চলে গেছেন। তাহলে এর থেকেই আপনারা অনুমান করে নিতে পারেন, চেষ্টার কোন ফলটি আমরা করিনি এ ব্যাপারে, কেবল আজই যা করা হলো। যা যা বললাম সবই সত্যি, একটুও বাড়িয়ে কিংবা অতিরঞ্জিত করে বলিনি। তাছাড়া ওঁর মৃত্যুতে আমাদের কি লাভ হলো বলুন?

হয়েছে বৈকি? গলা পরিস্কার করে বলে উঠলেন ব্লোর তোমার মনিবের মৃত্যুতে লাভ তোমাদের কম হয়নি।

না তেমন কি আর লাভ হয়েছে বলুন। সামান্য কিছু টাকা তিনি রেখে গিয়েছিলেন আমাদের জন্যে। তার সেই ভালবাসার দান আমরা গ্রহণ করে কি এমন অন্যায় করেছি বলুন।

তোমরা যা ভালো বুঝেছো তাই করেছে। সে যাই হোক ব্লোর-এর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো লম্বার্ড। মিঃ ব্লোর, বলুন এবার আপনার কি বলার আছে।

সামান্যই। খানিক আগে আপনারা ল্যাণ্ডারের নাম শুনলেন। জানেন, যে ছিলো এক ডাকাত দলের সর্দার। একটা ব্যাঙ্ক ডাকাতি কেসে ধরা পড়লো সে, আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে।

হ্যাঁ মনে আছে বৈকি। মাথা নাড়ালেন ওয়ারথ্রেভ মামলাটা আমার আদালতে না উঠলেও, তবু এর বিবরণ আমার সব জানা আছে। আপনি এই মামলার তদন্তকারী অফিসার ছিলেন। আপনার সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতেই শাস্তি হয়েছিল তার। দারুণ আলোড়ন তুলেছিল মামলাটা। কি বলেন?

হ্যাঁ তা যা বলেছেন।

বিচারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছিল ল্যাণ্ডারের। একবছর পরে ডার্টমুরের জেলে মারা যায় সে। ডাকাত হলেও লোকটা কিন্তু এমনিতে বেশ ভদ্র ছিলো তাই না?

ভদ্র না আর কিছু। মিটমিটে শয়তান। রাতের পাহারাদারটাকে ঐ শয়তানটা তত খুন করেছিল।

সে যাইহোক, এমন একটা জটিল মামলা সুষ্ঠুভাবে সমাধান করার জন্যে আপনি তো একটা পুরস্কার পেয়েছিলেন, কি রকম পুরস্কার বলুন তো?

পদোন্নতি। তার প্রয়োজন ছিলো না।

আশ্চর্য! গলা ফাটিয়ে হেসে উঠল লম্বার্ড। সব কর্তব্য পরায়ণ লোকগুলো এসে জুটেছে এখানে। আপনাদের মধ্যে আমিই কেবল একটু ব্যতিক্রম। ডঃ আর্মস্ট্রং এর উদ্দেশ্যে

এবার বললো লম্বার্ড ডাক্তারবাবু আপনি বা বাকী থাকবেন কেন, আপনার ব্যাপারটা এবার সেরে ফেলুন চটপট। আপনার কি অপরাধ? অবৈধ গর্ভপাত নাকি ভ্রূণহত্যা?

লজ্জায় ঘুণায় এমিলি এবং ভেরা মুখ ফিরিয়ে মাথা নিচু করে রইলেন।

দেখুন, আমার বিরুদ্ধে সেই অদৃশ্য লোকটার কি যে অভিযোগ ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। ক্লিজ না ক্লিজো যাইহোক, ও দুটো নামের কোনো রোগীকেই আমার মনে পড়ছে না। বহু পুরানো ঘটনা তো অপারেশন কেসও হতে পারে। আমাদের মানে চিকিৎসকদের বড় অসুবিধে কি জানেন? কোনো রোগীর দুরারোগ্য রোগ আমরা সারিয়ে তুলতে রেহাই নেই। দুর্নামের চূড়ান্ত করে ছাড়াবে তারা। একটা বেদনার চাপ পড়লো তার চোখে-মুখে।

কিন্তু মাথায় তখন অন্য আর এক চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিলো। সেদিন একটু বেশী মাত্রায় মদ গিলে ফেললাম আমি। বেসামাল অবস্থা, অপারেশন টেবিলে অসম্ভব হাত কাঁপছিল, ঐ অবস্থায় অপারেশন করলাম। ফলে যা হওয়ার তাই হলো, বাঁচলোনা রোগী। অথচ মারা যাওয়ার কথা নয় তার, এমন কিছু জটিল অপারেশন ছিলো না। তবে আমার ভাগ্য ভালো ছিলো, তা নিয়ে রোগীর আত্মীয় স্বজন কিংবা বন্ধুবান্ধব কেউ তেমন হৈ-চৈ করেনি তখন। আমার গাফিলতির কথা জানতো কেবল একজন নার্স, কিন্তু সে-তো মুখ খোলবার মেয়ে নয়। তাহলে? তাহলে কেনই বা দীর্ঘদিন পর সেই ব্যাপারটা নিয়ে অভিযোগ উঠলো আমার বিরুদ্ধে।

আর্মস্ট্রং-এর পর বাকী রইলেন কেবল একজন। তিনি হলেন মিস্ এমিলি ব্লেন্ট। সকলের দৃষ্টি গিয়ে পড়লো তার ওপরে তখন। ব্যাপারটা টের পেয়ে নিজের থেকেই জানতে চাইলেন মিস্ ব্লেন্ট মনে হচ্ছে, আপনারা কিছু জানতে চান আমার কাছ থেকে। কিন্তু আপনাদের নিরাশ হতে হবে। আমার বলার কিছুই নেই।

সে কি বলার কিছুই নেই। ওয়ারথের চোখে বিস্ময়। তার মানে আত্মপক্ষ সমর্থনের মতো কিছুই নেই আপনার।

আমার কথার ভুল ব্যাখ্যা করবে না। যে অভিযোগ আমি বিশ্বাস করি না, তা নিয়ে, অযথা মাথা ঘামাতে চাই না। আমি বিশ্বাস করি, আমি নিরাপরাধ, তাই নিজেকে অহেতুক বিব্রত করতে চাই না।

তা বেশ অগত্যা ওয়ারথ বললেন, তদন্তের দ্বিতীয় পর্যায়-এর পরিসমাপ্তি এখানেই। তবে তার আগে আরো কিছু আলোচনা দরকার। রগার্সের দিকে ফিরে বললেন তিনি আচ্ছা রগার্স, আমরা ছাড়া অন্য আর কেউ আছেন এই দ্বীপে?

না স্যার।

কিন্তু আশ্চর্য। এখন ভাগ্যের হাতে সঁপে দিতে হবে নিজেদেরকে। মিঃ ওয়েনের মতলবের কথা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তবে তিনি যে ঠিক প্রকৃতিস্থ নন, এ-ব্যাপারে

আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এ অবস্থায় আমি বলি, কি, আজ রাতের মধ্যেই এ-দ্বীপ ছেড়ে আমাদের সকলকেই চলে যাওয়া উচিত।

কিন্তু যাবেন কি করে স্যার? দ্বীপে নৌকা-টোকা তো কিছু নেই।

তাহলে ওপারের সঙ্গে তোমরা যোগাযোগই বা করো কিভাবে?

ফ্রেড নারাকট রোজ সকালে আসেন, দিনের খাবার-দাবার চিঠিপত্র প্রতিদিন দিয়ে যায় সে। আর আমাদের কোন কিছুর প্রয়োজন থাকলে জানিয়ে দিই তাকে।

ঠিক আছে, আর রাতটুকু কোন রকমে কাটিয়ে দিয়ে কাল সকালে নারীকটের লঞ্চ এলে আমরা সকলেই ফিরে যাবো এখান থেকে। বলুন আপনাদের কি মত? সকলের মুখের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন ওয়ারথেন্ড।

প্রায় সবাই মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো কেবল মাস্টার্ন ছাড়া। উঠে দাঁড়িয়ে সে তারা দ্বীপে থেকে যাওয়ার স্বপক্ষে বললো, এখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার কোন যুক্তি নেই। সকলের বিরুদ্ধে যা সব অভিযোগ শুনলাম, বেশ রোমাঞ্চকর গোয়েন্দা কাহিনীর মতো এর রহস্য উন্মোচন না হওয়া পর্যন্ত আমি এখান থেকে এক পাও নড়ছি না।

অবাক করা সকলের দৃষ্টি গিয়ে পড়লো মাস্টার্নের মুখের ওপর। তাতে তার কোনো হুম্ফেপ নেই। তার ঠোঁটে এক অদ্ভুত রহস্যময় হাসি। তেমনি হাসতে হাসতে বললো সে,

দেখুন ওসব পুণ্যটুনের কথা আমি একেবারেই বিশ্বাস করি না, ওসব বুজরুকি। আমার মোদা কথা হলো পান ছাড়া অন্য কোনো শব্দ আমার জানা নেই। আমি এখানে চুটিয়ে পান করতে এসেছি। তাই পানের শেষ না দেখা দেখা পর্যন্ত আমি এই পৃথিবী থেকে নড়ছি না।

জেদী মনোভাব নিয়ে হাত বাড়িয়ে সে তার জন্য নির্দিষ্ট পানীয়ের গ্লাসটা তুলে নিলো এক চুমুকে সব পানীয়টুকু নিঃশ্বাস করে বসে পড়লো বললে একটা ভাল বলা হবে, তারপরের ঘটনা অতি সংক্ষিপ্ত। অমন জেদী সাদা উৎফুল্ল মাস্টারের মুখটা হঠাৎ কেমন সাদা ফ্যাকাসে দেখালো, চোখের মণি দুটো ঠিকরে বেরিয়ে এলো। নিঃশ্বাসে ভীষণ কষ্ট, দম নেবার জন্য আশ্রয় চেষ্টা করেও পারলো না সে। তার হাতটা অসম্ভব কাঁপছিল, গ্লাসটা হাত থেকে পড়ে গেলো মেঝের ওপর। আর তারপরেই তার ভারী দেহটা চেয়ার থেকে পড়ে গেলো মেঝের ওপর, পড়ে যাওয়ার শব্দ শুনে সচকিত দৃষ্টিতে সকলে তাকালো তার দিকে, সকলের চোখে তখন একটা ভয়ঙ্কর আতঙ্ক।

০৫.

যেন চোখের পলক পড়তে না পড়তেই ঘটে গেলো সেই ভয়ঙ্কর ঘটনাটা। সকলের চোখে মুখে আতঙ্কের ছাপ, সকলের দৃষ্টি এখন স্থির-নিবদ্ধ মাস্টানের প্রাণহীন দেহের দিকে। কারোর মুখে কথা নেই। কিন্তু সকলের মনে একটাই প্রশ্ন কেবল কিভাবে তার মৃত্যু হলো।

ডঃ আর্মস্ট্রংই প্রথম বিস্ময়ের ঘোরটা কাটিয়ে উঠে দ্রুত ছুটে গিয়ে মাস্টানের স্পন্দনহীন ডান হাতখানি তুলে নিয়ে নাড়ি টিপে ধরলেন। না, কোনো সাড়া নেই। স্তব্ধ নিঃসাড়া।

মাথা নাড়লেন তিনি গভীর দুঃখের সঙ্গে, মাস্টান মৃত।

আরেক দফা সাত-জোড়া চোখের দৃষ্টি গিয়ে পড়লো মাস্টানের দিকে। তারা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছেন না, অমন তরতাজা, হাসিখুশিতে প্রাণোচ্ছল যুবক হঠাৎ কি করে মারা যেতে পারে। বোধহয় ডঃ আর্মস্ট্রং-এর হিসেবে কোথাও ভুল হয়ে থাকবে। তাদের ধারণা মাস্টান মরেনি বেঁচে আছে সে এখনো।

ডঃ আর্মস্ট্রং আর একবার ভাল করে পরীক্ষা করলেন মাস্টানকে চোখের পাতা উল্টিয়ে দেখলেন, তার ঠোঁটে নীল রঙের দেখতে পেয়ে কি মনে করে ঈষৎ ফাঁক হয়ে থাকা তার

মুখের কাছ থেকে নিয়ে গিয়ে কিসের যেন ঘ্রাণ নিলেন। সব শেষে তার মদের গ্লাসের একটা ভাঙ্গা টুকরো কাঁচ তুলে নিলেন নিজের হাতে তিনি।

তবে কি মাস্টার দম আটকে মারা গেছে? একটু ইতস্ততঃ করে জিজ্ঞেস করলো ম্যাকআর্থার।

দম আটকে মারা গেছে কি না জানি না, উত্তরে আর্মস্ট্রং বলে মনে হয় হঠাৎ তার নাড়ির স্পন্দন স্তব্ধ হয়ে যাওয়ায় মৃত্যু দ্রুত এগিয়ে এসেছিল। তারপর তিনি কি মনে করে সেই গ্লাসের গায়ে লেগে থাকা অবশিষ্ট তরল পদার্থের এক ফোঁটা হাতে আঙুলে নিয়ে অতি সন্তপণে জিভে ঠেকালেন। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখের ভাব বদলে গেলো।

তার মুখের ভাব বদলে যাওয়াতে ছজোড়া চোখ চিন্তাক্লিষ্ট দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো কিছু একটা শোনার জন্যে।

আপনারা যা ভাবছেন ঠিক তা নয়, মাস্টারের মৃত্যু দম আটকে গিয়ে হয়নি। শুধু তাইনয়, তার মৃত্যু একেবারে স্বাভাবিক নয়।

সে কি? চমকে উঠলো ভেরা তার মানে আপনি বলতে চান ঐ হুইস্কিতে—

হ্যাঁ, ঠিক তাই, হুইস্কিতেই ছিলো তার মৃত্যুর পরওয়ানা। জোর দিয়ে বলতে না পারলেও তবু বলছি সম্ভবত পটাসিয়াম সায়ানাইডের প্রতিক্রিয়াতেই, তার মৃত্যু ঘটে থাকবে।

পটাসিয়াম সাইনাইড? এই প্রথম কথা বললেন ওয়ারথেন্ড । তার হৃদয়ের সঙ্গে মেশানো ছিল ।

তাহলে কি ধরে নিতে হবে, এবার লম্বার্ড জানতে চাইলো, মাস্টার যখন নিজেই সকলের ড্রিন্গস্ পরিবেশন করেছিল, সে নিশ্চয়ই নিজে তার গ্লাসে বিষ মিশিয়ে থাকবে । তাই কি?

যুক্তিটা ঠিক গ্রহণযোগ্য না হলেও কতকটা দায়সারা গোছের ঘাড় নাড়লেন ডঃ আর্মস্ট্রং আপাতঃ দৃষ্টিতে সেই রকম তো মনে হচ্ছে ।

তবে কি এটা আত্মহত্যা? মৃত মাস্টারের দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে চোখ ফেরালেন, রোর তাজ্জব ব্যাপার তো ।

না, না উনি আত্মহত্যা করতে যাবেন কেন, অমন হাসিখুশিতে ভরা সুন্দর যুবক শুধু শুধু নিজেকে শেষ করতে যাবে কোন্ দুঃখে? প্রতিবাদ করে উঠলো ভেরা ।

ভেরার কথাটা যেন লুফে নিলেন ডঃ আর্মস্ট্রং তাহলে আপনারাই বলুন আত্মহত্যা ছাড়া আর হঠাৎ এভাবে মৃত্যুর পিছনে অন্য আর কিসের সম্ভাবনাই বা থাকতে পারে?

অন্য আর কিই বা সম্ভাবনা থাকতে পারে? ভাবতে পারছে না কেউ। আর ভাববেই বা কি করে? একই বোতলের ছইস্কি থেকে তো আমরা সবাই খেয়েছি। তাছাড়া নিজের হাতে সকলকে মদ পরিবেশন করছিল। অতএব এর থেকেই ধরে নেওয়া যেতে পারে এটা একটা আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

কিন্তু এর পরেও একটা প্রশ্ন থেকে যায়, কেনই বা সে আত্মহত্যা করতে যাবে?

আমারও হিসাব মিলছে না, আর্মস্ট্রং-এর উদ্দেশ্যে বললেন ব্লোর, ডঃ আর্মস্ট্রং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মাস্টার্সের আত্মহত্যা করার কথা চিন্তাই করা যায় না।

এ প্রশ্নটা তখন থেকে আমকেও যথেষ্ট ভাবিয়ে তুলেছে তাকে সমর্থন করে বললেন আর্মস্ট্রং কিন্তু সঠিক উত্তরটা কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছি না।

আর্মস্ট্রং এবং লম্বার্ড দুজনে ধরাধরি করে মাস্টার্সের মৃতদেহ রেখে এল তার ঘরে। তার মৃতদেহ সাদা চাদরের ঢেকে ফিরে এলো একতলায় তারা। বসবার ঘরে সকলে তখন স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন, ভয়ে আতঙ্কে কেউ কারোর দিকে তাকাতে সাহস পাচ্ছিলো না।

ওদিকে রাতও তখন বেড়ে চলেছে। দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে এমিলিই প্রথম কথাটা তুললেন, রাত অনেক হলো এবার শুয়ে পড়া উচিত।

এমিলিকে সমর্থন করলেন ওয়ারথ্রেভ, তা যা বলেছেন, এরপর বসে থাকার কোনো মানে হয় না।

রগার্সের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন আর্মস্ট্রং তা তোমার স্ত্রী এখন ভাল আছে তো রগার্স?

হ্যাঁ, বেশ ভালই আছে স্যার। অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

বেশ তো ঘুমোক না। রাতে আর জাগিও না।

ঠিক আছে স্যার তাই হবে। রগার্স বলে, আপনারা শুয়ে পড়লে ফটক বন্ধ করে আমিও শুতে চলে যাবো। রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে যায় রগার্স। আর তারা সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন যে যার ঘরে যাওয়ার জন্য।

এতোবড়ো প্রাসাদের আনাচে কানাচে কোথাও এতটুকু অন্ধকারের চিহ্নমাত্র দেখা গেলোনা, চারিদিক আলো আলোকিত প্রাসাদ। কেউ যে কোথাও গা ঢাকা দিয়ে থাকবে, সেরকম অন্ধকারের অবকাশ ছিলো না কোথাও। আর এই আলোয় আধিক্যটাই হয়েছে সব চেয়ে বেশী আতঙ্কের, ভয়ের কারণ। অন্ধকারে বিপদ আছে বটে, তবে আলোয় মৃত্যুর হাতছানি যে আরো বেশী ভয়ঙ্কর....

শুভরাত্রি জানিয়ে যে যার ঘরে প্রবেশ করে চটপট দরজা বন্ধ করে দিলো এমনভাবে যেন বাইরের আলোটা তাদের তাড়া করে ফিরছিলো।

শোয়ার উদ্যোগ করতে গিয়ে একের পর এক স্মৃতি মনে পড়তে থাকলো ওয়ারথের মনে....

সিটন-এডওয়ার্ড সিটন। তার সুন্দর মুখখানি যেন তার চোখের সামনে ভাসছে এখনো। মাথা ভর্তি চুল। নীল চোখ, মায়াবী দৃষ্টি, অমন একটা আকর্ষণীয় চেহারা কি ভোলা যায় সহজে। একবার দেখলেই মজে যেতে হয়। তা মজে ছিল জুরীরাও তার চেহারায়-অমন সুন্দর চেহারার মানুষের কোনো অন্যায় যেন অন্যায়ই নয়, জুরীদের মনে এই কথাটাই যেন গেঁথে গিয়েছিল।

আর সরকার পক্ষের উকিল নিলিনও কি কমতি ছিলো, তাকে বাঁচানোর জন্য উঠে পড়ে লেগে পড়েছিল সে। তাছাড়া তার উকিল ম্যাথিও সেই সুযোগে তার মক্কেলের সমর্থনে যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিল। সাওয়াল-জবাবের সময় আগাগোড়া মাথা ঠাণ্ডা রেখে সব সময় তার বক্তব্যের মধ্যে একটা করুণ আবেদনের ছাপ রেখে গিয়েছিল। ফলে যা হওয়ার তাই হলো, জুরীদের মন গেলো গলে। সিটনের নির্দেশিত উপলব্ধি করতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ রইলো না তাদের মনে।

আবার তখন কি চিন্তা। জুরীরা বেঁকে বসলে আসামীর বিরুদ্ধে রায় দেবে কি করে? তাই প্রতিটি জেরা অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শুনে নোট লিখতে হলো আমাকে। প্রয়োজনীয়

নথিপত্র খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে হলে আমাকে। তবু জুরীরা আমাকে দারুণ ভাবিয়ে তুললো, মামলা বুঝি কেঁচিয়ে গেলো, তীরে এসে আমার তরী বুঝি ডুবে গেল।

তবে যার শেষ ভাল, তার সব ভাল বলে একটা প্রবাদ আছে। সেটা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেলে শেষ পর্যন্ত। রায় দেওয়ার সময় চমকে দিলাম সকলকে। আসামীর বিরুদ্ধে একটা মোক্ষম অস্ত্র হানলাম। আর তাতেই আসামী পক্ষের উকিল এবং সিটনের সমর্থক জুরীরা ও সরকারপক্ষের উকিল সবাই ধরাশায়ী। তাদের সেই দুর্ভাগ্য দেখে নিজের মনে বললাম, আরে বাবা আমি হলাম গিয়ে অতি বিচক্ষণ বিচারপতি আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার কি কোনো দাম নেই। আমাকে ফাঁকি দিতে পারবে না কেউ। কেমন, এবার সবাই জব্দ তো...

বাঁধানো দাঁতের সেটটা খুলে ফেলে গ্লাসের জলে ধীরে ধীরে ডুবিয়ে রাখলেন ওয়ারথ্রেড। এই মুহূর্তে তার দন্তহীন মুখটা ভয়ঙ্কর বিশ্রী একটা আকার ধারণ করলো, ঠোঁট দুটো ঝুলে পড়লো সামনের দিকে, তোবড়ানো গাল কুঁচকে যাওয়া চোয়াল, ঝুলে পড়া খুতনী সব মিলে একটা বীভৎস রূপ যেন বিশীর্ণ মুখ। সেই কুৎসিত মুখে অতি কঠিন, অতি নির্মম, অতি নিষ্ঠুর হাসির একটা সুক্ষ্ম রেখা ফুটে উঠতে দেখা গেলো। আর সেই সঙ্গে চোখ দুটো জ্বলে উঠলো ক্ষুধার্ত জানোয়ারের মতো। তার মুখে চিন্তার ছাপ পড়লো কয়েক মুহূর্তের জন্য এবং তারপরেই ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লেন তিনি।

ঠিক সেই মুহূর্তে নিচের তলায় রান্নাঘরে জমে উঠেছিল এক মুকাভিনয়ের নাটক। অভিনেতা নজন আর দর্শক মাত্র একজন রগার্স।

তাজ্জব ব্যাপার তো? এই খানিক আগে কাঁচের আলমারিতে দেখে গেলাম দশজন মুকাভিনেতা অর্থাৎ মোট দশ দশটি পুতুল। আর এখন তাদের মধ্যে একটি উধাও। রইলো এখন নটা। একটি পুতুল গেলো কোথায়? ডান গজালো নাকি তার।

ওদিকে ম্যাকআর্থারের চোখে ঘুম নেই। ঘুম আজ আর আসবে না বোধহয়। তার মন এখন আচ্ছন্ন আর্থার রিচমকে ঘিরে। অনিন্দ্যসুন্দর এক যুবক। মনে পড়ে যায় তার উচ্ছ্বাসে ভরপুর যৌবনের কথা। সত্যি ভাললাগার মতোই চেহারা ছিলো ছোকরার। তাকে দেখে আমার স্ত্রীর মাথা ঘুরে গেলো, তার হাবভাব দেখে আমার অন্তত সেইরকমই মনে হয়েছিল।

এক ছুটিতে জিদ ধরলো রিচমও আমার বাড়িতে যাবে। অগত্যা সঙ্গে করে নিয়ে এলাম তাকে। প্রথমে আমার আপত্তি ছিলো কে জানে নেসলির যদি পছন্দ না হয় তাকে। যাই হোক রিচমওকে তার মনে ধরতে দেখে আমার দুশ্চিন্তার অবসান ঘটলো।

তা রিচমওকে আদর আপ্যায়নের সেকি ঘটনা নেসলির। ছুটির কটা দিন রিচমওকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে নেসলি, একটা মুহূর্তের জন্যও তার সঙ্গে ছাড়েনি সে। হাসি-ঠাট্টা-গল্প মশগুলে কেটেছে রিচমওকে নিয়ে। অনেকদিন পরে নেসলির মুখে হাসি ফুটে উঠতে দেখে আমার দুচোখ জুড়িয়ে গেছে। সন্তানহীনা নেসলি যেন এতোদিনে মাতৃহৃৎ স্বাদ পেয়েছে রিচমওকে দুহাতে বুকে জড়িয়ে ধরে।

মাতৃস্নেহ কথাটা এখন ভাবলে গা ঘিনঘিন করে উঠে। ছিঃ ছিঃ আমি তখন কি বোকাই না ছিলাম। একবারও বুঝতে পারিনি মায়ের আদরের নামে যে রিচমণ্ডকে বুকে জড়িয়ে ধরার পিছনে লেসলির ছেনালিপনার তাগিদ ছিলো, দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে চেয়েছিল সে।

অথচ এই লেসলিকে আমি কতোই না ভালবাসতাম, বিশ্বাস করতাম তাকে আমার পতিব্রতা স্ত্রী হিসেবে। বিদেশে যেখানেই থাকতাম শয়নে-স্বপনে তার কথা ছাড়া অন্য কোন নারীর কথা ভাবতে পারতাম না। সে ছিলো আমার প্রথম এবং শেষ প্রেম। কিন্তু আমার সেই ভুল ভাঙ্গতে বেশী দেরি হল না।

আমি তখন বিদেশে আমার কর্মক্ষেত্রে। একদিন লেসলি চিঠি লিখলো আমাকে ও রিচমণ্ডকে দুজনকেই। আমার নাম লেখা খামটা জামার ভেতরের চোরা পকেটে পুরে চুপিচুপি এসে ঢুকলাম আমার তাবুতে।

সযত্নে খামের মুখ খুলে চিঠিটা বার করে পড়তে গিয়ে প্রমেই হোঁচট খেলাম। চিঠিটা আমার নয়, রিচমণ্ডকে লেখা। খাপে ভরবার সময় ভুল করে চিঠি অদল-বদল হয়ে থাকবে হয়তো। ওঃ কি মধুর একটা সম্ভাষণ, অমন একটা গভীর অনুরাগপূর্ণ সম্ভাষণ দিয়ে আমাকে কখনো চিঠি লেখেনি লেসলি। আর ভাষারই বা কি ব্যঞ্জনা। চিঠির প্রতিটি লাইনে প্রেমের ছড়াছড়ি। চিঠি তো নয়, যেন একটা প্রেমের কবিতা। লেসলির প্রেমের কবিতা পড়তে গিয়ে রাগে দুঃখে আমার সর্বাপ জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে থাকলো। বুকের পাঁজরগুলো এক এক করে ভেঙ্গে যেতে থাকলো যেন। একটা বোবা কান্নায়

বুকটা আমার হাহাকার করে উঠলো। এরই নাম প্রেম। এরই নাম জীবন। যাকে আমি বিশ্বাস করে আমার প্রাণের চেয়ে বেশী ভালবেসে এসেছি সেই কি না আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলো, চরম আঘাত দিলো আমার নিঃস্বার্থ প্রেমের ওপর। জীবনটাই যেন একটা বিরাট ফকি। মানুষের ছদ্মবেশে কতকগুলো জানোয়ার যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে এখানে। ওৎ পেতে বসে আছে। রক্ত-পিপাসু পশুর মতো, সুযোগ পেলেই যেন তারা মানুষের সৎ ইচ্ছে, সৎ প্রবৃত্তি গুলোকে পদদলিত করে একেবারে নষ্ট করে দেবে।

যেমন করলো লেসলি। আর এই দ্বিচারিণী, বিশ্বাসঘাতিনীকে আমি আমার স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে এসেছি এতোদিন ধরে? ভাবতেও ঘৃণা হয়। কি করবো আমি এখন আমার সামনে এখন একটাই পথ খোলা আছে-প্রতিশোধ, তাদের দুজনের বিরুদ্ধে চরম প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত আমি যেন স্বস্তি পাচ্ছিলাম না তখন।

তা সুযোগটা এসে গেলো কদিন পরেই। যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে একজনকে পরীক্ষা করে দেখে আসতে হবে। এসব ব্যাপারে একজন সাধারণ সৈনিকই যথেষ্ট। কিন্তু তা না করে রিচমণ্ডকেই পাঠাবার ব্যবস্থা করলাম। এখানে কাজটা গৌণ গৌণ নয়, আমার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিলো রিচমণ্ডকে যে ভাবেই হোক একেবারে যুদ্ধক্ষেত্রে কোনরকমে পাঠাতে পারলে হয়, তাহলে চিরদিনের জন্য তার বিশ্বাসঘাতকতার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যেতে পারে। সেই সঙ্গে দ্বিচারিণী লেসলির ওপরেও চরম আঘাত হানা যেতে পারে, তার হাত দিয়ে রিচমণ্ডের উদ্দেশ্যে প্রেমের কবিতা আর কখনো বেরুবে না। এবং হোও তাই, অন্যদের মতো যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে তার ফেরা আর হলো না। সে তার প্রেমিকা লেসলিকে ভালবাসতে আর কখনো ফিরে আসবে না। কদিন পরে শত্রুপক্ষের গুলিতে তার নিহত

হওয়ার দুঃসংবাদ এসে পৌঁছালো। হ্যাঁ, এইরকমই তো আমি চেয়েছিলাম। খবরটা পেয়ে আমার কোন দুঃখ হলো না বরং মনটা অনেকটা হালকা হয়ে গেলো।

রিচমণ্ডের মৃত্যুর ব্যাপারে কেউ মাথা ঘাটালো না, কারণ তারা বেশ ভাল করেই জানতো, যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে জীবিত অবস্থা ফেরার সম্ভাবনা খুব কমই থাকে। বেশ নিশ্চিত্তে কটা দিন কাটলো। একদিন কাজকর্ম সেরে তাবুতে ফিরছি, পথে আর্মিটেকের সঙ্গে হঠাৎ দেখা। যেচে তার সঙ্গে কথা বলতে গেলাম, কিন্তু মুখ ফিরিয়ে নিলো সে। বেশ বুঝতে পারলাম, তার চোখ দিয়ে মুঠো মুঠো ঘৃণা ঝরে পড়ছিলো। ভাবলাম, রিচমণ্ডের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলো সে মনে হয় রিচমকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানোর উদ্দেশ্যটো। সে অনুমান করতে পেরেছে। আর তাতেই তার রাগ ও ঘৃণা আমার ওপর। কিন্তু যাই বুঝে থাক না কেন, তাতে আমার কিছু এসে যায় না। যেমন ভাবেই তুমি লোককে বোঝাও না কেন, আমার চালাকিটা কেউ ধরতে পারবে না ধরার সাধ্যও নেই কারোর। যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে যে কেউ মারা তো যেতেই পারে? কে পাঠিয়েছে কেন পাঠিয়েছে, তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাতে যাবে না।

একদিন ফিরে এলাম ইংলণ্ডে। লেসলি সব শুনে চিৎকার করে কেঁদে উঠলো। তার সেই কান্না দেখে আমার গা-পিণ্ডি জ্বলে যেতে লাগলো তাকে মুখে কিছু প্রকাশ করলাম না। বজ্রাত মেয়েছেলেটাকে প্রাণে আঘাত না করে তাকে মারবো। তাকে তিলে তিলে দণ্ডে মারবো।

কিন্তু পনের বছর পরে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর আর্মিটেজ কি তার সন্দেহের কথা কারোর কাছে প্রকাশ করে দিলো? আর বললেই বা কি এসে যায়। এতদিন পরে তখন কে আবার তা নিয়ে জল ঘোলা করতে উঠে পড়ে লাগলো?

বছর তিন পরে লেসলি মারা যায় ডবল নিউমোনিয়ায়। তার চিকিৎসার ত্রুটি আমি করিনি। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে চলে আসি ডিভনে। ছোট খাটো একটা বাড়ি কিনলাম। তার আগেই স্বেচ্ছায় চাকরী থেকে অবসর নিয়েছিলাম। বেশ সুখেই কাটছিল আমার দিনগুলি। বছর তিনেক পরে হঠাৎ একদিন লক্ষ্য করলাম, প্রতিবেশীরা কেউ আর আমার সঙ্গে কথা বলছে না, তবে কি আর্মিটেজ তার সেই সন্দেহের কথাটা এদের জানিয়ে গেলো, আর তাতেই কি তাদের এই অকস্মিক পরিবর্তন। যাই বলুক, তাতে আমার ভারী বয়ে গেলো, আমার সঙ্গে কে কথা বললো না বললো তো বয়েই গেলো, একা একা বেশ আছি আমি।

তা-এই দ্বীপে এসেও ভেবেছিলাম, বেশ সুখেই কাটবে কটা দিন। ভেবেছিলাম পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে হৈ-চৈ করে কটা দিন আনন্দ মুখর হয়ে উঠবে। কিন্তু মাঝখান থেকে সেই অদৃশ্য কণ্ঠস্বরটা। সব ভঙুল করে দিয়ে গেলো। তা জবাবের মতো একটা মোক্ষম জবাব দিয়েছি বটে। ওসব ঘেঁদো অভিযোগ তোলা হয়েছে, আমার মতো তারা কেউ দোষী নয়। সব বাজে কথা, সব ধাপ্লা, স্রেফ ধাপ্লা। অতিথিদের নিয়ন্ত্রণ করে নিয়ে এসে তাদের সঙ্গে এ কি রসিকতা বাপু। আর এ সব বড়লোকী চাল ছাড়া আর কিছু নয়। বাজে ধাপ্লা দিয়ে সৎ মানুষগুলোকে অস্বস্তির মধ্যে ঝুলিয়ে রেখে মিঃ ওয়েন হয়তো আড়াল থেকে মজা দেখতে চাইছেন। এই আর কি।

আরে এই দ্বীপের মানুষগুলোও যেন কেমন। কেউ কারোর সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলতে চায় না, মিশতে চায় না। কথা না বললো তো বয়েই গেলো আমার। একা একা করে। মাত্র একদিনেই যেন মনে হচ্ছে অনন্তকাল ধরে রয়েছে এই দ্বীপে...তা আমরা যেন কবে ফিরবো? হ্যাঁ আগামীকালই তো ফ্রেড নারীকটের লঞ্চ এলেই সবার আগে গিয়ে, আমি উঠে বসবো তার লঞ্চে। আর অন্যেরা যা খুশি করুক আমি ফিরেও তাকাতে যাব না কারোর দিকে।

কিন্তু এ-দ্বীপ ছেড়ে চলে না গেলে কেমন হয়। মন্দ হয় না। এমন একটা নির্জন দ্বীপে লোকালয়ের থেকে অনেক দূরে দিনগুলো বেশ ভালই কাটবে বলে মনে হয়। শহরের স্বার্থান্বেষী মানুষগুলোর ভীড়ে জীবনটা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, তাদের মধ্যে আবার ফিরে যেতে ভাল লাগে না।

খোলা জানালা পথে ভেসে আসছে সমুদ্রের গর্জন। এখানকার আকাশ কেমন নির্ভাবনাময় আকাশের কেমন সংসার নেই, নেই চিন্তা-ভাবনা। আকাশের মতো হতে ইচ্ছে হয়। দূরের ঐ পাহাড়, সমুদ্র অরণ্য, এই প্রাসাদ সব কিছুই থাকবে আমার হাতের মুঠোর মধ্যে। হ্যাঁ এই দ্বীপেই থেকে যেতে চাই আমি চিরদিনের জন্য, এখানে থেকেই আমি আমাদের পরিণতি দেখে যেতে চাই নিজের চোখে।

ভেরার চোখ থেকেও ঘুম যেন আজ নির্বাসন নিয়েছে। অন্ধকার যেন তাকে গিলতে আসে, তাই ঘরের আলো জ্বলে রেখেছিল সে।

একা হলেই মন চলে যায় তার সুদূর অতীতে। বিশেষ করে আজ স্মৃতির পাতা উল্টাতে গিয়ে বারবার একটা মুখ তার চোখের সামনে ভেসে উঠতে থাকে—সেই মুখখানি হুগোর

হুগো, আমার প্রিয়তম, তুমি আজ কোথায়? কত দিন দেখিনি তোমায়। আজই এই মুহূর্তে তোমাকে বেশী করে মনে পড়ছে কেন বলো তো। কাছে নেই তবু যেন তুমি আমার পাশটিতেই আছে, জড়িয়ে আছে আমার বুকের মধ্যে।

কর্ণওয়ালা। মনে পড়ে তোমার কর্ণওয়ালের সেই ভাললাগা দিনগুলির কথা? সেই মধুর দিনগুলি কি ভোলা যায়।

আকাশ ছোঁয়া পাহাড়, পাহাড়ের পাশেই ধু-ধু বালিয়াড়ি, সামনে অথৈ জল জলের কলকল শব্দ, মিসেস হ্যামিল্টন, আর সিরিল...

আধো আধো স্বর আবদার করতে সিরিল জলে সাঁতার কাটবার জন্য। তোমার ইচ্ছে নয় যে, ওর সেই আবদারে সাড়া দিই। তোমার চোখে চোখ পড়তেই তুমি মাথা নাড়তে। আমি যেন ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে ঘুম পাড়াতাম সিরিলকে। ঘুমিয়ে পড়তো ও। তারপর বেরিয়ে পড়তাম তোমার সঙ্গে বেড়াতে।

এমনি একটা দিনের কথা মনে পড়ছে আজ। সেদিন চাঁদ উঠেছিল আকাশে। বিস্তীর্ণ বালিয়াড়ির ওপর জ্যোৎস্নার আলো লুটোপুটি খাচ্ছিল। ভিজে বাতাসে জলের সোঁদা

সোঁদা গন্ধ মাতাল করা হাওয়া। দুজনে পাশাপাশি হাঁটছিলাম হাতে হাত রেখে গায়ে না ঠেকিয়ে। মনে মনে ভাবছিলাম আমরা, আমাদের চলার পথ যদি শেষ না হয় কখনো। আর তখনই হঠাৎ..হ্যাঁ, হঠাৎই তুমি একটা অদ্ভুত কাজ করে বসলে আমাদের পথে চলার সাময়িক বিরতি ঘটিয়ে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলে তুমি আমাকে। আমি মুখ তুলে তাকালাম তোমার চোখের দিকে, বুঝি...বা কোনো কিছুর প্রত্যাশার জন্য। তোমার চঞ্চল চোখ দুটি কি যেন বলার মধ্যে উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল তখন। খানিক পরেই তোমার মুখখানি নেমে আসে আমার কানের কাছে, ফিসফিসিয়ে তুমি আমাকে শুধোলে, আমি, আমি তোমাকে ভালবাসি ভেরা

এরই জন্য কি আমি অপেক্ষা করছিলাম। তা না হলে তোমার সেই আবেগভরা কথাটা কেনই বা আমার কাছে স্বপ্নের মতো মনে হবে? আবেগে চোখ বুজে এলো আমার। অস্ফুটে, বলেই ফেললাম, জানি, জানি গো সজনী, তোমার এই স্বপ্নের কথাটা শুনে আজ আমার রজনী যাবে ভাল।

কিন্তু ভেরা।

বেশ তো একটা আবেগ এনে দিয়েছিলে তুমি আমায়। তোমার মুখ থেকে আমার বাণী শুনে ভেবেছিলাম সজনী সুন্দর একটা স্বপ্ন দেখবো আজ রজনীতে। লক্ষ্মীটি সেই স্বপ্নটা তুমি আমার ভেঙ্গে দিও না

আমার যে আরো কিছু বলার ছিল ভেরা, তুমি তখন বলে যাচ্ছিলে, হয়তো তোমার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে ভেরা, তোমাকে আর কোনদিনও বিয়ে করতে পারবো না। আমি এক কপর্দকশূন্য পুরুষ। মরিস মারা যাওয়ার পর তোমার মতো আমিও স্বপ্ন দেখতে শুরু করি-বিত্তবান হওয়ার একটা সুযোগ হয়েছিল আমার। এখন আর সেই সম্ভাবনাটা নেই। তার মৃত্যুর তিন মাস পরে জন্ম নিলো সিরিল। সিরিল ছেলে না হয়ে যদি মেয়ে হতো।

তোমার দুঃখটা আমি বুঝি, একটুও বাড়িয়ে বলোনি তুমি। সিরিল নামে এই শিশু ভাইপোটি তোমার সব স্বপ্ন, সব সম্ভাবনা ভেঙ্গে রেণু রেণু করে উড়িয়ে দেওয়ার জন্যই জন্ম নিয়েছে।

জন্মের মুহূর্ত থেকেই সিরিল রুগ্ন। তার শরীরে কোনো বাড়-বাড়ন্ত ছিলো না। হাত-পায়ের জোরও ছিলো না, অনেকটা জবুথবুর মতো। মরতে কেন যে জন্ম নিলো সে এই নির্ধুর পৃথিবীতে।

আমি সাঁতার কাটবো, তুমি আমাকে জলে নিয়ে চলল।

তুমি সাঁতার কাটবে এই রুগ্ন শরীরে, পদ্ম হাত-পা নিয়ে? আর স্রোতের কি টান দেখবো?

আমি তোমার কোনো অজুহাত শুনবো না। তুমি আমাকে জলে নিয়ে চলো

বেচারি জানতো না যে, সেই জলের মধ্যেই ছিলো তার মৃত্যুর হাতছানি।

ঘুম আসছে না দেখে বিছানা থেকে নেমে দাঁড়ালো ভেরা। ফায়ারপ্লেসের তাকের ওপর রাখা শিশি থেকে তিনটে ঘুমের বড়ি বার করে ভেরা তার মুখে চালান করে দিলো। এবার নিশ্চয় ঘুম নেমে আসছে তার চোখে ভাবলো ভেরা। আর চিরদিনের মতো ঘুমিয়ে পড়ার জন্য আট-দশটা ঘুমের বড়িই যথেষ্ট, আত্মহত্যা করার জন্য পটাসিয়াম সায়ানাইডের প্রয়োজন হবে না তার। মাস্টার্নের মতো বোকা নয় সে। আজকের দিনে বিষ খেয়ে কেউ আত্মহত্যা করে না কি।

হঠাৎ দেওয়ালে টাঙ্গানো সেই কবিতাটির দিকে চোখ পড়ে গেলো ভেরার

দশটি কালোমানিক, দশটি কালো হীরে।

এক ঢোকে জল খেতে গিয়ে একজনের দম এল না আর ফিরে।

শিউরে উঠলো ভেরা, আতঙ্কের বিরাট শরীরটা। মুহূর্তে কুঁকড়ে যেন এতটুকু হয়ে গেলো। আচ্ছা মাস্টার্নও তাতে। দম আটকেই মারা গেছে তাই না? আশ্চর্য। কবিতাটির

কিন্তু আত্মহত্যা বা করতে গেলে সে কোন দুঃখে? না, না, এত কষ্ট পেলেও আমি কখনোই আত্মহত্যা করতে পারবো না। আমার এ-জীবনের অনেক দাম। আর সবাই

শ্রাদ্ধ দেন দেয়ার গুয়াজ নান । শ্রাদ্ধাখ্যা ত্রিষ্টো উপন্যাস

মরুকগে, আমি কিন্তু বাঁচতে চাই, আমি ঠিক বেঁচে থাকবো, বাঁচার জন্যই তো এই
জীবন,

.

০৬.

ডঃ আর্মস্ট্রংকে ঘুমের জন্য খুব একটা আরাধনা করতে হলো না। একটু পরেই স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেন তিনি।

একটা বিরাট অপারেশন থিয়েটার...হাত দুখানা অবশ হয়ে আসছে, যে কোনো মুহূর্তে ছুরিটা খসে পড়তে পারে হাতের মুঠো থেকে। তীব্র আলোয় চিকমিক করে উঠলো ইস্পাতের ফলাটা। রোগীর অপারেশনের কথা ভুলে গিয়ে তিনি এখন ভাবছেন, এমন একটা ধারালো ছুরি হাতে পেলে কাউকে খুন করতে একটুও অসুবিধে হবে না।

খুন। হ্যাঁ খুন তাতে। আমি আগেই করে ফেলেছি। ঐ তো মেয়েটির স্পন্দনহীন দেহখানি পড়ে রয়েছে অপারেশন টেবিলের ওপর। সঙ্গে কাপড়ে ঢাকা রয়েছে তার মুখ। কিন্তু কাকেই বা আমি খুন করেছি? কে, কে ঐ মেয়েটি, লর্সকে একবার জিজ্ঞেস করবো? কিন্তু কেমন যেন সন্দেহের চোখে তাকিয়ে আছে সে আমার দিকে। তবে কি ও কিছু একটা আন্দাজ করতে পেরেছে...মেয়েটিকে আমি খুন করেছি?

আর মুখটাই বা ঢাকলো কে? খোলা থাকলে চিনতে পারতাম, আমি কার ঘাতক। কি যে সব অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা ঘটিয়ে ফেললাম।

আমার মনের ভাবনাটা বুঝি টের পেয়ে থাকবে ছোকরা ডাক্তারটি। ধীরে ধীরে মৃত মেয়েটির মুখের ওপর থেকে কেমন সরিয়ে দিচ্ছে চাদরটা, সম্পূর্ণ করে সরিয়ে দিতেই চমকে উঠলাম, একি। আরে এ যে দেখছি আমাদের এমিলি ব্রেন্ট? উঃ কি বীভৎস চেহারা হয়েছে ওঁর মুখের। দুচোখ দিয়ে ঠিকরে পড়ছে গনগনে আগুন। কিন্তু উনি তো এখনো মরেননি, হা হা ঐ তো ঠোঁট নাড়ছেন, উনি কি যেন বলতে চাইছেন-আমরা এসে দাঁড়িয়েছি মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে, নাহি ভয়, নাহি ভয়-অভয় বাণী শুনিয়ে আবার হাসছেন উনি, এক চিলতে। ভয়ঙ্কর বিদ্রূপ মাখানো সেই হাসি। অসহ্য। নমি, ইথারের শিশিটা আমার হাতে তুলে দাও, ওঁকে ঘুম পাড়াতে হবে। জাগ্রত অবস্থায় কেউ কাউকে খতম করতে পারে নাকি।

ইথারের শিশির ছিপি খুলে এমিলির ফাঁক হয়ে যাওয়া মুখের ভেতরে ঢালতে গিয়ে আর এক দফা চমক লাগলো। আজ যেন একটার পর একটা অদ্ভুত সব কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে। একটু আগের দেখা এমিলি এখন হয়ে গেলো মাস্টার্ন। তোমরা কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা শুরু করে দিলে শেষ পর্যন্ত?

বড় জোরে জোরে হাত-পা খিচছে সে। এমন করলে খুন করবো কি করে। ওকে সবাই মিলে শক্ত করে ধরে থাকো। যতক্ষণ না আমি ছুরি চালাই, না ঠিক হচ্ছে না, হ্যাঁ, এই ভাবে নমি তুমি ওর হাত দুটো ধরো, আর ডাক্তার তুমি ধরো পা দুটো। ধ্যাৎ, তোমাদের দ্বারা কিম্ব্দা হবে না। আমাকেই সামলাতে হবে দেখছি। যেই না ওর হাত-পা একটু কায়দা করে ধরতে যাবো, একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়ে ছিটকে পড়লাম। প্রচণ্ড ঝাঁকুনির

দরুণ ঘুম ভেঙে গেলো ডঃ আর্মস্ট্রং-এর। ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকালেন আর্মস্ট্রং। স্বপ্নভঙ্গ হতেই ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন তিনি বিছানার ওপর।

তখন ঘরের মধ্যে লুটোপুটি খাচ্ছিলো ভোরের প্রথম আলো। তার এই আলোয় তিনি দেখতে পেলেন রগার্স দাঁড়িয়ে আছে তার শিয়রে। তার ফ্যাকাসে থমথমে, চোখের দৃষ্টি তার ঝাপসা, উৎকণ্ঠায় আবিষ্ট, একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা তাকে যেন কুরে কুরে খাচ্ছিল।

কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে বোধহয় কোথাও হিসেবে গরমিল হয়ে গেছে। সেটা পরের ভাবনা, পরে ভেবে দেখবো।

ব্যাপার কি বল-তোরগার্স। সাত সকালে তুমি এখানে কি মনে করে?

সর্বনাশ হয়ে গেছে স্যার, আমার স্ত্রীর ঘুম আর ভাঙছে না। সকাল থেকে কতো ডাকাডাকি করলাম, কিন্তু সাড়া দেওয়ার নাম নেই।

সে কি। তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন আর্মস্ট্রং, ফিতে আটলেন ড্রেসিং গাউনের। তারপর রগার্সকে অনুসরণ করে দ্রুত পায়ে নেমে চললেন নিচে সিঁড়ি বেয়ে।

বাঁ দিকে কাত হয়ে শুয়েছিল মিসেস রগার্স? যন্ত্রণার লেশমাত্র ছিলো না তার মুখে। শান্ত হয়ে গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে আছে সে যেন, সকলের রোদে উদ্ভাসিত তার সুন্দর মুখখানি।

তার বরফ ঠাণ্ডা হাতখানি তুলে নিয়ে নাড়ি টিপলেন ডঃ আর্মস্ট্রং, স্পন্দহীন দেহ। সন্দেহ মুক্ত হওয়ার জন্য চোখের পাতা টেনে দেখলেন। তারপর তাকালেন রগার্সের মুখ-পানে তার চোখে চিন্তার ছাপ পড়ে।

তবে কি স্যার আমার ইথেল-?

হ্যাঁ, রগার্স, শান্ত সংযত স্বরে বললেন আমস্ট্রং, তোমার, স্ত্রী আর বেঁচে নেই, মৃত সে।

মারা গেছে? যেন নিজের মনেই বিড়বিড় করে বলে উঠলো রগার্স তাহলে কি ও হার্টফেল করে।

সব মৃত্যুই হার্টফেল করে হয়। আর তোমার স্ত্রীর হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল মৃত্যুর আগে। কিন্তু কেন যে বন্ধ হল, সেটাই আমার কাছে বড় বিস্ময়। একটু থেমে আমস্ট্রং আবার মুখ খুললেন, আচ্ছা রগার্স তোমার স্ত্রীর স্বাস্থ্য কেমন যাচ্ছিল ইদানিং?

কেন, খুব ভালই তো ছিলো। তবে মাঝে মধ্যে হাঁপানির টানটা একটু বাড়লে কষ্ট পেতো। অবশ্য তার জন্য ডাক্তার ওষুধ করতে হয়নি কোনোদিন।

ঘুমের ওষুধ-টষুধ খাওয়ার কি অভ্যাস ছিলো তোমার স্ত্রীর?

না স্যার, ঐ যে বললাম, ওষুধ-টষুধ এমনিতেই খুব কম খেতো সে, আর ঘুমের ওষুধ তো একেবারেই নয়।

রগার্সের কথায় ঠিক বিশ্বাস হলে না আর্মস্ট্রং-এর, ঘরের সমস্ত আসবাবপত্র নেড়ে-চেড়ে দেখলেন, কিন্তু কোথাও ঘুমের ওষুধের একটা খালি শিশি পর্যন্ত পেলেন না।

নিচু গলায় বললে রগার্স, জানেন ডাক্তারবাবু গতকাল রাতে আপনার সেই ওষুধ খাওয়ার পর আর কিছুই খায়নি ও, এমন কি একফোঁটা জল পর্যন্ত নয়।

সকাল নটার সময় প্রাতঃরাশের ঘণ্টা পড়লো। তার আগেই সকলের ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। জোড়ায় জোড়ায় গুল্ল গুল্লবে মেতে উঠেছিল তারা। জেনারেল ম্যাকআর্থার এবং ওয়ারথ্রেভ প্রাসাদের উদ্যানে পায়চারি করতে করতে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করছিলেন।

ওদিকে ভেরা আর লম্বার্ড তখন প্রাসাদের পিছনের পাহাড়ের ওপর ওঠার চেষ্টা করছিল। একটা টিলার ওপর ওঠার মুখে ব্লোরের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো তাদের।

লম্বার্ডের আশায় সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বসেছিলেন ব্লোর। তাদের সঙ্গে দেখা হতেই নিরাশ হয়ে বললেন তিনি লম্বার্ডের কোনো পাত্রা নেই। তারপর আকাশ পানে তাকিয়ে তিনি আবার বললেন, নির্মেষ আকাশ, আজও যথেষ্ট পরিষ্কার।

সে আর কতক্ষণ, কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো লম্বার্ড, বিকেলেই কালো মেঘে ছেয়ে যাবে আকাশ, ঝড় উঠবে দেখবেন।

ব্লোর বোধহয় কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু চুপ করে গেলেন প্রাসাদ থেকে ঘণ্টা বাজার শব্দ শুনে।

কজি-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললো লম্বার্ড নটা বাজে প্রাতঃরাশের ঘণ্টা পড়লো। ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে, চলুন এবার, যাওয়া যাক প্রাসাদের দিকে।

পাহাড় বেঁকে নামতে গিয়ে ব্লোর মুখ খুললেন, মাস্টার্ন কেন যে আত্মহত্যা করতে গেলো, আমার মাথায় আসছে না। সারাটা রাত ধরে চিন্তা করার পরেও কেন জানি না আমি এর কোনো সমাধান খুঁজে পেলাম না।

ভেরা একা একা এগিয়ে গিয়েছিল। লম্বার্ড এবং ব্লোর হাঁটছিল পাশাপাশি। নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলো লম্বার্ড, আত্মহত্যা ছাড়া অন্য কিছু ভেবে দেখেছেন?

অন্য কিছু মানে কি হতে পারে, এ নিয়ে অনেক চিন্তা-ভাবনা করেছি বৈকি। যেমন- তেমন ছেলে নয়-এই মাস্টার্ন। ওর চলা-ফেরা-কথা-বার্তা শুনে আমার ধারণা, যথেষ্ট সম্মানিত ও পয়সাওয়ালা ঘরের ছেলে তো বটেই, পড়াশোনাও করেছে প্রচুর ও। এ হেন ছেলে আত্মহত্যা করতে যাবে কোন যুক্তিতে বলুন?

বসবার ঘর থেকে দ্রুতপায়ে বেরিয়ে এসে ভোরের কাছে জানতে চাইলেন এমিলি, লক্ষের
কোনো হৃদয় পেলেন?

না কোনো চিহ্নই দেখতে পেলাম না। ভেঙ্গে পড়লেন এমিলি হতাশ ব্যঞ্জক উত্তর শুনে।
বিমর্ষ মুখে তাদের সঙ্গে ঢুকলেন ডাইনিংরুমে।

অটল খাবারের আয়োজন। স্নান-বিষণ্ন মুখে তাদের খাওয়ার তদারকি করতে থাকে
রগার্স। এই কয়েক ঘণ্টায় তার চোখের কোলে কালি পড়ে গেছে, মুখ ফ্যাকাশে সাদা
হয়ে কাছের স্ত্রী বিয়োগে। সেটা লক্ষ্য করে হঠাৎ এমিলি জিজ্ঞেস করে বসলেন, আপনারা
লক্ষ্য করেছেন, আজ রগার্সকে কেমন যেন একটু অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে, ওর শরীর ভাল
আছে তো?

হ্যাঁ, শরীর তো ভাল তবে

তবে কি?

প্রাতঃরাশ শেষ হওয়ার পর সব বলবো। এ নিয়ে আপনাদের সঙ্গে পরামর্শ করাও
দরকার?

সকলের প্রাতঃরাশ শেষ হলে এক এক করে সকলের আগ্রহান্বিত মুখের ওপর দৃষ্টি
বুলিয়ে নিলেন আর্মস্ট্রং। মনে মনে বিড়বিড় করেই বললেন, এটা একটা দুঃসংবাদই

বটে। খাবারের তৃপ্তিটুকু উপভোগ করতে গিয়ে যাতে আপনারা বাধার সম্মুখীন না হন, তাই আগে বলিনি। জানেন, রূপালির স্ত্রী মারা গেছে।

সেই মুহূর্তে ঘরে যেন বাজ পড়লো। স্তব্ধ হতবাক হয়ে গেল সকলে। সকলের স্থির দৃষ্টি তখন আমস্ট্রং-এর ওপর। কারোর মুখে কথা নেই। হঠাৎ সবাই যেন বোবা হয়ে গেছে। তারই মাঝে অকস্মাৎ চিৎকার করে বলে উঠলো ভেরা এ আপনি কি বলছেন ডক্টর? আশ্চর্য। এখানে আসার পর চব্বিশ ঘণ্টাও কাটলো না, এরই মধ্যে দু-দুটো মৃত্যু?

আমস্ট্রং-এর দিকে ভুরু কুঁচকে তাকালেন ওয়ারথেন্ড, এ যে দেখছি ভয়ঙ্কর বিস্ময়। তা মৃত্যুর কারণটা নির্ণয় করতে পেরেছেন ডাক্তার?

এখুনি ঠিক বলা মুশকিল

অর্থাৎ পোস্টমর্টেম না হওয়া পর্যন্ত বলা মুশকিল, এই তো?

হ্যাঁ, ঠিক তাই। এক্ষেত্রে ভাল করে না জেনে-শুনে ডেথ সার্টিফিকেট দিতে পারছি না।

আমার মনে হয় তাদের কথার মাঝে বাধা দিয়ে এবার ভেরা বললো, হয়তো মিসেস রগার্সের নার্ভ দুর্বল ছিলো। তার ওপর গতকালের অমন আকস্মিক ঘটনায় হয়তো মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। আর তাতেই তার মৃত্যু ঘটে থাকবে।

তা না হয় মানলাম, কিন্তু- ভেরার যুক্তিটা ঠিক মেনে নিতে পারলেন না আর্মস্ট্রং। মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেললে মানুষ পাগল হয়ে যায়, কিন্তু কখনোই সে মরে না।

বিবেক, বিবেকদের দংশনেও তো মৃত্যু হতে পারে না? এবার এমিলি তার ধারণার কথা প্রকাশ করলো।

এখানে বিবেকের প্রশ্ন আসে কি করে? এবারেও এমিলির যুক্তি ঠিক মেনে নিতে। পারলেন না ডঃ আর্মস্ট্রং।

কেন গতকাল রাতে গ্রামোফোন রেকর্ডে সেই সব অভিযোগের কথাগুলো এরই মধ্যে আপনি ভুলে গেলেন? এমিলি আরো বলে সেই যে, স্বামী স্ত্রী দুজনে মিলে তাদের পুরনো মনিবকে হত্যা করার অভিযোগ প্রতিধ্বনিত হলো রেকর্ডে। হয়তো এটা তারই প্রতিক্রিয়া-হয়তো সেই অভিযোগটা একেবারেই মিথ্যে নয়, সত্যি সত্যিই তারা হয়তো খুন করে থাকবে তাকে। সে খবর চাপা ছিলো, এতোদিন পরে তাদের সেই কু-কীর্তি ফাঁস হয়ে যাওয়াতে বিবেকের দংশনই মিসেস রগার্সকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়ে থাকবে হয়তো।

না, না এটা ঠিক নয়, জোরে জোরে মাথা নাড়লেন আর্মস্ট্রং। আপনার কল্পনার কথা বাস্তবে মিলিয়ে ফেলার অযথা চেষ্টা করবেন না মিস্ ব্লেন্ট। চিকিৎসা বিজ্ঞানে বিবেক-টিবেক বলে কিছু নেই। ধরা যাক, মিসেস রগার্সের হার্ট অত্যন্ত দুর্বল ছিলো।

আপনি যাই বলুন না কেন, এমিলি নিজের বক্তব্য জোরালো ভাবে সমর্থন করে বললেন, আমি এখনো বিশ্বাস করি, আমি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি, তিনিই পাপীকে তার প্রাপ্য শাস্তি প্রদান করে তার কর্তব্য পালন করেছেন।

এমিলির কথায় ব্লোর যেন একটু আঘাত পেলেন, ছিঃ মিস্ ব্লেন্ট, আপনি কি যা তা বলছেন?

কেন, আমি কি এমন ভুল বলেছি। ব্লোর দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকালেন এমিলি পাপের ফল তো ভুগতেই হবে পাপীকে। ঈশ্বরের নিখুঁত বিচারে পাপীর যে রেহাই নেই, ও আমি একান্ত ভাবে বিশ্বাস করি।

রেহাই যে একেবারেই নেই জোর দিয়ে তা বলা যায় না। গালে হাত রেখে বললেন ব্লোর, কতো পাপীই না আমাদের সঙ্গে মিশে আছে, আমরা তাদের কজনকেই বা চিনি।

অতো সব বিশ্লেষণে আমাদের কাজ নেই, প্রসঙ্গটাকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করলেন ব্লোর, এখন আমাদের জানতে হবে, কাল রাতে কি খেয়েছিলেন মিসেস রগার্স।

কিসসু নয়, বললেন আর্মস্ট্রং।

অসম্ভব, আমি বিশ্বাস করি না।

তার স্বামী, রগার্স নিজে আমাকে বলেছেব্যঙ্গ করে বললেন আর্মস্ট্রং এর পরেও কি অবিশ্বাস করবেন?

কে কে বলেছেন বললেন-তার স্বামী রগার্স? একটা কেমন তাচ্ছিল্যের ভাব প্রকাশ পেলো ব্লোরের কথায়, সে তো বলবেই?

আর্মস্ট্রং এবং লস্কার্ড দুজনেই একসঙ্গে ফিরে তাকালেন ব্লোরের দিকে।

আবার সেই তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললেন ব্লোর বড় বিচিত্র এই পৃথিবী, তার চেয়েও বিচিত্র বোধ হয় মানুষের মন, কার মনে কি আছে বাইরে থেকে বোঝা মুশকিল। এই কালকের সেই ঘটনার কথাই ধরুন না কেন-আমরা প্রত্যেকেই আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ অস্বীকার করে ক্ষোভ প্রকাশ করলাম, পাগলের কাণ্ড বলে উড়িয়ে দিলাম। কিন্তু যদি একটু তলিয়ে দেখা যায়, সেটা নিছক কারোর পাগলামি বলে আদৌ মনে হবে না। তাহলে এর থেকেই আমরা ধরে নিতে পারি, রগার্স ও ওনার স্ত্রীর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ একেবারে মিথ্যা নয়। এও হতে পারে সত্যিই তারা তাদের বৃদ্ধা মনিবকে খুন করেছিল। এতোদিন এই জঘন্য ঘটনার কথা চেপে গিয়েছিল তারা। কিন্তু একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলেন ব্লোর, যাকে আমরা কাজ পাগল বলে কোনো আমল দিতে চাইছি না, যে যখন সেই সত্যটা প্রকাশ করে দিলো, তখন প্রথমেই ভয় পেয়ে গিয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেললো রগার্সের স্ত্রী। রগার্সও আতঙ্কিত হয়ে উঠলো মনে মনে। তার আশঙ্কা হলো, এবার বোধহয় আর রেহাই নেই, তার সেই দুষ্কৃতির কথা দুর্বল মুহূর্তে যদি তার স্ত্রী প্রকাশ করে দেয়, তখন তার আর বাঁচার পথ থাকবে না। অতএব

অতএব তার স্ত্রীর মুখ চিরদিনের জন্য বন্ধ করা, প্রয়োজন। কিন্তু কি ভাবে?

কেন উপায় তো খুব সহজ। স্ত্রীর কোন পানীয়ের সঙ্গে কিছু একটা মিশিয়ে তার পক্ষে তাকে এমন ভাবে ঘুম পাড়িয়ে রাখলো, যা এ জীবনে ঘুম আর কখনো ভাঙবে না।

বাঃ আপনি চমৎকার গল্প বানাতে পারেন তো মিঃ ব্লোর, আমস্ট্রং-এর মুখে শ্লেষের হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেলো, তবে আপনাকে বলে রাখি মৃতের ঘরে খালি চায়ের কাপ কিংবা জলের গ্লাস আমি দেখতে পাইনি।

চোখে না পড়ারই তো কথা। রগার্স কি এতই বোকা? সে তার কাজ হাসিল করার পরেই পাতটি ধুয়ে মুছে যেখানে রাখার ঠিক রেখে দিয়ে থাকবে।

তাদের আলোচনার মাঝে বাধা দিয়ে বললেন ম্যাকআর্থার, মিঃ ক্লোরের ধারণার কথা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে কথা হচ্ছে, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার ভাবতে গিয়ে কেমন অবাক লাগে তাই না?

চাচা আপন প্রাণ বাঁচা। নিজের জীবনের কাছে ও-রকম নিষ্ঠুর ব্যবহার-ট্যবহার করেই থাকে সবাই। তখন মানবতার প্রশ্ন-টশ্ন বলতে কিছু থাকে না। কৈফিয়ত দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন ব্লোর।

প্রাসাদের বাইরে পথের ওপর পায়চারি করছিলেন ব্লোর ও লম্বার্ড। এক সময় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বললো লম্বার্ড, লঞ্চের কি ব্যাপার বলুন তো? এখনো এসে পৌঁছলো না

আর পৌঁছবে না রহস্যময় হাসি হাসলেন ব্লোর মানে এখানে আসতে দেওয়া হবে না। সেই বন্ধ পাগলটার এটাও একটা পাগলামি বলে ধরে নিতে পারেন।

আমারও তাই ধারণা হঠাৎ অন্যের কণ্ঠস্বর শুনে পিছন ফিরে তাকালেন দুজন, ম্যাকআর্থার সখেদে আরো বললেন, লঞ্চ আসার সম্ভাবনা নেই। সেই সঙ্গে এই অভিশপ্ত দ্বীপ থেকে ফিরে যাওয়ারও কোনো উপায় নেই আর। শেষ দিকে গলা ভারী হয়ে এলো, মুখের সামান্য হাসিটুকুও মুছে গেলো, চোখের দৃষ্টি উদভ্রান্ত হলো। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে ম্লান বিষঃ গলায় বললেন তিনি, এখানে অপার শান্তি, এই ভাল। জীবনের শেষ সীমানায় এসে পৌঁছেছি আমরা, আমরা জেনেছি, কেউ আর ফিরবো না এখান থেকে, ফিরতে পারি না-

তারপর তিনি আর দাঁড়ালেন না, সেখানে বালিয়াড়ির পথে এগিয়ে গেলেন দ্রুত পায়ে। ঢল নেমেছে সমুদ্রের দিকে। একটু পরেই তার শরীরটা দৃষ্টির আড়ালে চলে

বিরক্তি প্রকাশ করলেন ব্লোর, ফিরবো না বললেই হলো। আলবাৎ ফিরবো আমরা। ফিরে যাওয়ার জন্যই তো আমরা এখানে এসেছি। মাস্টার্ন মিসেস রগার্সের মতো চিরদিন এখানে চির ঘুমে ঘুমিয়ে থাকার জন্য তো আমরা আসিনি।

হ্যাঁ, বটেই তো। বটেই তো, লম্বার্ডের চোঁটে বিদ্রূপের হাসি। এক পলকে ব্লোরকে একবার দেখে নিয়ে লম্বার্ড আবার বললো, অন্যদের কপালে যাই ঘটুক না কেন, আপনার পরমায়ু কমিয়ে আনবে, এমন দুঃসাহস কার আছে শুনি।

তার বিদ্রূপটা ধরে ফেলেছেন ব্লোর। তীক্ষ্ণস্বরে বলে উঠলেন তিনি এ আমার ব্যক্তিগত সমস্যা মিঃ লম্বার্ড। অতএব ভাবনা আমাকেই ভাবতে দিন। অহেতুক আমার ব্যাপারে মাথা ঘামানোটা একেবারেই পছন্দ নয়, মনে থাকে যেন।

আহত স্বরে বললো লম্বার্ড, হ্যাঁ মনে থাকবে। কথাটা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ।

প্রাসাদের ভেতরে একা একা থাকতে গিয়ে আমস্ট্রং-এর যেন দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলো। তাই তিনি বাইরে বেরিয়ে এলেন। প্রথমেই চোখে পড়লো ব্লোর আর লম্বার্ড কি একটা ব্যাপারে, যেন জোর তর্ক চালাচ্ছে, এবং ওয়ারথ্রেভ একা একা পায়চারি করছেন অদূরে। আশেপাশে অন্য কারোর টিকিও দেখা গেলো না।

একটু সময় কি ভেবে ওয়ারথ্রেভের দিকে এগিয়ে গেলেন ডঃ আর্মস্ট্রং। ঠিক সেই সময় পথের মধ্যে ছুটে এসে দাঁড়ালোরগার্স। সাদা কাগজের মতো ফ্যাকাসে মুখ, উদভ্রান্ত চোখের দৃষ্টি।

খুব জরুরী দরকার । একবার প্রাসাদের ভেতরে আসবেন, এখুনি?

কেন আবার কি হলো রগার্স?

কাল থেকে একটার পর একটা অদ্ভুত সব ঘটনা কেমন ঘটে যাচ্ছে । এ সব দেখে শুনে মনে হচ্ছে আমি বোধহয় সত্যি সত্যি পাগল হয়ে যাবো ।

কেন এখন আবার নতুন করে কি ঘটলো?

নতুন করে ঠিক নয়, কালকের ঘটনার পুনরাবৃত্তি বলতে পারেন । আপনি হয়তো ভাবছেন, সদ্য আমার স্ত্রী মারা গেছে বলে বোধহয় আমার মাথার গোলমাল হয়ে গেছে । কিন্তু বিশ্বাস করুন, ডাক্তারবাবু আমি এখনো সম্পূর্ণ সুস্থ আছি । তবে এর পরে নতুন করে অবাক হওয়ার কোনো ঘটনা ঘটলে আমার মাথার গোলমাল হয়ে যাবে দেখবেন ।

ভনিতা না করে কি হয়েছে চটজলদি বলেই ফেলো না ।

হ্যাঁ, বলবো বলেই তো এসেছি, প্রাসাদে প্রবেশ করে সোজা রগার্সের শোওয়ার ঘরে চলে এলেন আর্মস্ট্রং তারপর বললো সে । কাঁচের শোকেসের ঐ পুতুলগুলো দেখতে পাচ্ছেন, চিনামাটির সুন্দর সুন্দর পুতুলগুলো ভাল করে তাকিয়ে দেখুন ভাল করে দেখতে পাচ্ছেন তো?

ইঁ মাথা নেড়ে সায় দিলেন আমস্ট্রং। আমরা এখানে যখন আসি তখন ওখানে দশ-দশটি সুন্দর সুন্দর পুতুল দেখেছিলাম।

হ্যাঁ, আমরাও দশটি পুতুল দেখেছিলাম বৈ কি।

কিন্তু জানেন ডাক্তারবাবু, গতকাল আপনাদের সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঘরে শোয়ার আয়োজন করছিলাম হঠাৎ নজরে পড়লো দশটা পুতুলের মধ্যে একটা কম। অর্থাৎ নটা মাত্র পুতুল আছে। কাল ভেবেছিলাম, বোধহয় গুণতে আমি ভুল করে ফেলেছি। হয়তো আমার সেই ভুলটা ভেঙ্গে যেতেই ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম আমি, তবে আজ আর সেই ভুলটার পুনরাবৃত্তি ঘটচ্ছি না। কিন্তু না, আপনার আজ প্রাতঃরাশ সেরে চলে যাওয়ার পর ঘরদোর পরিষ্কার করতে গিয়ে দেখি আর এক অদ্ভুত ঘটনা-এবার নটা পুতুল দেখতে পেলাম না, মাত্র আটটি। কি আশ্চর্য। আমার নিজের চোখকে অস্বীকার করবো কি করে? আপনিই বলুন নটার বদলে আটটা পুতুল দেখলে কে না অবাক হবে?

০৭.

প্রাতঃরাশের পর এমিলি ও ভেরা আবার সেই পাহাড়ের চূড়াটার ওপর গিয়ে উঠে বসলো। উদ্দেশ্য লক্ষ্য আসছে কিনা দেখার জন্য।

আগের চেয়ে বাতাসের তীব্রতা বেড়েছে। যতদূর দৃষ্টি যায়, কেবল ঢেউ-এর পর ঢেউ উত্তাল সমুদ্রের বুকে ভেঙ্গে পড়ছে আবার নতুন করে গড়ে উঠছে, সমুদ্র তীরে এসে আছড়ে পড়ছে, ফেনলি জলরাশি ছড়িয়ে পড়ছে ধূসর বালিয়াড়ির ওপর।

দুজনেরই দৃষ্টি চলে যায় দূরে, বহু দূরে, সমুদ্রের গভীরে, কিন্তু কোথাও লক্ষ্যের চিহ্ন চোখে পড়ল না তাদের। ওপারে স্টিকল হ্যাঁভেনের গ্রামগুলো এপার থেকে সারি সারি পাহাড়ের মতো দেখাচ্ছিল। আকাশটা যেন সেই পাহাড়গুলোর চূড়ায় মিশে গিয়ে একাকার হয়ে গেছে।

আশাহত হয়ে নিচু গলায় বললেন এমিলি, লক্ষ্যের ঐ চালকটার কি যেন নাম-হা মনে পড়ছে ফ্রেড, ফ্রেড নারাকটকে দেখে গতকাল মনে হয়েছিল, সমঝদার নোক, তার ওপর নির্ভর করা যায়, কিন্তু আজ দেখো, কি রকম অবিরেচকের মতো কাজ করলো বস, এখনো তার পাত্তাই নেই।

ভেরাও কম অবাক হয়নি। এবং আতঙ্কিত বটে। তার হাত-পা যেন অবশ হয়ে আসছে, যত সময় অতিবাহিত হচ্ছে, ভয়ে আশঙ্কায় ততই যেন কুঁকড়ে যাচ্ছে সে। কোনো রকমে একটা কৃত্রিম স্বাভাবিক ভাব ফুটিয়ে রাখার প্রয়াস রয়েছে তার হাবভাবে, চালচলনে, যাতে আর পাঁচজনের সামনে প্রকাশ না পায়।

শান্তনার বাণী শোনা গেলো তার মুখে ঘাবড়াচ্ছেন কেন লঞ্চ ঠিক আসবে একটু পরেই। আসা মাত্র দেরী না করে এক লাফে উঠে পড়বো লঞ্চ। এখান থেকে যতো তাড়াতাড়ি মুক্তি পাওয়া যায়, ততই ভালো।

সে আর বলতে। জায়গাটা যেমন অদ্ভুত, এখানকার সব কিছুই কেমন যেন বিচিত্র ধরনের এতটুকু সাদৃশ্য নেই পৃথিবীর অন্য কোনো স্থানের সঙ্গে। এমিলি একটু থেমে বলতে শুরু করলো খুব ঠকিয়েছে সে আমাকে। ভাল করে দেখলে ঠিক ধরা যেত, চিঠিটা জাল ছাড়া আর কিছু নয়। অথচ এখানে আসার আগে একবারও খেয়াল হয়নি, চিঠিটা ভুলেও হতে পারে।

হ্যাঁ, আমিও একবার ভুলেও এ-দিকটার কথা চিন্তা করে দেখিনি।

আমরা সবাই কেমন বোকা বনে গেছি ঐ পাগলটার কাছে। আমাদের সবাইকে আকাট মুখ-সুখ ভেবেছে সে। তা না হলে আমরা সবাই এক সঙ্গে ভুল করবোই বা কেন?

আচ্ছা মিস ব্লেন্ট আপনি যা বললেন তা সত্য? সত্য সত্যিই কি রগার্সরা তাদের মনিবকে হত্যা করেছিল?

কি যেন ভাবলেন এমিলি কয়েক মুহূর্তের জন্য, তারপর যেন স্বগোষ্ঠি করলেন হ্যাঁ, সত্য বৈকি। তবে এটা আমার ব্যক্তিগত ধারণা। তা তোমার কি মনে হয় ভেরা?

আমি এখনো সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে পারিনি

এর মধ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া-নেওয়ারই বা কি আছে। যেভাবে রগার্সের বৌ জ্ঞান হারালো, রগার্স যেভাবে কফির ট্রে হাত থেকে ফেলে দিলো, তাতেই তো ওদের মনের কথা স্পষ্ট প্রকাশ পাচ্ছে। আর পরে রগার্স যে সব কথাগুলো বলে গেলো, শুনে তোমার কি একবারও সন্দেহ হয়নি। কথাগুলো বানানো। ডাহা মিথ্যে বলেছে সে। যাইহোক, ওরা যে সত্যিই অপরাধী, তাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

হ্যাঁ, আপনার অনুমাণ অক্ষরে অক্ষরে সত্য। রগার্সের বৌ-এর মুখের ভাব দেখে আমারও কেন জানি না মনে হয়েছিল, একটা অপরাধবোধ যেন তাকে কুঁরে কুঁরে খাচ্ছিল। সব অপরাধীরাই বোধহয় এতো ভীতু হয়ে থাকে, তাদের অতীত অপরাধ বুঝি এভাবেই তাদের পঙ্গু করে তোলে।

এ ব্যাপারে সেই নীতিকথাটা মনে পড়ে যায়-এ জন্মের পাপের শাস্তি তোমাকে এ-জন্মেই মাথা পেতে গ্রহণ করতে হবে। রগার্সের জীবনে সেটা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেলো।

বেশ তো তাই যদি হয়, ভেরা মন্তব্য করলো, তাহলে আর বাকী লোকদের কপালে কি রকম শাস্তি ঘটতে পারে?

তুমি কি বলতে চাইছো একটু স্পষ্ট করে বলবে?

নিশ্চয়ই! দ্বিধার জড়তা পুরোপুরি কাটিয়ে উঠে ভেরা উত্তর দেয়, আমাদের নামেও তো অভিযোগ আনা হয়েছে। রগার্সদের বিরুদ্ধে অভিযোগ যদি সত্যি বলে তুমি মনে করো, তাহলে আমার তোমার ও অন্যদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলিও তো কথাটা অসম্পূর্ণ রেখে এমিলির দিকে তাকালো ভেরা তার প্রতিক্রিয়া উপলব্ধি করার জন্য।

উত্তর না দিয়ে কিছুটা সময় ভেরার দিকে তাকিয়ে রইলেন এমিলি, তারপর মাথা নাড়লেন হ্যাঁ আমি জানি, তুমি কি বলতে চাইছো, যেমন লম্বার্ডের কথাই ধরা যাক না কেন, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, ঐ শয়তানটা একজন আদিবাসীকে হত্যা করেছে। তবে লম্বার্ড নিজেই তার দোষ স্বীকার করে নিয়েছে। সুতরাং তার ব্যাপারটা এখানেই ইতি টানা যেতে পারে। এখানে একটু থেমে হঠাৎ কি যেন মনে পড়েছে এমনি একটা ভাব দেখিয়ে এমিলি আবার বলতে শুরু করলেন। তবে এ কথাও ঠিক যে, সব অভিযোগই যুক্তিগ্রাহ্য নয়। কিছু অভিযোগ আছে, যা শোনা মাত্র বলে দেওয়া যায়, মিথ্যে, ভুলো কিংবা বানানো ছাড়া আর কিছু নয়। এই যেমন মিঃ ওয়ারথের কথাটা ধরা যাক না কেন, তিনি একজন স্বনামধন্য বিচারপতি, তিনি যদি বিচারে কোনো অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করে থাকেন, তাতে তার অপরাধটা কোথায়? মিঃ ব্লোরের ক্ষেত্রেও একই যুক্তি

প্রযোজ্য। আর আমার ব্যাপারটা একটু থেমে কি যেন ভাবলেন তিনি, তারপর আবার বলতে শুরু করলেন, কাল আমি চুপ করেছিলাম। অতোগুলো পুরুষ মানুষের সামনে মেয়েলী ব্যাপারে মুখ খুলি কি করে, বিশ্বাস করো, আমি কোনো দোষ করিনি, আমি নির্দোষ। বেট্রিস টেলরসকে একরকম যেচেই চাকরীটা দিয়েছিলাম। ঘরোয়া কাজ। তবে তার কাজে কোনো খুঁত ছিলো না। কিন্তু

কিন্তু কি?

কদিন যেতে না যেতেই তার আসল রূপ প্রকাশ পেতে থাকলো। সে যে অতি হীন চরিত্রের মেয়ে, ব্যাভিচারিণী, সেটা তখনি বোঝা গেলো-বহু পুরুষের সঙ্গে তার অবাধ মেলামেশা। তার সেই অবৈধ প্রণয়, বহু পুরুষ-ভোগ্যার ফল ফলালো অচিরেই। এমন এক নীতি জ্ঞানহীন দুশ্চরিত্র মেয়েকে ক্ষমা করার কথা মনেই এলো না। তাই বিদায় করে দিলাম তাকে। বিতাড়িত বেট্রিস গেলো তখন তার বাবা-মায়ের কাছে। কিন্তু তারাও তাকে ক্ষমা করতে পারলো না, আশ্রয় মিললো না সেখানে তার। তারপর-

তারপর তার কি হাল হলো?

তারপর আর কি? এ সব মেয়েদের যা হয়ে থাকে তাই হলো শেষ পর্যন্ত। বিবেকের দংশন সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করলো সে। একটা পাপ ঢাকতে গিয়ে আর একটা পাপ করে বসলো সে।

আত্মহত্যা? চমকে উঠলো ভেরা, তার মৃত্যুর খবর শুনে আপনি নিশ্চয়ই খুব দুঃখ পেয়েছিলেন, মনে মনে নিশ্চয় আপনার অনুশোচনা হয়েছিল।

দুঃখ? তা কেন হবে? আর অকারণ নিজেকে অপরাধীই বা ভাবতে যাবে। কেন?

না, মানে-অমন কঠোর না হয়ে তাকে যদি ক্ষমা করতেন, তাহলে হয়তো সে আত্মহত্যার পথটা বেছে নিতো না।

জোরে জোরে মাথা নাড়লেন এমিলি, বেট্রিসের ব্যাপারে আমার করার কিছু ছিলো না। সে নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে। হ্যাঁ, আমি এখানে উপলক্ষ্য মাত্র। ঈশ্বরই বিচার করবেন তার পাপের।

তারপর আর একটা কথাও বললেন না এমিলি, তার দৃষ্টি তখন গিয়ে পড়লো সমুদ্রের দিকে, তখন তার মুখে আর কোনো ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেল না। ঈশ্বরের ওপর পাপ পুণ্য বিচারের ভার সঁপে দিয়ে নিশ্চিত হয়ে অটুট মনোভাব নিয়ে বসে রইলেন তিনি।

হঠাৎ তার সেই পরিবর্তন দেখে দারুণ ভয় পেলো ভেরা, চমকে উঠলো।

ওদিকে একটা চেয়ারের ওপর অর্ধশায়িত অবস্থায় আধবোজা চোখে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে ওয়ারগ্রেভ। অদূরে লম্বার্ড ও ফ্লোর নিঃশব্দে পায়চারি করছেন পাশাপাশি।

ওয়ারথের সামনে এসে দাঁড়ালেন ডঃ আর্মস্ট্রং। তিনি তখন ভাবছিলেন আলোচনার প্রয়োজনের কথা, কিন্তু কার সঙ্গেই বা আলোচনা করবেন, সেটাই তো একটা চিন্তার বিষয়। ওয়ারথের। বিচারক তিনি, সূক্ষ্ম, ন্যায়-নীতি, অপরাধ-নিরপরাধ, এসব ব্যাপারে তার বিচারের নিরীখে বহু মামলার নিষ্পত্তি তিনি করেছেন, কিন্তু এ-ব্যাপারে তিনি যে কতটা কাজে লাগতে পারেন, সেটা বলা মুশকিল। বরং লর্ডকেই বেছে নেওয়া যেতে পারে, যোগ্য লোক সে, বয়সে তরুণ, চটপটে, কথা-বার্তায় তুখোড় মেধাবী অতএব

কথাটা ভাবামাত্র ইশারায় তিনি তাকে কাছে ডেকে বললেন শুনুন, মিঃ লর্ড আপনার সঙ্গে জরুরী আলোচনা ছিলো।

জরুরী আলোচনা। হেসে বললো লর্ড, বেশ তো, ওদিকটায় চলুন, ফাঁকা। আছে—

অপেক্ষাকৃত একটু ফাঁকা। জায়গায় এসে একটু ইতস্তত করে বললেন আর্মস্ট্রং দেখলেন তো চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে চোখের সামনে কি সব ঘটনা ঘটে গেলো, এ-ব্যাপারে আপনার কি ধারণা?

মিসেস রগার্সের এই আকস্মিক মৃত্যুর ব্যাপারে আপনার কি মনে হয়? ব্লোর যে, কাহিনী শোনালেন, বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় আপনার?

না? সব বাজে কথা। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠলো লর্ড, জোর করে একটার সঙ্গে আর একটা সূত্র মেলানো হয়েছে।

আপনি যথার্থই বলেছেন। আপনার যুক্তি আমি সমর্থন করি।

ধরে নেওয়া যাক, অমন একটা জঘন্য অপরাধ করা সত্ত্বেও এতোদিন ওরা বেশ নিশ্চিন্তেই ছিলো। কিন্তু আজই হঠাৎ ভেঙ্গে পড়লো কেন? তাছাড়া আরো একটা কথা আছে-তারা যে তাদের মনিবকে খুন করেছে তার কোনো নির্দিষ্ট প্রমাণ নেই। এক্ষেত্রে তাদের অপরাধীই বা ভাবি কি করে বলুন।

হ্যাঁ, সে কথাও ঠিক। তবে এ-ব্যাপারে আজ সকালেই রগার্সের সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। রগার্সের বক্তব্য হলো, তার মালকিন মিস ব্রাডির হাটের অসুখ ছিলো। আমি একজন চিকিৎসক আমি জানি, এই সব রোগের সাময়িক উপশমের জন্য এ্যামাইল নাইট্রাইট ওষুধ ব্যবহার করা হয়, রোগীর যখন শ্বাস নিতে খুব কষ্ট হচ্ছে তখন এই ওষুধের এ্যাম্পুল ভেঙ্গে নাকের কাছে মেলে ধরলে তার শ্বাস কষ্টের উপশম হয়ে যায় কিছুক্ষণের মধ্যেই, কিন্তু ভুলক্রমে কিংবা একটু অসাবধানতাবশতঃ যদি একফোঁটা সেই তরল পদার্থ তার পেটে চলে যায়, তাহলে আর নিস্তার নেই। রোগীর মৃত্যু হতে বাধ্য।

অবাক বিস্ময়ে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে ডঃ আর্মস্ট্রং-এর বিশ্লেষণ শুনছিল লম্বার্ড। তার কথা শেষ হতেই জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলে উঠলো সে, দারুণ চমৎকার একটা পরিকল্পনা তো।

তাই তো বলছি মিঃ লম্বার্ড। একটা সিগারেট ধরিয়ে আর্মস্ট্রং তার কথার জের টেনে বললেন, কতই না সহজ, কোনো ঝামেলা নেই, থাকবে না কোনো প্রমাণ কিংবা চিহ্ন। এর জন্যে ব্যবহার করতে হবে না আর্সেনিক কিংবা সায়ানাইড। কোনো রকমে এক ফোঁটা এ্যামাইল নাইট্রাইট রোগীর পেটে পৌঁছে দিতে পারলেই হলো, ডাক্তারের বাবার ক্ষমতা নেই তার জীবন ফিরিয়ে দেওয়া।

আর পোস্টমর্টেম রিপোর্টে পাকস্থলীতে সেই ওষুধের চিহ্ন আবিষ্কৃত হলেও সন্দেহের কিছু থাকতে পারে না। অজুহাত হিসাবে বলা যেতে পারে, নাকে শৌঁকাতে গিয়ে এক ফোঁটা তরল পদার্থ অসাবধানতাবশতঃ চলে গেছে, এতে দোষ কোথায় বলুন? সে তো আর ইচ্ছে করে

কিছুক্ষণ গভীর চিন্তার পর লম্বার্ড বললো, তাহলে এখন একটা ব্যাপারে আশ্বস্ত হওয়া গেলো।

কোন্ কোন্ ব্যাপারে?

এমন কতগুলো অপরাধ আছে, যা খালি চোখে ধরা যায় না। তবে একটু যদি তলিয়ে দেখা যায়। সত্য প্রকাশ পাবেই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রথমে রগার্স দম্পতি এবং পরে স্বনামধন্য বিচারপতি মিঃ ওয়ারথেন্ডের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে এ-প্রসঙ্গে।

আচমকা ধাক্কা খাওয়ার মতো করে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন আর্মস্ট্রং তাহলে এবার বলেই ফেলি মিঃ লম্বার্ড, তখন ওয়ারহেভ আমাদের যে গল্পটা বললেন, আপনি সেটা বিশ্বাস করেন?

ওঁর মতো ধড়িবাজ লোকের কথায় বিশ্বাস অবিশ্বাসের কোনো প্রশ্নই থাকতে পারে না। এই ধরুন না কেন, এডওয়ার্ড সিটনকে এমন কায়দা করে তিনি সরিয়েছেন, তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশই থাকতে পারে না। নিজের সাফাই গেয়ে তিনি তো বলেই দিয়েছেন, বিচারকের আসনে বসে আমি আইনের দাসত্বগিরি করেছি মাত্র, এর মধ্যে অন্যায় কিছুই থাকতে পারে না। বাঃ বাঃ চমৎকার অভ্যুত্থান, শেষ দিকে ব্যঙ্গের হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেলো লম্বার্ডের ঠোঁটে।

সিগারেট টান দিতে গিয়ে সেই মুহূর্তে আর্মস্ট্রং যেন সেই কোন্ সুদূর অতীতে তার হাসপাতালে চার দেওয়ালে ঘেরা অপারেশন টেবিলের সামনে গিয়ে হাজির হলেন। স্বগোতোক্তি করলেন, খুন। হা এ ভাবেই নিশ্চিত্তে, নির্বিঘ্নে অবশ্যই খুন করা যায় বৈকি। একটা কেন হাজারটা। খুন—

কিন্তু ডঃ আর্মস্ট্রং। লম্বার্ডের ডাকে সম্মিৎ ফিরে পেলেন আর্মস্ট্রং। এই নিগার দ্বীপে আমাদের সকলকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে কি থাকতে পারে মিঃ ওয়েনের?

সেটা তো আমার প্রশ্ন। আর্মস্ট্রং-এর মুখে চিন্তার ছাপ পড়ে, রগার্সের স্ত্রীর মৃত্যুটা আরো যেন ভাবিয়ে তুলেছে আমাদের। একটা ছন্দ বারবার ঘুরপাক খাচ্ছে মনের মধ্যে,

কিছুতেই তার সমাধান খুঁজে পাচ্ছি না। তবে কি তার স্বামী তাকে খুন করলো? নাকি শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করলো সে।

আত্মহত্যা? অসম্ভব! বিশেষ করে মাস্টার্নের মৃত্যুর পর মিসেস রগার্সের মৃত্যুটাকে কিছুতেই আত্মহত্যা বলে ধরে নেওয়া যায় না। মাত্র বারো ঘণ্টার মধ্যে দুদুটো আত্মহত্যা, ভাবা যায় না, একরোখা যুবক, জীবনে যে কাউকে ভয়ডর করলো না, সত্য-মিথ্যা জানা নেই, তার বিরুদ্ধে দুটো বাচ্চাকে হত্যা করার অভিযোগ আনা হয়েছে জেনে আত্মহত্যা করবে সে? না হিসেবে বড্ড বেশী গরমিল দেখা যাচ্ছে। তাছাড়া এখানে সে সায়ানাইটই পেলে কোথা থেকে। এ ত আর চকোলেট বিস্কুট নয় যে, পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াবে।

হ্যাঁ, এ প্রশ্নটা আমার মনেও জেগেছে বৈকি! এর একটা উত্তরই আমি খুঁজে পেয়েছি, হতে পারে।

হতে পারে কেউ তার মদের গ্লাসে সায়ানাইড মিশিয়ে দিয়ে থাকবে সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে, অতি সন্তর্পণে, আর এভাবেই অতি নিষ্ঠুরতার সঙ্গে তাকে খুন করে থাকবে সে। হ্যাঁ, হা, অবশ্যই খুনই হন মাস্টার্ন, নিষ্ঠুর খুন।

যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন আর্মস্ট্রং লম্বার্ডের যুক্তিগ্রাহ্য মতামত শুনে। তাই উৎসাহিত হয়ে তিনি এবার জানতে চাইলেন, আর মিসেস রগার্সের মৃত্যুটা?

অ্যাড দেন দেয়ার গুয়াজ নান । ঔগাখা ঙ্গিষ্ট। উপন্যাস

বলবো, সব বলবো, সিগারেটে ঘন ঘন কয়েকটা টান দিয়ে লম্বাড তার কথার জের টেনে বললো, মাস্টানের মৃত্যু আর রগার্সের মৃত্যুর মধ্যে কোথায় যেন একটা মিল আমি খুঁজে পেয়েছি। আপাত দৃষ্টিতে এ-দুটো মৃত্যুই নিছক আত্মহত্যা বলে প্রতিপন্ন হতে পারে। তবে এর পিছনে একটা রহস্য অবশ্যই লুকিয়ে আছে। আর সেই রহস্য।

.

০৮.

এই রহস্যের প্রসঙ্গে একটা ঘনটার কথা আমার মনে পড়ে গেলো। খানিক আগে রগার্স আমাকে ডেকে নিয়ে যায় তার রান্নাঘরে। আপনার বোধ হয় জানা নেই সেই দশটি চীনা মাটির পুতুল আর সেই বিত্তবানদের খেলায় কবিতার কথা? তারপর সেই দশটি পুতুলের কাহিনী সংক্ষেপে বললেন আর্মস্ট্রং।

সব শোনার পর লম্বাড তো থ। অবাক ভাবটা কাটিয়ে উঠতে সময় লাগলো লম্বাডের। কি আশ্চর্য! ছিলো দশটি কালো মানিক, এখন রইলো আট। এ যে দেখছি ভুতুড়ে কাণ্ডকারখানাকেও হার মানায়।

দশটি, কালো মানিক, দশটি কালো হীরে।

আর এক দফা চমকানোর পালা লম্বাডের। বড় অদ্ভুত ব্যাপার তত। কবিতাটির সঙ্গে ঘটনার কি অদ্ভুত মিল রয়েছে। মাস্টারের মৃত্যু হলো দম বন্ধ হয়ে। আর রগার্সের বৌ সেই যে রাতে ঘুমলো, সে ঘুম আর ভাঙলো না তার।

তাহলে?

তাহলে আবার কি! এর থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, আমরা এক বদ্ধ পাগলের শিকার হতে চলেছি। হয়তো আমাদের কারোর আর রেহাই নেই। এক এক করে আমাদের দশজনকেই সেই পাগলটার হাতে প্রাণ হারাতে হবে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, কি অদ্ভুত তার দূরদর্শিতা।

কিন্তু সেই পাগলটাই বা কোথায়? আমাদের এখনে আমন্ত্রণ করে নিয়ে এসে সে নিজেই তো গরহাজির। এই নির্জন দ্বীপে আমরা দশজন ছাড়া আর কেউ নেই, রগার্সও তাই বলেছে। তাহলে?

রগার্স আমাদের ভুল তথ্য পরিবেশন করেছে। কিংবা এও হতে পারে, ইচ্ছে করেই মিথ্যে বলে সে আমাদের ভুল পথে চালিত করতে চেয়েছে।

না মিথ্যে সে বলতে পারে না, তার হয়ে সাফাই গাইল আর্মস্ট্রং। দেখলে না, ভয়ে আতঙ্কে লোকটা একেবারে পঙ্গু হয়ে গেছে। মিথ্যে বলার মতো মনের দৃঢ়তা এখন তার নেই।

গভীর ভাবে চিন্তা করলো লম্বার্ড। তারপর জোরে জোরে মাথা নেড়ে বললো যে লোকটার কি রকম আক্কেল দেখুন, বেলা গড়িয়ে যেতে চললো, অথচ লারে কোনো পাত্তা নেই। এটা তো তার একটা চালাকি। তার পরিকল্পনা মাফিক এক এক করে আমাদের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত জীবিত অবস্থায় কাউকে এই দ্বীপ থেকে পালাতে দেবে না সে।

তার কথা শুনে আর্মস্ট্রং যে একেবারে বোবা বনে গেলেন। লম্বার্ডের মুখের দিকে বিস্ময় ভরা চোখে তাকিয়ে থেকে তার বক্তব্যটা উপলব্ধি করতে চাইলেন।

যাই হোক, সে নিজেকে যতো চতুরই ভাবুক না কেন, সে একটা মারাত্মক ভুল করে বসে আছে শুরুতেই। একটা ছোট দ্বীপে যে আমাদের আমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছে। আর দ্বীপটাও মোটামুটি ফাঁকা নির্জন। চলুন দ্বীপটা ঘুরে দেখে আসি। বাছাধন যেখানে থাকুন না কেন, এখানকার এই ছোট জায়গায় তাকে ঠিক আমরা খুঁজে বার করতে পারবো। চলুন যাওয়া যাক—

কিন্তু অমন একজন বিপজ্জনক লোকের সঙ্গে

আরে মশাই যতোই সে বিপজ্জনক লোক হোক না কেন, এতো ভয় পেলে কি চলে? তাছাড়া সে তো রক্তে মাংসে গড়া একজন লোক তো বটে! তার মতো একজন বিপজ্জনক লোকের সঙ্গে কি ভাবে মারাত্মক হয়ে উঠতে হয়, সে কৌশল আমার জানা আছে। তবে আমি আপনি ও মিঃ ব্লোর, এই তিনজন ছাড়া অন্য কাউকে জানাবার দরকার নেই। পরে প্রয়োজন হলে অন্যদের জানালেই চলবে।

পুতুল দুটি উধাও হওয়ার কাহিনী শুনে ব্লোর তো আকাশ থেকে পড়লেন যেন। তেমনি অবাক হয়ে তিনি বললেন, আমি তো ভেবেই পাচ্ছি না, সায়ানাইড মাস্টার্সের গ্লাসে মেশানো হল কি করে?

এ প্রশ্ন আমারো প্রত্যুত্তরে বললো লম্বার্ড, তবে এ ব্যাপারে আমার অনুমান এই রকম জানালার ওপর মদের গ্লাস নামিয়ে আমাদের সঙ্গে কথা বলার সময় মনে হয় বাইরের থেকে কেউ হাত বাড়িয়ে তার গ্লাসে সাইনাইড ফেলে দিয়ে থাকবে। আর মারাত্মক বিশ মেশানো সেই মদ পান করেই তার মৃত্যু ঘটে থাকবে।

বিশ্বাস করতে পারছেন না ব্লোর। তাই বা কি করে সম্ভব। আমাদের এতগুলো লোকের দৃষ্টি এড়িয়ে

তখন আমরা কি ঠিক মতো নজর রাখতে পারছিলাম? লম্বার্ড যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলো, আমরা তো তখন নিজেদের সমস্যা নিয়ে এমন ব্যস্ত ছিলাম যে, কোথায় কি ঘটেছে, তা দেখার অবসর কোথায় তখন আমাদের।

কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, তার কথায় সায় দিলেন ডঃ আর্মস্ট্রং সেই অদৃশ্য মানুষের কঠোর আদেশ শুনে আমরা তখন কেউ আর স্বাভাবিক অবস্থায় ছিলাম না। সেই অবস্থায়

যাই হোক, গতশ্চ-শোচনা নাস্তি। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন ব্লোর এখন আমাদের ভবিষ্যতে যা ঘটাবার সম্ভাবনা রয়েছে সেটা দমন করার জন্য আগে-ভাগে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার, যাতে কেউ আর সেই বদ্ধ পাগলটার শিকার না হতে পারে। আচ্ছা আপনাদের কারোর কাছে পিস্তল আছে?

হ্যাঁ আছে বৈকি। ট্রাউজারের হিপ পকেটের উঁচু হয়ে ফুলে থাকা অংশটার প্রতি ব্লোরের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো লম্বার্ড।

হাসলেন ব্লোর, ওটা কি আপনি সব সময় সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়ান?

হুঁ, তবে খুব একটা ঝামেলায় না পড়লে বের করি না।

ঝামেলা কি এখানে নেই? মৃদু হাসলেন ব্লোর আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়া গেছে। ওং পেতে কোথায় কোন্ পাথরের আড়ালে সে যে বসে আছে, আমরা কেউ জানি না। অথচ তার মাথার পোকাগুলো কিলবিল করে উঠলেই যে কোনো মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে আমাদের কারোর উপর। কোনো পাগল যদি একবার ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করে তাহলে আর রক্ষা নেই।

সব পাগলই ভয়ঙ্কর হয় না, দৃঢ়স্বরে বললেন আর্মস্ট্রং এমন কিছু কিছু পাগল আছে, যাদের দেখলে মনেই হয় না তারা পাগল বা উন্মাদ। তবু দেখা যাক, আসল পাগলকে ঠিক চিনে বের করা যায় কিনা।

তারা তিনজন তাদের অভিযান শুরু করলেন অতঃপর। ছোট দ্বীপ হাঁটতে হাঁটতে এক সময় পথ যায় ফুরিয়ে। তিনজনের দৃষ্টিই সতর্ক, ছোট খাটো পাহাড়ের চূড়া থেকে শুরু করে সমুদ্রের প্রান্ত সীমানা পর্যন্ত। কিন্তু তেমন সন্দেহজনক কিছুই চোখে পড়ল না তাদের। গুহা কিংবা ঝোপঝাড় কিছুই নেই, যেখানে সেই উন্মাদটা লুকিয়ে থাকতে

পারে। নিরাশ হয়ে অবশেষে তারা এসে নামলেন সমুদ্রের দক্ষিণ পূর্ব দিক বরাবর। মনে আছে, গতকাল লএও এসে থেমেছিল এখানেই। জেটির সামনে এসে থামকে দাঁড়ালেন তারা তিনজন। জেনারেল ম্যাকআর্থারকে অদূরে নিশ্চল স্ট্যাচুর মতো বসে থাকতে দেখে। দূর মহা দিগন্তে চলে গেছে তার দৃষ্টি। দূর থেকে তাকে দেখে মনে হলো, যেন এক ধ্যানমগ্ন যোগী। বেগতিক সমস্ত দুঃখ শোক ভুলে গিয়ে তিনি যেন এখানে এসে বসেছেন পরম শান্তির অবস্থায়।

সঙ্গী দুজনকে অপেক্ষা করতে বলে ব্লোর একা এগিয়ে গেলেন ম্যাকআর্থারের কাছে। তার পায়ের শব্দ হলে, কিন্তু তাতে এতটুকু বিচলিত হলেন না ম্যাকআর্থার। তেমনি নিশ্চল-হয়ে বসে রইলেন।

তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে ইচ্ছে করে কাশলেন ব্লোর, তাতেও তার কোনো ভাবান্তর না হওয়াতে তিনি এবার সরাসরি বলেই ফেললেন বাঃ খাসা একটা জায়গা বেছে নিয়েছেন তো আপনি।

তাতে কাজ হলো। ধীরে ধীরে ব্লোরের দিকে মুখ ফেরালেন ম্যাকআর্থার। সময় ক্রমেই কমে আসছে মিঃ ব্লোর। এ সময় আমি একটু একা থাকতে চাই, দয়া করে আপনি যদি

অপ্রস্তুত হলেন ব্লোর। কৈফিয়াত দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, আপনাকে বিরক্ত করে বিন্দুমাত্র অভিপ্রায় আমার নেই। বেড়াতে বেড়াতে এসে পড়েছি এখানে, তাই আর কি।

আপনাদের কারোরই বোঝার ক্ষমতা নেই? অনুযোগ করলেন ম্যাকআর্থার একা থাকতে আমার ভাল লাগে। নিঃসঙ্গতা আমার বড় প্রিয়।

এরপর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকার কোনো অর্থ হয় না। ফিরে চললেন ব্লোর তার সঙ্গীদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য। তারপর তারা তিনজন এগিয়ে চললেন সামনে পাহাড়ের দিকে। চলার পথে উষ্মা প্রকাশ করলেন ব্লোর, বিচিত্র স্বভাবের লোকটা, মানুষের সঙ্গে কি ভাবে কথা বলতে হয় তাও শেখেনি।

কেন কি আবার হলো? জিজ্ঞেস করলো লম্বার্ড।

দেখুন না লোকটা বলে কি, সময় নাকি খুব অল্প, আমাদের কারোর নাকি বোঝার ক্ষমতা নেই। তার ভাবখানা এই যে আমার উপস্থিতিতে বিরোক্তবোধ করছে সে, অতএব

দারুণ অসামাজিক লোক তো আনমনে বলে উঠলেন আর্মস্ট্রং সত্যিই ভদ্রতা জানে না লোকটা।

বুঝি সময় তাদেরও সংক্ষিপ্ত। লম্বা লম্বা পা ফেলে পাহাড়ের চূড়ার ওপর উঠে এলেন তারা।

দূরে, বহুদূরে সমুদ্রের ওধারে আবছায়ায় মতো সারি সারি পাহাড় ভেসে উঠলো। চোখের সামনে। আর সেই পাহাড়গুলোর আড়ালে রয়েছে বহু পরিচিত সেই গ্রাম, অতি প্রিয়

গ্রাম স্টিকলহাভেন। এলোমেলো বাতাস, জলের ঢেউগুলো উত্তাল হয়ে উঠেছে। অশান্ত সমুদ্র যে কোনো মুহূর্তে ঝড় উঠতে পারে লগু ভগু করে দিতে পারে নিগার আইল্যান্ড। যে উদ্দেশ্যে এখানে আসা সেই লোকের কোনো চিহ্ন দেখা গেল না।

ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো লম্বার্ডের। আচ্ছা ঝামেলায় পড়া গেলো তো। দূরের ঐ গ্রামের মানুষগুলোর চোখে এখানকার কোনো সংকেত ধরা পড়বে না, কি বিশ্রী কাণ্ড বলুন তো।

রাত্রে মশাল নেড়ে সংকেত পাঠালে ওরা নিশ্চয় দেখতে পাবে, অন্য দুই সঙ্গীর সমর্থন পাওয়ার আশায় কৌতূহলী চোখ নিয়ে তাকালো ব্লোর কি বলেন?

তাতেও কোনো ফল পাওয়া যাবে না, বোঝালো লম্বার্ড, মিঃ ওয়েন কি অতো বোকা ভেবেছেন? দেখুন গিয়ে আগে থেকেই গ্রামের লোকদের বুঝিয়ে রেখেছেন তিনি, আমরা মশাল জ্বেলে স্মৃতি করবো। ওরা যেন অন্য কিছু ভেবে সাড়া না দেয়।

এটা তো আপনার ধারণা মাত্র।

হতে পারে, তবে একেবারে অযৌক্তিক নয়। দেখুন গিয়ে গ্রামের লোকদের তিনি। শাসিয়ে রেখেছেন এক এক করে আমাদের সকলকে খতম না করা পর্যন্ত গ্রামের কেউ যদি দ্বীপের দিকে এগোয় তাহলে তার অবস্থাও ঠিক আমাদের মতো হবে।

হ্যাঁ সবই সম্ভব ঐ বন্ধ পাগলটার পক্ষে। হতাশ ভাবে তাকিয়ে বললেন আর্মস্ট্রং এখন কোনো কিছুতেই অবিশ্বাস করার মতো মনের জোর যেন হারিয়ে ফেলেছি আমি।

হঠাৎ লম্বার্ড প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে বলে উঠলো, একটা দড়ি পেলে কাজ হতো। দড়ি বেয়ে নীচে নেমে ওদিকটা দেখে আসতাম একবার। ওদিকটাই সেই বন্ধ পাগলটার লুকোবার একমাত্র জায়গা বলে আমার মনে হয়। তা আপনারা কেউ একটা দড়ির সন্ধান দিতে পারেন।

মতলটা বেশ ভালই। ছটফট করে উঠলেন ব্লোর, কি আশ্চর্য কাছে তো দড়ি টড়ি কিছু নেই, দেখি প্রাসাদে পাওয়া যায় কিনা। একটু দাঁড়ান, আমি যাবো আর আসবো। বলেই তিনি ছুটলেন প্রাসাদ অভিমুখে।

এই ফাঁকে আকাশের দিকে তাকালো লম্বার্ড। আকালো মেঘের ঘন ঘটা। বাতাসের তীব্রতা বাড়ছে। একটু পরেই ঝড় উঠতে পারে।

এবার সে তার দৃষ্টি নামিয়ে এনে ফেললো আর্মস্ট্রং এর মুখের ওপরে। কি মনে করে বললো সে, কি ব্যাপার আপনার মুখে কথা নেই যে। আবার কি ভাবছেন?

ভাবছি, ম্যাকআর্থারের কথা ভাবছি। লম্বার্ডের দিকে পলক-পতনহীন চোখে তাকিয়ে বললেন ডঃ আর্মস্ট্রং মনে হচ্ছে সত্যি সত্যি লোকটা উন্মাদ...বেলা যে যায় যায়..... রোদ্দুরের রঙ বদল হতে দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠলো ভেরা। মিস্ ব্লেন্টের সঙ্গে বড় একঘেয়ে

লাগছে এখন। সকালে তার সেই মনের দৃঢ় ভাবের কথা মনে পড়তেই তার প্রতি একটা বিরূপ মনোভাব গড়ে উঠলো। মুখের সেই কাঠিন্য, চোখের দৃষ্টিতে অকরণ তীক্ষ্ণতা এখন সবই বুজরুকি বলে মনে হচ্ছে। মুখে তিনি যতোই ঈশ্বরের নাম নিন না কেন। উনি নিজেই তো এক ঘোর পাপী। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তো মিথ্যে নয়। একটি গর্ভবতী নারীর জীবন নষ্ট করে দেওয়ার অর্থ হলো দু-দুটো জীবনের ইতি টেনে দেওয়া, এটা কি তার কম অন্যায় নয়, কম পাপ নয়। এই যে উনি এখন নির্বাক চিত্তে চেয়ারে শরীরটাকে এলিয়ে দিয়ে উল বুনছেন, দেখে মনে হয় যেন, তিনি একজন নিপাট ভালমানুষ। ভাল মানুষ না ছাই, ও সব ভে, স্রেফ ভেক্ ভগুমি ছাড়া আর কিছু নয়।

আর ঐ যে ওপাশে বিচারপতি ওয়ারথের স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে এই অবেলায় বসে বসে ঝিমুচ্ছেন, ঐ বৃদ্ধ লোকটাও কি কম শয়তান, কম পাপী। কল্পনা করে নেয় ভেরা, এডওয়ার্ড সিটন যেন ওয়ারথের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে আসামীর কাঠগড়ায়, ন্যায় বিচারের আশায়। জ্বলজ্বলে চোখ, দীর্ঘ সুঠাম চেহারা। বেচারা! বিচারের রায় বেরুনোর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত বুঝতে পারেনি যে ঐ শয়তান বিচারপতির জন্যই অসময়ে তাকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হবে।

মিস্ ব্লেন্ডের সঙ্গে এড়িয়ে একা একা হাঁটতে হাঁটতে এক সময় সে এসে পৌঁছালো সমুদ্রের ধারে। তার পায়ের শব্দ কানে যেতেই সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফেরালেন ম্যাকআর্থার। শান্ত সংযত চাহনি। ভেরা বিস্মিত, তার সেখানে উপস্থিতির কথা জানতেন নাকি ম্যাকআর্থার?

ভেরার অনুমান আন্দাজ করে নিয়ে ম্যাকআর্থার বলে উঠলেন, এসো ভেরা আমি তোমাকেই প্রত্যাশা করছিলাম এতোক্ষণ।

ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে তার পাশে বসে প্রশ্ন চোখে তাকালো তার দিকে, এমন নির্জন সমুদ্র প্রান্তে একা একা বসে থাকতে ভাল লাগে বুঝি আপনার?

হ্যাঁ, লাগে বৈকি। এখানে এক প্রত্যাশায় বসে থাকার একটা আলাদা আমেজ আছে যা অন্য কোথাও পাবে না তুমি।

প্রত্যাশা? কার! কিসের?

শেষের সেই দিনটির প্রত্যাশা। যেদিন পড়বে মোর পায়ে চিহ্ন এ সমুদ্রতটে-সেই সেই দিনটির প্রত্যাশা। জানো ভেরা আমরা যেদিন জন্মাই, ঠিক সেই দিন থেকেই শেষের দিনটির প্রত্যাশায় আমরা সবাই বসে থাকি। তুমি, আমি সবাই, কি ঠিক বলি নি?

কি যা তা বকছেন? শেষে আপনার মাথা কি খারাপ?

না ভেরা আমার মাথা ঠিকই আছে। আমি তোমাকে একটা নিষ্ঠুর সত্য কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি মাত্র। তুমি যতাই আশাবাদী হও না কেন, জেনে রেখো-এই দ্বীপ থেকে কোনোদিনও আমাদের মুক্তি হবে না। আমার বিলীন হয়ে যাবো একদিন, যাবো ফিরে সেই শান্তির নীড়ে।

শান্তি, কিসের শান্তি? একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় কোনো রকমে কান্নাটাকে দমন করে বললো ভেরা, আপনার কোনো কথারই অর্থ আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

তাহলে শোন ভেরা, লেসলী, হ্যাঁ আমার স্ত্রী লেসলীকে আমি সত্যি সত্যি খুবই ভালবাসতাম। ওকে আমার জীবন সঙ্গিনী হিসাবের পেয়ে আমার আনন্দের সীমা ছিলো না। ওকে আমার প্রাণের থেকেও বেশী ভাল লাগতো বলেই বোধহয় অতো বড় একটা ভুল করে বসলাম।

ভুল, কি রকম ভুল?

সব বলবো তোমাকে শুধু তোমাকেই আমার মনের কথা সব খুলে বলতে পারি। মৃত্যু আমার শিয়রে। তাই আজ আর কোনো কিছুই গোপন করবো না, সব বলবো তোমাকে। জানো ভেরা নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও রিচমণ্ডকে আমি ইচ্ছে করেই পাঠিয়েছিলাম যুদ্ধ ক্ষেত্রে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মৃত্যুর পথে ঠেলে দেওয়ার অর্থই হলো আমি নিজে খুন করেছি। ছুরির আঘাতে নয় পিস্তলের গুলিতে নয় স্রেফ হুকুম। তখন একবারটি আমার মনে হয়নি, এ অন্যায়, এ পাপ, এ পাপের শাস্তি আছে, আছে প্রতিশোধ নেওয়ার স্পৃহা কিন্তু আমার ভুল ভেঙে গেছে, আজ মনে হচ্ছে

কি মনে হচ্ছে?

মনে হচ্ছে যা করেছি, যা ভেবেছি সব মিথ্যে, তাসের ঘরের মতো ক্ষণস্থায়ী। আমার সব চালাকী ধরে ফেলে থাকবে লেসলী হয়তো। না বলে চলে গেলো যে আমার কাছ থেকে, জিজ্ঞেস করারও সুযোগ দিয়ে গেলো না সে। আমি এখন একা নিঃসঙ্গ, দিন আর কাটতে চায় না। কবে যে আসবে আমার সেই শেষের দিনটা

নীরবে সব শুনে গেলো ভেরা স্থির অবিচল থেকে। তাকে চুপ করে থাকতে দেখে ম্যাকআর্থার নিজেই আবার বললেন, তোমার তো ভাল লাগার কথা ভেরা, তুমি কেন কথা বলছো না? দেখবে, শেষের কদিন কতো সুখের, কতো আনন্দের, যার সঙ্গে আগের আগের কোনো দিনের সঙ্গে তুলনা হয় না।

হঠাৎ রেগে উঠে দাঁড়ালো ভেরা। তার চোখ দিয়ে আগুন ঝড়ে পড়লো, তীক্ষ্ণস্বরে বললো, তার মানে কি বলতে চাইছেন আপনি?

ম্যাক আর্থারের ঠোঁটে রহস্যময় হাসি, অনেক কিছুই, তোমার সম্পর্কে আমার অজানা তো কিছু নেই ভেরা।

সব বাজে কথা। আমার ব্যাপারে কিছুই জানেন না আপনি। না, কিসসু নয়।

সমুদ্রের দিকে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিলেন ম্যাক আর্থার যেন পরম নিশ্চিন্তে, আর কিছু বলার নেই তাঁর চোখে একটা ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে উঠতে দেখা গেলো। এক সময় নীরবে

চোখ বুজলেন তিনি, আর তখন তার মনে হলো, ঐ তো কে যেন পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে নিঃশব্দে চুপি চুপি। কে, কে ও? লেসলি?

চোখ না খুলেই একান্ত অন্তরঙ্গ সুরে ডাকলেন তিনি, লেসলি আমার প্রিয়তমা লেসলি তুমি এসেছো? আমি যে তোমার অপেক্ষায় প্রহর গুণে চলেছি

দড়ি হাতে ফিরে এসে দেখলেন ব্লোর, লস্কার নেই সেখানে, একা দাঁড়িয়ে আছেন আর্মস্ট্রং। মিঃ লস্কারকে দেখছি না, তিনি কোথায়?

জানি না তো, ঙ্গ কুঁচকে বললেন আর্মস্ট্রংদেখুন গিয়ে নতুন কোনো মতলব উতলব এসেছে আবার মাথায়। সেটা খতিয়ে দেখতে চলে গেলো বোধ হয়। এখানকার সব ব্যাপার আর সমস্ত লোকগুলোর রকম-সকম কেমন যেন অদ্ভুত ঠেকছে আমার কাছে। এ নিয়ে আমার দুশ্চিন্তা কম নয়।

দুশ্চিন্তা কি শুধু আপনার একার, আমাদের সকলেরই।

আমি তো অস্বীকার করছি না। আসলে আমি চিন্তিত ম্যাক আর্থারের ব্যাপারে।

কেন তাকে নিয়ে আপনার আবার দুশ্চিন্তা কিসের?

দুশ্চিন্তা কিসের জানতে চান? কি জানি কেন, আজ সকাল থেকে তাকে দেখে আমার মনে একটা সন্দেহের দানা বাঁধতে শুরু করেছে।

সন্দেহ?

হ্যাঁ, সন্দেহ বৈকি। তাহলে কথাটা বলেই ফেলি। আমার ধারণা ম্যাকআর্থারই সেই উন্মাদ, যাকে আমরা সবাই খুঁজে বেড়াচ্ছি।

আমি মানসিক রোগের চিকিৎসক নই, ডাঃ আর্মস্ট্রং মাথা নেড়ে বললেন, তবু বলবো এতো তাড়াতাড়ি এমন একটা নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে, এখনই আসা ঠিক হবে না।

তা অবশ্য ঠিক। আর আমিও তাকে ঠিক খুঁনি বলে ঠাওর করছি না। ঐ রকম ধরনের আর কি।

বিচিত্র কিছু নয়। হয়তো দেখা যাবে আমাদের চোখের আড়ালে লুকিয়ে থেকে কলকাটি নাড়ছে। এই সময় লম্বার্ডকে ফিরে আসতে দেখে আর্মস্ট্রং প্রসঙ্গ বদল করে বলে উঠলেন ঐ তো মিঃ লম্বার্ড এসে গেছেন।

একটা বড় পাথরের টুকরোর সঙ্গে দড়িটা শক্ত করে বেঁধে দড়িটা নিচে ঝুলিয়ে দিয়ে সেটা দুহাতে ধরে নিচে ঝুলে পড়লো লম্বার্ড। এবং অচিরেই গিয়ে হাজির হলো নিচে।

তা দেখে ব্লোর আর থাকতে না পেরে মন্তব্য করলেন, লোকটা খুব একটা সুবিধের নয়।
চালচলন যেন কেমন।

একটু বেরোয়া গোছের। ভয় ডর নেই, এই তো?

ভয় তো আমার এখানেই। বেরোয়া ভাব দেখিয়ে এ পর্যন্ত কত খারাপ কাজই না করেছে। তার হিসেব কেউ আপনারা জানেন না বলে তো আমার মনে হয় না। ক্লোরের চোখে মুখে একটা ঘৃণার ভাব ফুটে উঠতে দেখা গেলো। একটু থেমে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা ডঃ আর্মস্ট্রং, আপনি কি সঙ্গে পিস্তল, জাতীয় কোনো আগ্নেয়াস্ত্র রাখেন?

না তো, অবাক চোখে তাকালেন আর্মস্ট্রং তা পিস্তল আমি এখানে আনতে যাবো কিসের আশঙ্কায়?

তা তো নিশ্চয়ই। তা তো নিশ্চয়ই। আমিও তো তাই মনে করি। বললেন ব্লোর কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার দেখুন, মিঃ লস্কার্ড একটা পিস্তল ঠিক সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন।

হয়তো সেটা তার অভ্যাসও তো হতে পারে।

সেটা তার অভ্যাসের দোহাই দিচ্ছেন? বিশেষ কোনো গুপ্তগোলের জায়গায় পিস্তল কেন বন্দুক সঙ্গে নিয়ে আসুন না কেন আপনি, তাতে সন্দেহ করার কিছু থাকবে না। কিন্তু

এখানে এই নির্জন দ্বীপে পিস্তলের কি প্রয়োজন হতে পারে, আমি তো কিছুই ভেবে পাচ্ছি না।

কেমন যেন সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে আর্মস্ট্রং এর, মুখে তার কোনো উত্তর যোগালো না।

বেশ কিছুক্ষণ পরে নিচ থেকে উপরে উঠে এলো লম্বার্ড দড়ি বেয়ে। তার মুখে হতাশার ছাপ। কোনো লাভই হলো না শুধু যাওয়া আসাই সার হলো। কেউ নেই নিচে। একান্তই যদি থেকে থাকে সে, তাহলে আমার ধারণা ঐ প্রাসাদের ভেতরে কোথাও লুকিয়ে আছে নিশ্চয়ই।

প্রাসাদের ভেতরে চিরুণী-তল্লাসী চালানো হলো। কিন্তু লুকিয়ে থাকার মতো গোপন ফাঁক ফোকর চোখে পড়ল না। একতলায় তল্লাসী চালিয়ে তারা তিনজন দোতলায় উঠতে গিয়ে দেখলো, পানীয়ের ট্রে হাতে নিয়ে প্রাসাদের উদ্যানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে রগার্স। তাকে ঐ ভাবে দেখে মুখ বিকৃত করে বলে উঠলো লম্বার্ড, লোকটা মানুষ নাকি জানোয়ার। বউটা সবে মারা গেলো অথচ তার কোনো দুঃখ বোধ নেই? কেমন সহজ ভঙ্গিমায় কাজ করে চলেছে একের পর এক।

পেটের তাগিদে মশাই, স্নেফ পেটের তাগিদে। কাজের বিনিময়ে টাকা পাচ্ছে সে, আমাদের দেখা শোনা করার জন্যই তাকে এখানে চাকরী দিয়ে ডেকে আনা হয়েছে।

তাহাড়া স্ত্রী বিয়োগের শোকে অভিভূত হয়ে কাজে টিলে দিলে আপনরাই কি তাকে রেহাই দিতেন? বলে হাসলেন আর্মস্ট্রং।

দোতলায় ঘরগুলোতে উঁকি মেরেও কোনো হৃদিশ পাওয়া গেলো না সেই বন্ধ পাগলটার। এরপর তিনজন এসে দাঁড়ালেন সিঁড়ির মুখে।

তিনতলায় ওঠার একটা ঘোরানো লোহার সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ ব্লোর বলে উঠলো, ঐ সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গিয়ে দেখা যাক ওটাই বাকি থাকে কেন।

থাক কোনো লাভ হবে না, বাধা দিয়ে বললেন আর্মস্ট্রং ওখানে রগার্সের ঘর। গিয়ে দেখা যাবে তার স্ত্রীর মৃতদেহ শায়িত রয়েছে সেখানে। যেখানে কোনো বন্ধ পাগলও থাকতে পারে না।

অতঃপর তারা তিনজন সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে গেলেন। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে আর্মস্ট্রং এর একটা হাত চেপে ধরে ফিসফিসিয়ে বলে উঠলেন ব্লোর, শুনতে পাচ্ছেন, ওদিকে কার পায়ের শব্দ?

তিনজনেই কান পেতে শুনলেন, মৃদু পদসঙ্গারে কে যেন হেঁটে বেড়াচ্ছে ওপরের ঘরে। তিনজনই স্তব্ধ, হতবাক। বিস্ময়ের ঘোরটা কোনো রকমে কাটিয়ে উঠে আর্মস্ট্রং প্রথমে মুখ খুললেন রগার্সের ঘরে কে যেন চলে ফিরে বেড়াচ্ছে? চলুন দেখা যাক কে-কে হতে পারে সে।

নিঃশব্দে পা ফেলে তিনজন ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এসে দরজায় কান পাততেই শব্দটা যেন এবার আগের চেয়ে আরো একটু স্পষ্ট হলো। মনে হলো চোরের মতো কে যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে কিছু।

অধৈর্য হয়ে দরজায় লাথি মারলো ব্লোর, দরজা খুলে যেতেই প্রায় এক সঙ্গে তিনজনে ঢুকে পড়লেন ঘরের ভেতরে। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খাওয়ার মতো থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন তাঁরা।

ঘরের মধ্যে তখন আর কেউ নয়, স্বয়ং রগার্স, আচমকা দরজায় ধাক্কা পড়তে দেখে সেও থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল পরবর্তী ঘটনাটা দেখার অপেক্ষায়। হাতে তার একরাশ পোষাক

সরাসরি রগার্সের দিকে তাকাতে লজ্জা পাচ্ছিলেন ব্লোর। মাথা নিচু করে কোনো রকমে আমতা আমতা করে বললেন, নিচ থেকে শুনতে পেলাম ওপরে কে যেন অতি সন্তপণে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাই সন্দেহ নিরসন করতে ছুটে এলাম ওপরে।

ছিঃ ছিঃ কি লজ্জার কথা বলুন তো, অতি বিনয়ের সঙ্গে বললো রগার্স, দোষ তো আমারই স্যার, এখানে আমার আগে আপনাদের অনুমতি নিয়ে আসা উচিত ছিলো আমার। নিচে অতিথিদের ঘরগুলো তো ফাঁকাই পড়ে রয়েছে। ভাবলাম মৃতদেহ আগলে পড়ে থেকে কি লাভ, তাই আমার জিনিষপত্র নিয়ে উঠে এলাম।

সে তো বেশ ভাল কথাই রগার্স। এবার মুখর হলেন আর্মস্ট্রং এখন থেকে আমরা তোমাকে আমাদের কাছে কাছেই পাবো।

তেমনি মাথা নিচু করে অভিবাদন জানালো রগার্স। তারপর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো নিঃশব্দে।

সঙ্গী দুজনের দিকে ফিরলেন আর্মস্ট্রং এর পর আর কি জানার থাকতে পারে? ঘুরে ফিরে সবই তো দেখা হলো। চলুন এবার নিচে যাওয়া যাক।

ঘরের মধ্যে আর একটা ঘর। দরজার কাছে ছুটে গিয়ে শিকল ধরে টানাটানি করতে লাগলেন ব্লোর। দুচারবার টানাটানি করতেই শিকল খুলে গেলো। ঘরের ভেতরটা অন্ধকারে ডুবেছিল। আবছায়া অন্ধকারে তিনজন দেখলেন, সেখানে কারো অস্তিত্ব নেই, আছে শুধু ঘর ভর্তি কালি ঝুলি আর মাকড়সার জাল। তারা তিনজন কিছুক্ষণ পরে ঘর থেকে যখন বেরিয়ে এলেন, তখন চেনাই যায় না তাদের, কালি ঝুলি মেখে একাকার।

মাকড়সার জাল হাত দিয়ে সরাতে সরাতে বললো লম্বার্ড, দেখা গেলো এই দ্বীপে আমরা জীবিত আটজন অতিথি ছাড়া অন্য আর কারোর অস্তিত্ব নেই এখানে।

০৯.

ভুল, আমরা তাহলে শুরু থেকে ভুল করেই এসেছি। মন্তব্য করলেন ব্লোর। দুটো মৃত্যুকে কেন্দ্র করে আমরা বড় বেশী ভয় পেয়ে গেছি।

ভয় পাওয়া আশ্চর্যের কিছু নয়, চিন্তিত ভাবে বললেন আর্মস্ট্রং, এ্যান্টনি মাস্টানের মৃত্যু আমি কিছুতেই আত্মহত্যা বলে মেনে নিতে পারছি না।

কেন, এটা তো একটা অঘটনও হতে পারে।

অঘটন? সরাসরি প্রশ্ন চোখে তার দিকে তাকালো লম্বার্ড।

বলছিলাম কি, আর্মস্ট্রং এর দিকে আড়চোখে একবার তাকিয়ে বললেন, ব্লোর এই ধরুন ডঃ আর্মস্ট্রং-এর ঘুমের ওষুধ দেওয়ার ব্যাপারটা

সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়ালেন লম্বার্ড আপনার একথা বলার অর্থ কি জানতে পারি?

ওষুধের নামটা আমরা জানতে পারি।

ট্রায়োনস্ট। এ ওষুধে রোগীর শরীরে কোনো ক্ষতি করে না।

কিন্তু ভুল করে আপনি যদি ডোজটা একটু বেশী দিয়ে ফেলে থাকেন। হা, ভুলের কথা বলছি। মানুষ মাত্রই তো ভুল করে থাকে। তাই যদি আপনিও

না, না, জোরে মাথা নেড়ে প্রতিবাদের ভঙ্গিতে বললেন আর্মস্ট্রং, ভুল আমি করি নি, ইচ্ছে করেও নয়।

আরে কি আরম্ভ করলেন আপনারা? ধমক দিয়ে উঠলো লম্বার্ড, সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে নিজেদের মধ্যে তর্ক শুরু করে দিলেন।

না, আমি তর্ক করতে চাই না, ব্লোর কৈফিয়তের সুরে বলেন, ভুল সব মানুষেরই হয়ে থাকে।

সাধারণ মানুষের কথা আমি জানি না, সামান্য একটু হেসে বললেন আর্মস্ট্রং তবে ডাক্তারদের ভুল করার এজিয়ার আছে।

হ্যাঁ তা তো থাকবেই। বিদ্রূপ করে বললেন ব্লোর, সেই না দেখা অভিযোগকারীর কথা ঠিক বলে ধরে নিলে মনে হয়, এ রকম ভুল আপনি বোধ হয় আগেও করেছেন অনেকবার।

মুহূর্তে আর্মস্ট্রং এর মুখটা সাদা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। মনে হলো, কেউ বুঝি ব্লটিং পেপার দিয়ে তার মুখের রক্ত শুষে নিয়েছে। তাঁর সেই দূরবস্থা দেখে মুখ টিপে হাসতে থাকেন ব্লোর।

সহ্য করতে পারেন না লম্বার্ড। ব্লোরের উদ্দেশ্যে তীক্ষ্ণ ঝাঁঝালো সুরে বললেন তিনি, আপনি মশাই আচ্ছা লোক তো। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করতে লজ্জা করে না আপনার? গলাবাজি করে ওঁর নামে যা তা বলে গেলেন, কিন্তু আপনিও কমতি কিসের শুনি?

আপনি চুপ করুন। ধমকে উঠলেন ব্লোর আগ বাড়িয়ে আমার ব্যাপারে নাক গলাতে আসবেন না। আমিও আপনার অনেক দোষ ত্রুটির কথা জানি।

কি কি জানেন আমার ব্যাপারে আপনি? উত্তেজিত হয়ে বললেন লম্বার্ড।

রামো, রামো, আপনার হাব-ভাব দেখে ভেবেছিলাম, আপনি বুদ্ধিমান। কিন্তু আপনার কথা শুনে এখন মনে হচ্ছে আপনার মতো নির্বোধ আর কেউ নেই, এখানে, অন্তত এখন এই দ্বীপে।

আমাকে বোকা প্রতিপন্ন করে আপনার আসল উদ্দেশ্যের কথাটা কিন্তু চেপে রাখতে পারবেন না মিঃ লম্বার্ড। শেষের সুরে প্রশ্ন করলেন, ব্লোর বলুন কেন আপনি পিস্তল সঙ্গে এনেছেন? আপনার উদ্দেশ্যের কথা আপনি গোপন রেখেছেন এই তো?

হ্যাঁ ঠিক তাই। গোপন রাখার কারণ একটা অবশ্যই আছে।

কারণটা কি বলবেন?

শুনবেন? তাহলে বলি শুনুন, মিঃ ওয়েনের আমন্ত্রণ, পেয়ে আমি এখানে আসি নি। আসলে আমি এসেছি একজন ইহুদীর নির্দেশে, নাম তার আইজ্যাক মরিস। তার অনুমান এখানে নাকি বিপদের সম্ভাবনা থাকতে পারে। তারই উপদেশ মতো সঙ্গে একটা পিস্তল আনতে বাধ্য হয়েছি আমি বুঝলেন?

ওসব কথা কাল বলেন নি কেন?

আচ্ছা মুশকিলে পড়া গেলো তো। বিরক্ত হয়ে বললেন লম্বার্ড, আপনাদের সঙ্গে প্রথম আলাপের সময় আমিই কি জানতাম, একটার পর একটা অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা ঘটে যাবে।

বেশ তো, বলার কথাটা এখনিই বা আপনার মনে হলো কেন?

এখন বুঝে গেছি, আমাদের বাঁচার আর কোনো পথ নেই। মিঃ ওয়েনের পাঠানো একশো গিনির লোভে পড়ে এই সর্বনাশা জালে জড়িয়ে পড়েছি। এই জাল ছিঁড়ে পালাবার কোনো উপায় নেই দেখে শেষ পর্যন্ত সব খুলে বললাম। একটু থেমে কি ভেবে যে আবার বলতে শুরু করলো, মাস্টার্ন ও রগার্সের স্ত্রীর আকস্মিক মৃত্যু দশটি পুতুলের মধ্যে দুটি উধাও হয়ে যাওয়া, এ সবার অর্থ আপনারা বুঝতে পারছেন কিনা জানি না,

আমি কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারছি, আমরা সবাই এক কঠিন জালে জড়িয়ে পড়েছি। আর যে লোকটা আমাদের ধরার জন্য কৌশলে এই জালটা বিছিয়ে রেখেছে, তার হাত থেকে রেহাই আমরা পেতে পারি না কখনো।

ওদিকে মধ্যাহ্ন ভোজের ঘন্টা পড়লো ঢং, ঢং ঢং.....

খাবার টেবিলে তিনজনে বসতেই নিচু গলায় বললো রগার্স খাবারের বিশেষ আয়োজন করতে পারিনি। বুঝতেই পারছেন, ঘরে যা ছিলো তাই দিয়েই আপনাদের আহারের ব্যবস্থা করেছি কোনো রকমে।

জিনিসে ভর্তি ভাড়ার, ভাববেন না, টিনের খাবারও আছে প্রচুর। তারপর স্বগোতোক্তি করলো রগার্স এখনো নারীকটের কোনো পাত্তাই নেই। কেন যে সে এলো না, সেই জানে আর জানেন ঈশ্বর।

এমিলি ঘরে ঢুকে টেবিলের সামনে বসে বিড় বিড় করে আপন মনে বললেন, বাতাস ঝড়ের পূর্বাভাস, সমুদ্রের অশান্ত ঢেউগুলো যেন আক্রোশে ফুঁসছে।

তারপর ঘরে ঢুকলেন ওয়ারথ্রেভ। ধীর পায়ে এগিয়ে এসে টেবিলের সামনে একটা চেয়ার দখল করে ঝাপসা চোখে উপস্থিত সকলের দিকে একবার তাকিয়ে দেখে নিয়ে চোখ নামিয়ে নিলেন।

ব্যস্ত সমস্ত ভাবে ঘরে এসে ঢুকলো ভেরা। অনেক দেৱী করে ফেললাম। আপনারা, নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছেন।

তার কথার জবাব না দিয়ে পাণ্টা প্রশ্ন করলেন এমিলি, আচ্ছা, জেনারেল ম্যাকআর্থার এখনো এলেন না কেন বলুন তো?

উনি তো এখন বসে আছেন অনেক দূরে, সেই সমুদ্র তীরে। ওখান থেকে খাবার ঘণ্টা তিনি হয়তো শুনতেই পান নি। তাছাড়া আজ সকাল থেকেই ওঁকে কেমন যেন অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল, কথাবার্তায় অসংলগ্নতা—

তাহলে, ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হলেন রগার্স, আমি যাই ওঁকে ডেকে নিয়ে আসি। তাকে বাধা দেন আর্মস্ট্রং। না, আমই যাচ্ছি রগার্স, তুমি বরং এদিকটা সামলাও ততক্ষণে। এই বলে হন্তদন্ত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

বাইরে তখন ঝড়ের তাণ্ডবলীলা চলছিল, বাতাসে তীক্ষ্ণতা, সমুদ্রের ঢেউগুলো প্রচণ্ড ক্রোধে আছড়ে পড়ছিল বালির ওপর। খাবার টেবিলের সামনে পাঁচটি প্রাণীর অধীর প্রতীক্ষা, কারোর মুখে কথা নেই, সবার চোখে একটা বোবা চাহনি, তারই মাঝে অজস্র প্রশ্ন, কি কি হতে পারে ম্যাকআর্থারের? কেন তিনি এখনো আসছেন না।

ভেরাই প্রথমে নীরবতা ভঙ্গ করলো, ঝড় আসছে...।

আশ্চর্য। ট্রেনের সেই অদ্ভুত লোকটাও তো এই কথা বলেছিল, মৃদু হেসে বললেন ব্লোর, ঝড় আসছে-বুঝতে পারি না আগে থেকেই লোকগুলো কি করে যে টের পেয়ে যায়।

খাবার ভর্তি ট্রে হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকে কয়েক পা এগিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো রগার্স, দরজার দিকে ফিরে তাকিয়ে চমকে ওঠার মতো করে বলে ওঠলো সে, ঐ তো, কে যেন দৌড়ে আসছে বলে মনে হচ্ছে।

রগার্সের অনুমানই ঠিক, সবাই কান পেতে শুনলো বাইরে প্রাসাদের উদ্যানে দ্রুত পায়ের শব্দ, ঠিক যেন দৌড়ে কেউ

ব্যস্ত হয়ে সবাই উঠে দাঁড়ালেন। সবার ভয় আর বিস্ময় ভরা চোখের দৃষ্টি পড়ে রইলো দরজা প্রান্তে।

ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঘরে ঢুকলেন আর্মস্ট্রং। অনেকটা পথ ছুটে আসার জন্য হাঁপাচ্ছিলেন তিনি। উদভ্রান্ত দৃষ্টি তার চোখে, ভয়ে আড়ষ্ট তার মুখখানি।

কি হয়েছে ডাক্তার? পাঁচজনেই প্রায় একই সঙ্গে প্রশ্ন করে বসলেন।

জেনারেল ম্যাকআর্থার-কথাটা শেষ করতে পারলেন না আর্মস্ট্রং ভয়ে আতঙ্কে ঠোঁট কাঁপছে তার।

তবে, তবে কি তিনি মারা গেলেন শেষ পর্যন্ত? আচমকাই যেন সেই কঠিন শব্দটা মুখ ফসকে বেরিয়ে এলো ভেরার।

হ্যাঁ, ঠিক তাই। মাথা নিচু করে চোখ বুজলেন আর্মস্ট্রং।

আর তখনি এক অখণ্ড নীরবতা থমথম করতে থাকলো ঘরটা। এ ওর দিকে তাকালো নীরবে কারোর মুখ থেকে একটি কথাও বেরলো না।

ঝড়ে দ্বীপটা বুঝি উড়ে যাবে। তবু সেই ঝড় মাথায় করে ছুটতে হলো সমুদ্রের ধারে। কিছুক্ষণ পরেই ম্যাকআর্থারের মৃতদেহটি বয়ে নিয়ে এলেন ব্লোর আর আর্মস্ট্রং। সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠতে লাগলেন ওরা। হলঘরের সামনে সারিবদ্ধ ভাবে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিলেন বাকি পাঁচজন।

আর ঠিক তখনি প্রচণ্ড জোড়ে ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নামলো বৃষ্টি। বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটাগুলো তীব্র বাতাসের দাপটে তীরের মতো এসে বিধতে থাকলো জানলার শার্সিগুলোতে।

তারই মাঝে প্রায় সবার চোখে ফাঁকি দিয়ে এক সময় খাবার ঘরে এসে ঢুকলো ভেরা, নিঃশব্দে। শূন্য ঘর চেয়ার গুলো সব ফাঁকা টেবিলের ওপর খাবারের প্লেটগুলো সাজানো অভুক্ত। জানালার শার্সিতে বৃষ্টির ফোঁটার চটপট শব্দ। আর সেই শব্দটাকে ছাপিয়ে হঠাৎ

দরজা বন্ধ করার শব্দ শুনে চকিতে দরজার দিকে ফিরে তাকালো ভেরা, তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো রগার্সের অবয়ব।

কৈফিয়ত দিতে গিয়ে ভয় বিজড়িত কণ্ঠে বললো ভেরা, আ-আমি রাখতে এসেছিলাম-

জানি, আপনি কি দেখতে এসেছিলেন, রগার্স যেন তার মুখের কথাটা এক রকম লুফে নিয়ে বললো হা ঐ তো রাখুন না, একটা পুতুল কেমন কমে গেছে। আটটার পরিবর্তে এখন, বলবো। মাথার পিছনে ভারী জাতীয় কোনো কিছু আঘাতে মারা গেছেন ম্যাকআর্থার।

একটা চাপা গুঞ্জন উঠলো কোন কিছুর মধ্যে। ওয়ারথ্রেভের পরবর্তী প্রশ্ন সেই ভারী জাতীয় জিনিষটা খুঁজে পেয়েছেন?

না।

তাহলে আপনার প্রমাণ

ধারণা তো নয়, আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত, কোনো প্রমাণের প্রয়োজন নেই।

এবার একটু নড়ে চড়ে বসলেন ওয়ারথ্রেভ, যেমন করে বিচারক বসেন তার চেয়ারে। সারাটা সকাল কাটিয়েছেন অলস ভঙ্গিতে, এখন তার আলসেমি চলে না। ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখতে হয়।

উপস্থিত সকলের মুখের ওপর দৃষ্টি ফেলার পর এক সময় তাঁর দৃষ্টি স্থির হলো লম্বার্ডের মুখের ওপর, আপনারা হয়তো বুঝতে পারেন নি, আমি কিন্তু সকালে উদ্যানে একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে আপনাদের সকলের গতিবিধি লক্ষ্য করেছি। আমার অনুমান যদি মিথ্যে না হয়, তাহলে বলি, সেই অজ্ঞাত আততায়ীটিকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন আপনি। বলুন আমি ঠিক বলেছি কি না?

মাথা নেড়ে সাই দেয় লম্বার্ড, হ্যাঁ আপনার অনুমান যথার্থ।

আর আপনাদের এও সন্দেহ যে, মাস্টার্ন কিংবা রগার্সের স্ত্রী কখনোই আত্মহত্যা করতে পারে না। সকলের অলক্ষ্যে মিঃ ওয়েনেই তাদের কণ্ঠ রুদ্ধ করে দিয়েছে চিরদিনের মত।

হ্যাঁ, এ ব্যাপারে আমি একমত, এবার উত্তর দিলেন ব্লোর, আর আমারে এও ধারণা মিঃ ওয়েন একজন বদ্ধ উন্মাদ ছাড়া আর কিছু নয়।

অবশ্যই সে, তাকে সমর্থন করলেন ওয়ারথ্রেভ তবে তার উন্নত্তার বিশ্লেষণের প্রয়োজন এখন নেই। এখন সব থেকে জরুরী প্রয়োজন হলো সময় থাকতে থাকতে তার হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করা।

কিন্তু এই দ্বীপে আমরা ছাড়া আর তো কেউ নেই এখন। ভয়ে ভয়ে বললেন আর্মস্ট্রং, তাহলে আগের তিনজকে কি করে হত্যা করলো সে, আর আমরাই বা কি ভাবে তার হাতে খুন হতে পারি?

এ প্রশ্নের উত্তরও আমি মোটামুটি একটা ভেবে রেখেছি।

ম্লান হেসে বলতে থাকেন ওয়ারথ্রেভ, সকালবেলা এই যে আপনারা আততায়ীর সন্ধানে বেরোলেন যদি একবার ঘৃণাক্ষরেও আমাকে বলতেন তাহলে বোধহয় আপনাদের পরিশ্রম লাঘব হতে পারতো। তবে এ সবার পরেও আমি বলছি এই দ্বীপেই আছেন মিঃ ওয়েন। শুনলেন না, আমাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে এমন সব অভিযোগ সে খুঁজে বের করেছে, তার মতে আইনের মার প্যাঁচে আমরা নাকি কৌশলে শাস্তি এড়িয়ে গেছি। তাই বোধহয় সে নিজেই শাস্তির ভার তুলে নিয়েছেন। হ্যাঁ তার হাতে থেকে কেউই তাদের অপরাধের শাস্তি এড়াতে পারবে না আর শাস্তি দানের একটা অভিনব পন্থাও তিনি খুঁজে নিয়েছেন। আমাদের দলে মিশে গিয়ে এক এক করে সে তার কাজ হাসিল করে চলেছে। আর তাই আমরা তার অস্তিত্ব অনুভব করতে পারছি না।

না, না এ অবাস্তব ধারণা, কখনোই তা সম্ভবপর নয়। প্রতিবাদ করে উঠলো ভেরা।

অবাস্তব। অসম্ভব। এখন আমাদের সামনে এ সব কথার কোনো অস্তিত্ব নেই মিস ক্লেথন। ভেরার দিকে ফিরে বললেন ওয়ারথ্রেভ এখন সব কিছুই সম্ভব। আমাদের এই বিপদের সময় এ নিয়ে অযথা তর্কে যাওয়া উচিত নয়। আমি আবার বলছি, আমাদের দশজনের মধ্যেই একজন মিঃ ওয়েন অন্য পরিচয়ের আড়ালে লুকিয়ে থাকা সেই আততায়ী। অবশ্য আমরা এখন আর দশজন নই মোট সাতজনে ঠেকেছি। তাই মাস্টার্ন, মিসেস রগার্স ও জেনারেল ম্যাকআর্থারকে অনায়াসেই বাদ দেওয়া যায়? একটু সময় থেকে সকলের মুখের দিকে চকিতে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে তিনি এবার জিজ্ঞেস করলেন, এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে আপনারা একমত তো?

দ্বিধাবোধটা কাটিয়ে উঠতে যা একটু সময় লাগলো, হুঁ। তবে ভাবতে অবাক লাগে।

এর মধ্যে অবাক হওয়ার কি আছে ডঃ আর্মস্ট্রং দৃঢ়স্বরে বললেন ব্লোর, আমি তো একটা আন্দাজ

আপনার বক্তব্য পরে শুনবো মিঃ ব্লোর হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন ওয়ারথ্রেভ, আগে এক এক করে সকলের অভিমত জেনে নিই, আমার বক্তব্যে তাদের সায় আছে কিনা, তারপর আপনারা

আপনার বক্তব্য আমার পুরোপুরি সায় আছে, উলের ওপর থেকে চোখ তুলে বললেন এমিলি, আপনার বক্তব্য যথেষ্ট যুক্তি আছে। আর এর থেকে বোঝা যাচ্ছে, আমাদের মধ্যেই একজন খুনী বদ্ধ পাগল।

না আমি একমত হতে পারছি না, প্রতিবাদ করলো ভেরা আমার বিশ্বাস নেই।

আর মিঃ লম্বার্ড আপনার কি অভিমত? তার দিকে ফিরলেন ওয়ারথ্রেভ।

আপনার বক্তব্য আমার পূর্ণ সমর্থন আছে।

বাঃ আমি তো এই চাইছিলাম। তৃপ্ত হয়ে বললেন ওয়ারথ্রেভ এবার প্রকৃত অপরাধীকে প্রমাণ স্বরূপ চিহ্নিত করার পালা। এখন আপনারা খুব চিন্তা ভাবনা করে বলুন তো আমাদের মধ্যে কোনো বিশেষ ব্যক্তির এমন কোনো দোষ ত্রুটি কিংবা তার সন্দেহজনক চাল-চলন দেখেছেন কি, যাতে করে অপরাধী বলে মনে হয়। হা মিঃ ব্লোর আপনি এখন আপনার কি একটা আন্দাজের কথা বলবেন বলেছিলেন না।

আন্দাজ বলতে পারেন, আবার নিছক একটা কৌতূহলও বলতে পারেন। আমি জানতে চাই, মিঃ লম্বার্ড সঙ্গে পিস্তল কেন এনেছেন?

কারণটা তো আমি আপনাকে আগেই বলেছি, বিশ্বাস হয় নি? ঠিক আছে আবার বলছি রুম্ফস্বরে, পিস্তল সঙ্গে আনার ঘটনাটা সংক্ষেপে বললো লম্বার্ড।

প্রমাণ দেখান, শুধু বানানো গল্প ফেঁদে বসলেই চলবে না, ভ্রু কুঁচকে কৈফিয়ত চাইলেন ব্লোর প্রমাণ চাই।

প্রমাণ চাইছেন? তাদের কথার মাঝে বাধা দিয়ে ওয়ারগ্রেভ বললেন, কেবল মিঃ লম্বার্ড একাই যে প্রমাণ দিতে ব্যর্থ হবেন তা নয়, অনেক ব্যাপারে আমরাও প্রমাণ দিতে অসমর্থ হতে পারি। অতএব আমাদের মুখের কথাটাই বিশ্বাস করে নিলে বুদ্ধিমানের কাজ হবে। এখানে একটু থেমে ওয়ারগ্রেভ কি যেন ভেবে আবার বলতে শুরু করলেন, এক কাজ করা যাক, কারোর সন্দেহজনক কার্যকলাপের সন্ধান না করে বরং দেখা যাক, কাকে কাকে আমাদের সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যায়। সাতজনের মধ্যে দুজনকে বাদ দেওয়ার পর শেষ ব্যক্তি যিনি অবশিষ্ট থাকবেন, তিনিই হবেন অপরাধী তাকেই সেই অজ্ঞাত আততায়ী বলে আমরা ধরে নেবো।

এ ব্যাপারে প্রথমেই আমি একটা কথা বলতে চাই, নিজের সাফাই চাইলেন আর্মস্ট্রং। আমি একজন স্বনামধন্য চিকিৎসক। তাই আপনারা নিশ্চয় আমাকে সন্দেহের তালিকা থেকে—

তাকে বাধা দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন ওয়ারগ্রেভ, দেখুন ডঃ আর্মস্ট্রং আপনি যদি ঐ দোহাই দেন, তাহলে আমিও বলবো, আমিও কিছু কম স্বনামধন্য নই। তবু তা সত্ত্বেও আপনার মতো আমাকে আপনাদের সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার অনুরোধ একবারও করবো না। চিকিৎসক বিচারপতি এমন কি পুলিশও পাগল হতে পারে।

পাগলামি হচ্ছে একটা জঘন্য রোগ। এ রোগে কখন কে যে আক্রান্ত হতে পারে, আগে থেকে কেউ বলতে পারে না।

তাহলে শুরুতেই, একটা কাজ আমরা নিশ্চয়ই করতে পারি লস্কার্ড পরামর্শ দেয়, মহিলা দুজনকে আগে থেকেই আমাদের সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দিয়ে রাখতে পারি, কি বলেন আপনারা?

তার মানে আপনি বলছেন, মেয়েদের কখনো পাগলামি রোগ হয় না, কিংবা তারা খুন করতে পারে না?

না, জোর দিয়ে সেরকম কথা তো আমি বলিনি, একটু ইতস্ততঃ করে লস্কার্ড বলে তবে আপাত দৃষ্টিতে দেখে মনে হয়—

আর্মস্ট্রং-এর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ওয়ারথোভ জিজ্ঞেস করলেন, আপনিই বলুন, ম্যাক আর্থারের মৃত্যু ঘটেছে মাথায় তীব্র আঘাতে, সে আঘাত কোনো মহিলার পক্ষে করা সম্ভব না অসম্ভব?

অসম্ভব নয়। মাথা দোলালেন আর্মস্ট্রং।

তাতে শক্তি প্রয়োগের দরকার হয় কি?

না, একেবারই নয়।

ধন্যবাদ, ওয়ারথ্রেভ আরো বলেন, আগের দুজনের মৃত্যু ঘটেছে বিষ বা ঘুমের পিল খেয়ে, এটা প্রয়োগ করতে একটুও শারীরিক শক্তির প্রয়োজন হয় না।

লম্বার্ডের মুখে আর কথা যোগালো না।

ওদিকে অল্প আক্রোশে চিৎকার করে উঠলো ভেরা, দেখছি আপনার মাথাটাই একেবারে খারাপ হয়ে গেছে। সত্যি সত্যি, আপনিই উন্মাদ। অপ্রকৃতিস্থ।

ভেরার দিকে তাকালেন বরফ ঠাণ্ডা চোখে। কোন রাগ নয়, অভিনয় নয়, তার সেই অদ্ভুত চাহনির সামনে পড়লে অতি কঠিন প্রকৃতির লোকের শরীরও বুঝি অবশ হয়ে যেতে বাধ্য। এবং হোও তাই, চমকে উঠল ভেরা, উঃ লোকটা কি সাংঘাতিক। এমন ভাবে তাকিয়ে আছে যেন আমাকে গিলে ফেলবে। শুরু থেকেই দেখছি, আমাকে ও একেবারে পছন্দ করে না।

নির্বিকার চিন্তে বললেন ওয়ারথ্রেভ, আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না মিস্ ক্লেথন। আমি আপনার ওপর আদৌ দোষ চাপাতে চাইনি। কথা প্রসঙ্গে বলতে হলো বললাম তাই। তারপর এমিলির দিকে ফিরে তাকেও বোঝাতে চাইলেন তিনি মাফ করবেন মিস্ ব্লেন্ট, আপনার বিরুদ্ধেও কোনো অভিযোগ আমি আনতে চাইনি। আসলে কি জানেন, সন্দেহের তালিকা থেকে আমরা যে কেউই বাদ নই, সেটাই আমি বোঝাতে চাইছি।

ওঁর কথায় বিন্দুমাত্র সূক্ষ্মপ করলেন না এমিলি, এমন কি চোখ তুলে তাকালেনও না পর্যন্ত, উলের কাঁটায় একটার পর একটা ঘর তুলতে থাকলেন তিনি। অনেকক্ষণ পরে আপন মনে ফিসফিসিয়ে বললেন, আপনার কথাটা অত্যন্ত খাঁটি সত্য। আমরা সকলেই সকলের কাছে একেবারে অপরিচিত, তাই এ ওর বিরুদ্ধে সন্দেহ হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবে নিজের সমর্থনে বলতে পারি, আমার ব্যাপারে আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারেন। যে আমি একটা নগণ্য জীবও হত্যা করিনি, সেই আমি তিন তিনটি মানব জীবন নষ্ট করবো। এটা কি ভাবা যায়? হ্যাঁ আমি বারবার বলবো, আমাদেরই একজন মনুষ্যত্ব হারিয়ে শয়তান বনে গেছে। এখানকার সব অন্যায় ঘটনার মূলে সে।

উত্তম কথা, কোনো সমস্যাই আর রইলো না তাহলে। আমরা সবাই সন্দেহভাজন ব্যক্তির এক একজন।

কিন্তু রগার্স? প্রশ্ন করলো লম্বার্ড? তাকে আমরা

আমরা কি? জানতে চাইলেন ওয়ারথ্রেভ, চুপ করে রইলেন কেন, বলুন।

তাকে আমাদের সন্দেহের তালিকা থেকে অনায়াসেই বাদ দেওয়া যায়, যায় না?

না যায় না, আর কোন্ যুক্তিতেই বা বাদ দেবো বলুন।

প্রথমতঃ আমাদের মতো অতো চলাক চতুর নয় সে। দ্বিতীয়তঃ এক্ষেত্রে তার স্ত্রীও শিকার হয়েছে।

ক্রু কুঁচকে উঠলো ওয়ারগ্রেভের। আমার দীর্ঘ বিচারকের জীবনে এরকম ভুরি ভুরি ঘটনা ঘটে আমি দেখেছি! যেখানে স্ত্রী হত্যার দায়ে আপাত দৃষ্টিতে মুখ-সুখ সরল গোবেচারা স্বামীটি অভিযুক্ত। শুধু তাই নয়, বিচারের প্রতিটি ক্ষেত্রেই স্বামীর দোষ প্রমাণিত হতে দেখা গেছে।

আপনার অভিজ্ঞতার কথা আমি উড়িয়ে দিচ্ছি না। আর হয়তো এও সত্য যে, সেই অদৃশ্য কণ্ঠস্বরের অভিযোগ মাফিক অতীতের অপরাধের ঘটনা প্রকাশ হয়ে যাওয়ার ভয়ে রগার্স তার স্ত্রীকে হত্যা করে থাকবে। কিন্তু তার স্বপক্ষে আমার একটা কথা বলার আছে রগার্স বদ্ধ উন্মাদ নয়। অতএব বাকী দুটি হত্যার জন্য কি করেই বা আমরা তাকে দায়ী করতে পারি বলুন?

মিঃ লম্বার্ড, আপনি তার স্বপক্ষে যে যুক্তি দেখালেন তার পাঁচটা যুক্তি অনেক এসে যেতে পারে, তাতে প্রকৃত অপরাধীকে চিহ্নিত করা মুশকিল হয়ে পড়বে। তাই ধরা যাক, রগার্স ও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে সেই অজ্ঞাত অভিযোগকারীর অভিযোগ মিথ্যা। তারা সত্যিই মিস এ্যান্ডিকে খুন করেনি। আর তাই যদি হয়, তাহলে অভিযোগ শুনে জ্ঞানই বা হারালো কেন মিসেস রগার্স? আগে থেকেই স্ত্রী অদ্ভুত অদ্ভুত আচরণের ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ছিলো সে। সেই অজ্ঞাত কণ্ঠস্বর শুনে জ্ঞান হারানোটা একটা নিছক কাকতালীয় ব্যাপার, অন্য কিছু নয়।

ঠিক আছে, অগত্যা স্বীকার করে নিলাম আমাদেরই কেউ একজন মিঃ ওয়েন। যুক্তি খুঁজে না পেয়ে অবশেষে মানতে বাধ্য হলেন লম্বার্ড, আর এও মেনে নিচ্ছি, আততায়ী পুরুষ, কিংবা মহিলাও হতে পারে।

অর্থাৎ আমাদের সকলের চোখে আমরা সকলেই অপরাধী। এখানে নারী-পুরুষ, সম্মান প্রতিপত্তির ধুয়ো তুলে কাউকেই আমাদের সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দিতে পারি না। প্রকৃত ঘটনার চুলচেরা বিশ্লেষণ করে সত্যকে উদঘাটন করার চেষ্টা করবো। প্রয়োজন বোধে আমরা এক বা একাধিক ব্যক্তিকে বাদ দিতে পারি। আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে জানার চেষ্টা করবো, আমাদের মধ্যে কে, কে মাস্টানের পানীয়ের মধ্যে সায়ানাইড প্রয়োগ করেন নি, রগার্সের স্ত্রীকে অধিক মাত্রায় ঘুমের ওষুধ খাওয়ান নি, কিংবা জেনারেল ম্যাকআর্থারের মাথায় পিছন থেকে আতর্কিত আঘাত করেন নি।

তাকে সমর্থন করলেন ব্লোর। হ্যাঁ, ঠিক এই ভাবেই আমরা প্রকৃত অপরাধীকে খুঁজে বার করতে পারবো। তবে মাস্টানের ব্যাপারটা নিয়ে আপাততঃ আলোচনার না করলেও চলবে। কারণ আমরা ধরেই নিচ্ছি যে, জানালায় বাইরে থেকে আমাদের মধ্যে কেউ একজন অলক্ষ্যে তার পানীয়ের মধ্যে সায়ানাইড মিশিয়ে দিয়ে থাকবে। রগার্স সেই সময় ঘরে ছিলো কিনা ঠিক খেয়াল করতে পারছি না। তবে সে ছাড়া বাকী আটজনের মধ্যে যে কোনো একজন এ কাজ করতে পারে। কিছু সময় নীরব থেকে একটা সিগারেট ধরিয়ে তিনি আবার বলতে শুরু করলেন, এবার মিসেস রগার্সের কথায় আসা যাক। তাকে ওপরের ঘরে ধরাধরি করে নিয়ে যান ডঃ আর্মস্ট্রং, ও তার স্বামী রগার্স।

এই দুজনের মধ্যে যে কোনো একজন এক ফাঁকে তাকে অধিক মাত্রায় ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দিতে পারে।

কথাটা শোনা মাত্র চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন আর্মস্ট্রং, থরথর করে কাঁপছিল তার সারা শরীর। শূন্যে ঘুষি উঁচিয়ে হুঙ্কার ছাড়লেন তিনি, এ অন্যায়, এ ষড়যন্ত্র। এ সব আমি কিছুতেই বরদাস্ত করবো না। আমি আবার বলছি, রগার্সের স্ত্রীকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি পিলও বেশী খাওয়াইনি আমি।

আঃ থামবেন ডঃ আর্মস্ট্রং। বিরক্তিতে ফেটে পড়লেন ওয়ারথ্রেভ, জানি, নিজের বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনতে আপনার ভাল লাগবে না। কিন্তু তা বললে তো চলবে না। এখন তোত আপনাকে অনেক অপ্রিয় সব প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে, এ কথা তো আপনার আগেই জানা উচিত ছিলো। এক্ষেত্রে কেবল আপনার ও রগার্সের পক্ষেই মাত্রাতিরিক্ত ঘুমের ওষুধ খাইয়ে মিসেস রগার্সের ঘুম আর না ভাঙানো সহজ, যা অন্য কারোর পক্ষে সম্ভব নয়। তবে একেবারে যে অসম্ভব নয়, তাও আমি বলবো না, আরো বিশদ ভাবে আলোচনা করলে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন হতে পারে। আপনারা দুজন ছাড়া অবশিষ্ট থাকেন মিঃ লম্বার্ড ইন্সপেক্টর ব্লোর, মিস্ ভেরা ক্লেথন, মিস্ এমিলি আর আমি। এখন দেখতে হবে মিসেস রগার্সের হত্যার ব্যাপারে এই পাঁচজনের সকলকেই কি আমাদের সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া সম্ভব? না, আমার সিদ্ধান্ত হলো, তা কখনোই সম্ভব নয়।

তীর প্রতিবাদ করে উঠলো ভেরা, কিন্তু আমার কথা আলাদা কেননা সেই সময় মিসেস রগার্সের ধারে কাছে আমি ছিলাম না। এ কথা আপনাদের কোরই অজানা থাকার কথা নয়।

শান্ত ভাবে চোখ তুলে তাকালেন ওয়ারথ্রেভ, আপনার কথা আমি অস্বীকার করছি না। ভুল আমারো হতে পারে, তবে ভুল শুধরে দেওয়ার ভার আপনাদের ওপর। সেই সময় আমরা ঠিক কে কোথায় ছিলাম বুঝিয়ে বলা যাক এখন-আপনাদের মনে আছে নিশ্চয়ই অসুস্থ মিসেস রগার্সকে নিয়ে আমরা আটজন কেউ না কেউ একটা না একটা কাজে ব্যস্ত থাকলেও মিস্ ব্লেন্ট কিন্তু উঠলেন না তার চেয়ার থেকে, তার পরবর্তী গতিবিধির ওপরে নজর রাখার মতো মানসিক অবস্থা তখন আমাদের কারোরই ছিলো না।

সঙ্গে সঙ্গে ফুঁসে উঠলেন এমিলি যততো সব আজগুবি চিন্তা ভাবনা।

তার কথায় ভ্রক্ষেপ করলেন না ওয়ারথ্রেভ, তিনি তার কথার জোর টেনে বলে চললেন, মিস ব্লেন্ট, মনে আছে আপনি এখন সংজ্ঞাহীন মিসেস রগার্সের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়েছিলেন। কি, ঠিক বলছি তো?

কেন মনুষ্য, প্রকাশ করাটা কি কোনো অপরাধ?

আমার প্রশ্ন তা নয়, উত্তরে বললেন ওয়ারথ্রেভ, যা যা ঘটেছিল সেই সময়, তারই একটা চিত্র আমি তুলে ধরার চেষ্টা করছি, দোষগুণের বিচার আপনাদের ওপর। হ্যাঁ যা

বলছিলাম, তারপর রগার্স ঘরে ঢোকে ব্রান্ডির গ্লাস হাতে নিয়ে। এমনো তো হতে পারে ঘরে ঢোকার আগেই ব্রান্ডির গ্লাসে অতিরিক্ত ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে এনেছিল সে। রোগিনীকে সেই ব্রান্ডি খাওয়ানো হলো। একটু পরে ডঃ আর্মস্ট্রং ও রগার্স ধরাধরি করে তাকে নিয়ে উঠলেন ওপরতলায়। রগার্সের ঘর থেকে চলে আসার আগে ডাক্তার তাকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে এলেন।

হ্যাঁ, সেই সময়কার ছবছ ঘটনার সঠিক চিত্রই আপনি তুলে ধরেছেন, তার কথা সমর্থন করে মৃদু হেসে বললেন ব্লোর, তাহলে, দেখা যাচ্ছে, এক্ষেত্রে আপনি, আমি, মিঃ লস্কার্ড ও মিস্ ক্লেথনকে অনায়াসেই আমাদের সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যায়।

দেওয়া যায় নাকি? প্রশ্ন চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন ওয়ারথ্রেভ।

কেন, এর মধ্যে আবার কিন্তু কি থাকতে পারে?

হ্যাঁ, থাকতে পারে বৈকি। নিজের কথা সমর্থন করে মৃদু হাসলেন ওয়ারথ্রেভ। সেই সময়কার দৃশ্যটার কথা একবার ভেবে দেখার চেষ্টা করুন তো মিঃ ব্লোর। হ্যাঁ, আমিই আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, মিসেস রগার্স শুয়ে আছেন বিছানায়। ভিতর থেকে ঘরের দরজা বন্ধ। ডঃ আর্মস্ট্রং এর দেওয়া ঘুমের ওষুধের প্রতিক্রিয়া তখন শুরু হয়ে গেছে। চেতন অবচেতনের মাঝামাঝি অবস্থায় রয়েছে সে তখন। আর ঠিক সেই সময় দরজায় মৃদু করাঘাতের শব্দ। টলতে টলতে কোনো রকমে দরজা খুলে দিলো সে। আগন্তুক ঘরে ঢুকলেন না, হাতটা ভেতরে সামান্য একটু বাড়িয়ে মৃদুস্বরে বললেন, এই ট্যাবলেটটা

খেয়ে নিন ডঃ আর্মস্ট্রং পাঠিয়েছেন। মিসেস রগার্স ট্যাবলেটটা হাতে নিয়ে আগন্তকের সামনেই সেটা গিলে ফেললেন। কি, এতটুকু বাড়িয়ে বলছি না তো?

ব্লোর মুখে কথা নেই।

তবে মুখ খুললো লম্বাড, হ্যাঁ, একটু বাড়ানো হলো বৈকি। সম্ভব অসম্ভব বলে তো একটা কথা আছে। রগার্স তখন ঘরে, দরজায় শব্দ হলো অথচ সে জানতে পারলো না?

জানবেই বা কি করে? কৈফিয়ত দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন আর্মস্ট্রং, সে তো তখন নিচে ঘর দোর সাফ করতে ব্যস্ত, ছিলো। সেই ফাঁকে সে কেউ তার কাজ হাসিল করে অনায়াসে ফিরে আসতে পারে, কাক পক্ষীও টের পাবে না।

তাছাড়া তাদের কথার মাঝে মন্তব্য করলেন এমিলি, ডঃ আর্মস্ট্রং এর দেওয়া ওষুধে মিসেস রগার্সের অবস্থা তখন দারুণ কাহিল। সে অবস্থায় ভাল মন্দ বিচার করবে কি করে বলুন?

দেখুন মিস্ ব্লেন্ট, সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠলেন আর্মস্ট্রং, কাউকে দোষী সাব্যস্ত করতে হলে অনেক কিছু জানতে হয়। আর আমাদের ডাক্তারী শাস্ত্রটাই বিচিত্র ধরনের। আপনার অভিযোগ ঠিক নয় এই কারণে যে, ঘুমের ওষুধ খেলেই রোগী যে কাহিল হয়ে পড়বে তা নয়। ওষুধের প্রতিক্রিয়া শুরু হতে যথেষ্ট সময় লাগে, চটজলদি বোঝা যায় না।

ডাক্তারী শাস্ত্র দেখাচ্ছেন? আড়চোখে একবার আর্মস্ট্রং-এর দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললো লম্বার্ড, তা আপনাদের শাস্ত্রে বুঝি এসব কথাও আজকাল লেখা থাকে?

ডঃ আর্মস্ট্রং যেন ভূত দেখার মতো চমকে উঠলেন, কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন তিনি, কিন্তু তার মুখের কথা মুখেই রয়ে গেলো। হাতের ইশারায় থামতে বললেন ওয়ারথ্রেভ,

অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগ। এসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোই সার হবে। কেবল, কাজের কাজ কখনোই হবে না। তবে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতেই হবে। কিন্তু এ পর্যন্ত যেটুকু জেনেছি, তাতে কোনো সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না। মিসেস রগার্স একজন মহিলা তার শয্যাপার্শ্বে স্বাভাবিক নিয়মে মিস্ ব্লেন্ট ও মিস্ ক্লেথনের থাকার কথা। ওঁরা না থেকে যদি আমি মিঃ ব্লোর কিংবা লম্বার্ড থাকতেন, তাহলে অবাক হওয়ার পরিবেশ গড়ে উঠতো তখনি। বলুন, ঠিক কিনা?

বিস্মিত ব্লোর অবাক চোখে তাকালেন, কি রকম? সে কি রকম।

গালে হাত রেগে চিন্তামগ্ন যোগীর মতো বললেন ওয়ারথ্রেভ তাহলে দেখা যাচ্ছে, দ্বিতীয় মৃত্যুকে কেন্দ্র করে আমরা সকলেই সন্দেহের আওতা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত নই। এবার জেনারেল ম্যাকআর্থারের মৃত্যু নিয়ে আলোচনা করা যাক। ঘটনাটা আজই সকালের, টাটকা ও নৃশংস হত্যাকাণ্ড। এখন আপনারা কোনো কিছু গোপন না করে স্পষ্ট করে বলুন, আজ সকালে কার কি অ্যালিবাই ছিলো। প্রথমেই আমি নিজের কথা

বলছি, আমার অ্যালিবাই তেমন জোরালো কিছু নয়। সারাটা সকাল আমি প্রাসাদের উদ্যানে বসে কাটিয়েছি, আপনারা যারা প্রাসাদে ছিলেন, তারা নিশ্চয়ই তা লক্ষ্য করেছেন। আর মাঝে মধ্যে আপনারা যখন কেউই আমার চোখের সামনে ছিলেন না, তখন কিছু সময়ের জন্য আমি একেবারে একলা হয়ে যাই। তাহলে এর থেকে ধরে নেওয়া যেতে পারে, সেই একাকী থাকাকালীন সময়ে সমুদ্রের ধারে হেঁটে গিয়ে জেনারেল ম্যাকআর্থারকে খুন করে আবার প্রাসাদে ফিরে আসা সম্ভব কিছু নয়। এখন আপনারাই আমার ব্যাপারটা বিশদভাবে ভেবে দেখুন। আমাদের সন্দেহের তালিকা থেকে আমাকে কখনোই বাদ দেবেন না, যতক্ষণ না একেবারে সন্দেহমুক্ত হচ্ছেন, বুঝলেন?

আর আমার বিষয়টা অন্যমনস্ক ভাবেই বললো ব্লোর ডঃ আর্মস্ট্রং ও মিঃ লম্বার্ডকে জিজ্ঞেস করুন ওঁরা বাতলে দেবেন, কেন না সারাটা সকাল আমার কেটেছে ওঁদের দুজনের সঙ্গে।

তার মুখের কথাটা যেন লুফে নিলেন আর্মস্ট্রং আপনি কিন্তু একবার প্রাসাদে গিয়েছিলেন দড়ি আনতে।

হ্যাঁ, গিয়েছিলাম বৈকি, অস্বীকার করবো না। প্রাসাদে গিয়েছি, দড়ি নিয়ে আবার ফিরে এসেছি আপনারা কাকে।

কিন্তু যতখানি সময় লাগার দরকার তার থেকে একটু বেশী সময়ই নিয়েছিলেন আপনি? বলে হাসলেন ডঃ আর্মস্ট্রং।

বাঃ দড়িটা খুঁজে বার করতে একটু সময় লাগতেই তো পারে ।

আর্মস্ট্রং কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন হাতের ইশারায় তাকে থামিয়ে দিয়ে ওয়ারগ্রেভ বললেন মিঃ ব্লোরের অনুপস্থিত থাকাকালীন সময়ে আপনি ও মিঃ লম্বার্ড, এক সঙ্গেই ছিলেন, নাকি.... ।

হ্যাঁ নিশ্চয়ই । জোর দিয়ে বললেন আর্মস্ট্রং তবে কিছু সময়ের জন্য আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন মিঃ লম্বার্ড । অবশ্য আমি তখন আমার জায়গা ছেড়ে এক চুলও নড়িনি ।

লম্বার্ডের দিকে মুখ ফেরালেন ওয়ারগ্রেভ । উদ্দেশ্য তার অ্যালিবাইট জেনে নেওয়া ।

সেটা বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো লম্বার্ড, আমি গিয়েছিলাম ছোট্ট একটা পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতে । দেখতে গিয়েছিলাম, এখন থেকে সূর্যের আলো প্রতিফলিত করে হিলিওগ্রাফ পদ্ধতিতে ওপারে স্টিকলহ্যাভেনে কোনো খবর টবর পাঠানো যায় কিনা । তার জন্য অবশ্য বেশীক্ষণ সময় নিইনি, মাত্র মিনিট দুয়েক হবে । তারপরেই আবার ফিরে যাই ডঃ আর্মস্ট্রং-এর কাছে ।

মাথা নেড়ে সাই দিলেন আর্মস্ট্রং । হুঁ, অতি অল্প সময়ের জন্য উনি আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন । আমার ধারণা, এতো অল্প সময়ে তাঁর পক্ষে ম্যাকআর্থারকে খুন করে আবার ফিরে আসা অসম্ভব ।

তা আপনার ঘড়ি দেখেছিলেন কি? হেসে হেসেই প্রশ্নটা করলেন ওয়ারথ্রেভ।

মুখটা শুকিয়ে গেলো আর্মস্ট্রং-এর না তো।

আমার হাতে ঘড়িই ছিলো না, দেখবো কি করে? ব্যাপরাটা হাক্কা ভেবে নিলো লম্বার্ড।

জেনে রাখুন, দু, এক মিনিট বললে, সঠিক সময়টা বলা হয় না। তাপর এমিলির দিকে মুখ ফেরালেন ওয়ারথ্রেভ মিস ব্লেন্ট, এবার আপনার বলার পালা।

ভেরা আর আমি পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে উঠেছিলাম। উত্তরে এমিলি বলেন, তারপর ফিরে এসে প্রাসাদের উদ্যানে বসে উল বুনতে শুরু করি।

আমি তো সেখানেই বসেছিলাম একটা আরাম কেদারায় বললেন ওয়ারথ্রেভ, বুঝি বা একটু অবাক হয়ে কই আপনাকে তো দেখতে পাইনি সেখানে।

না দেখার কথা। ঝড়ে হাওয়ার হাত থেকে বাঁচার জন্য পূর্ব দিকের দেওয়াল ঘেঁষে আমি বসেছিলাম।

দুপুরে খাবার ঘণ্টা পড়া পর্যন্ত ছিলেন সেখানে?

আর মিস্ ক্লেথন, আপনি, আপনি কোথায় ছিলেন?

সকালে আমি আর মিস্ ব্লেন্ট পাহাড়ে উঠেছিলাম। সেখান থেকে ফিরে আমি একা একা যাই সমুদ্রের ধারে। সেখানে মিঃ ম্যাকআর্থারের সঙ্গে কিছু সময় কাটাই গল্প-গুজবে।

কখন। জিজ্ঞেস করলেন ব্লোর, তার সঙ্গে আমাদের দেখা হওয়ার আগে না পরে?

ঠিক বলতে পারবো না। তবে তখন তাকে যেন একটু অস্বাভাবিকই লাগছিল। কেঁপে উঠলো ভেরার গলার স্বর।

অস্বাভাবিক। অস্বাভাবিক বলতে কি রকম? একটু ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলেন ওয়ারগ্রেভ।

তার কথাবার্তাগুলো কেমন যেন বললেন, আমাদের বাঁচার আয়ু নাকি ফুরিয়ে আসছে, আমরা কেউ নাকি এখান থেকে জীবিত অবস্থায় আর ফিরে যেতে পারবো না। আরো বললেন তিনি নাকি শেষ দেখার অপেক্ষায় বসে আছেন। তাঁর অমন সব অস্বাভাবিক কথা শুনে আমি ভীষণ ভয় পেলাম, পড়ি মড়ি করে ছুটে পালিয়ে এলাম তার কাছ থেকে।

তাই বুঝি। তারপর?

প্রাসাদে ফিরে এলাম। খাবার ঘন্টা পড়ার আগে আর এক চক্কর বাইরে ঘুরতে বেরোই। আর খাবার ঘন্টা শুনেই আবার ফিরে আসি প্রাসাদে। মিঃ ম্যাকআর্থারের বিষাদে ভরা কথা শুনে আমার মনটা কেমন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এই অভিশপ্ত দ্বীপ থেকে সত্যি, সত্যি যদি আর না ফিরি—

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বললেন ওয়ারথ্রেভ, এখন তাহলে বাকী রইলো এখানকার শেষ ব্যক্তিটি রগার্স। কিন্তু তার কাছ থেকে খুব বেশী কিছু জানা যাবে বলে তো আমার মনে হয় না।

ওয়ারথ্রেভের অনুমাণই ঠিক। রগার্স যা বললো, সংক্ষেপে এই রকম; প্রাসাদে রান্নাবান্না এবং টুকিটাকি অন্য আরো কাজে এতোই ব্যস্ত ছিলো যে প্রাসাদ ছেড়ে বাইরে কোথাও যাওয়ার একটুও ফুরসত পায়নি। খাবার ঘন্টা বাজিয়ে অপেক্ষা করেছে সে খাবার ঘরে। তারপরের ঘটনা তো সকলের সামনেই ঘটেছে। তবে একটা ব্যাপারে ভয়ঙ্কর বিস্মিত সে। তার নাকি স্পষ্ট মনে আছে সকালে খাবার ঘরের আলমারিতে আটটি পুতুল থাকতে দেখে। কিন্তু ঘন্টা খানেক পরে ফিরে গিয়ে সে দেখে, সেখানে রয়েছে মোট সাতটি পুতুল, অর্থাৎ একটি উধাও।

রগার্স তার বক্তব্য শেষ করা মাত্র ঘরের মধ্যে নেমে এলো এক অদ্ভুত নীরবতা। কারোর মুখে কথা নেই। কথা নেই ওয়ারথ্রেভের মুখেও, নিচু হয়ে আধ বোজা চোখে তিনি তখন ভেবে চলেছেন আকাশ পাতাল।

কেবল দেওয়াল ঘড়িতে তখন শব্দ হচ্ছিল টিক্ টিক্ টিক.....বিচার তো শেষ। এখন উনি কি রায় দেন উনিই জানেন, আর জানেন ঈশ্বর।

তার কথার রেশ মেলাতে না মেলাতেই শুরু করলেন ওয়ারগ্রেভ তাঁর রায় দান করার পালা। মাথাটা ঝুঁকে পড়লো তার মাথার কাছে। শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠস্বর তার-তিন তিনটি মৃত্যুর ঘটনাই আমরা বিশদ ভাবে বিশ্লেষণ করে দেখলাম। আপাত দৃষ্টিতে একেকটা মৃত্যুর ব্যাপারে কোনো বিশেষ ব্যক্তির ওপর আমাদের সকলের সন্দেহ ঘনীভূত হলেও আসলে আমরা কেউ পুরোপুরি সন্দেহ মুক্ত নই। অবশ্যই একটা ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই, আসল খুনী আমাদের উপস্থিত সাতজনের মধ্যেই একজন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কে কে সেই খুনী? তাকে চিহ্নিত করার মতো প্রয়োজনীয় তথ্য প্রমাণ আমাদের পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি আমাদের আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও। এই রকম এক অদ্ভুত পরিস্থিতিতে আমার একটাই উপদেশ প্রত্যেককেই সতর্ক হয়ে থাকতে হবে, এখন থেকে আমাদের দায়িত্ব আমাদের নিজেদের হাতেই তুলে নিতে হবে, এ ছাড়া বাঁচার আর কোনো রাস্তা নেই।

আমি আপনাদের আর একবার সাবধান করে দিচ্ছি আমাদের আততায়ী ভয়ঙ্কর এক উন্মাদ। কখন যে সে কাকে আক্রমণ করে বসবে, আগে থেকে তা অনুমান করা কঠিন। তাই আবার বলছি, সতর্কতার সঙ্গে, বিচক্ষণতার সঙ্গে সেই অজ্ঞাত খুনীর মোকাবিলা করুন। একটু থেমে ওয়ারগ্রেভ আবার বলতে থাকেন, শুনুন, আমার আরো বলার আছে আমরা যখন কেউই সন্দেহ মুক্ত নই, তখন আমাদের এক মাত্র কাজ হবে সবাই সবাইকে সন্দেহের চোখে দেখা। অর্থাৎ কেউ কাউকে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করবেন না।

শ্রাদ্ধ দেন দেয়ার গুয়াজ নান । শ্রাদ্ধাখ্যা ক্রিষ্টি উপন্যাস

থামলেন তিনি অতঃপর। তার শেষ কথাগুলো ঘরের মধ্যে গমগম করতে থাকলো। কাজীর বিচার যেন আজকের মতো এখানেই শেষ। বিচার মূলতুবী রইলো ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর কি দাঁড়ায় সেই দিনটির অপেক্ষায়।

১০.

বৃষ্টি বৃষ্টি আর বৃষ্টি-আকাশ থেকে ধেয়ে নিচে নেমে আসা সেই বৃষ্টির রঙ দেখতে দেখতে হঠাৎ, হা হঠাতই অন্যমনস্কভাবে জিজ্ঞেস করে বসলো ভেরা, এইসব কথা সত্যিই আপনি বিশ্বাস করেন মিঃ লস্কার্ড? হলঘরের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আবার কেমন আনমনা হয়ে পড়লো সে।

অদূরেই বসেছিল লস্কার্ড। ভেরার আচমকা প্রশ্ন শুনে তার মুখের দিকে তাকিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলো সে, কোন্ কথাগুলো বলুন তো? আপনি কি মিঃ ওয়ারেভের কথা বলতে চাইছেন?

হ্যাঁ, তাই তো।

কেন, অবিশ্বাসের কথা তো তিনি বলেন নি। তার প্রতিটি যুক্তিই তো যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ, নয় কি?

একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছি না, তবু যেন অবাক করার মতো তার কথাগুলো। আমাদের মধ্যেই একজন খুনি লুকিয়ে আছে, এ যেন বিশ্বাস করতেও মন চায় না।

না চাওয়ার তো কোনো কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি না মিস্ ক্লেথন। আপনার কি মনে হয় না, আগাগোড়া ব্যাপরাটাই অবিশ্বাস্য? বিশেষ করে ম্যাকআর্থার খুন হওয়ার পর এখন একটা ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত হয়ে গেছি, আমরা এক জব্বর খুনীর পাল্লায় পড়েছি।

তা যা বলেছেন, যেন এক একটা দুঃস্বপ্ন। উঃ তিন তিনটে খুন। ভাবাই যায় না। এর পর আরো কি কঠিন ঘটনার মুখোমুখি হতে হবে, আমরা কেউ তা জানি না। একটু থেমে ভেরা জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা, আমাদের মধ্যে খুনী কে হতে পারে। আন্দাজ করতে পারেন?

তার মানে মৃদু হেসে বলল লম্বার্ড, আপনি মনে মনে ঠিক করে ফেলেছেন, আপনি ও আমি, আমরা দুজনেই অপরাধীর তালিকা থেকে বাদ। সত্যি কথা বলতে কি এ ব্যাপারে আপনার ওপর আমার যথেষ্ট আস্থা আছে। পাগলামির কোনো লক্ষণই এ পর্যন্ত আমি দেখতে পাইনি আপনার মধ্যে। আর নিজের ব্যাপারে আমি জোর গলায় বলতে পারি, খুনী আমি নই, আর অপ্রকৃতস্থও নই। আপনার মতোই আমিও একজন নিরপরাধ সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ।

সত্যি, আপনার কথাগুলো কতোই না মিষ্টি। শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল, যেন আমার কানে মধু বর্ষিত হচ্ছে। লজ্জায় আরক্ত মুখে ভেরা তাকালো তার মুখ পানে, ভেবে অবাক হচ্ছি, আপনার মতো এমন একজন নিষ্পাপ লোকের বিরুদ্ধেও ঐ শয়তানটা অভিযোগ আনলো কোন্ সাহসে।

আপনি সত্যিই বুদ্ধিমতী, একমাত্র আপনিই আমাকে ঠিক চিনেছেন, গদ গদ হয়ে বললো লম্বার্ড, তার কথায় মনে হচ্ছে, এখানে এসে আমি বুঝি মস্ত বড় একটা অপরাধ করে ফেলেছি। যে যাইহোক এখন দেখা যাচ্ছে আমাদের দুজনকে বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকে মোট পাঁচজন। এখন দেখতে হবে, এই পাঁচজনের মধ্যে কে খুনী, কে সেই উন্মাদ। কেন জানি না একেবারে শুরু থেকেই ঐ বুড়ো ভাম ওয়ারথের ওপরেই আমার সব সন্দেহ গিয়ে পড়েছে। এসব ঘটনার পিছনে ওর কালো হাতই সক্রিয়।

শিউরে উঠলো ভেরা বিস্ময়াবিষ্ট স্বরে বললো ওয়ারথের বিরুদ্ধে আপনার এমন ধারণা হওয়ার কি কারণ ঘটলো জানতে পারি?

কারণটা আমি নিজেই জানি না, বলবো কি করে। তবে এটুকু বুঝি, বুড়ো এখন বয়সের ভারে নুইয়ে পড়েছে, দীর্ঘ চাকরী জীবনে তাকে কোট কাছারী করে কাটতে হয়েছে, বহু জটিল খুনের মামলায় কাজীর বিচারে দেখাতে দেখাতে শেষ অবধি তিনি তার মাথাটাই খারাপ করে ফেলেছেন। এর পরিণাম যা হয় তাই হয়েছে। তিনি নিজেকে সর্বশক্তিমান পুরুষ বলে ভাবতে শুরু করেন হঠাৎ একদিন। মানুষের জীবন রক্ষা এবং জীবন খতম করা, এ দুটোই তার হাতের মুঠোয়, অতএব এখন এখানে যে সব অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা ঘটে চলেছে, সেগুলো করতে তার আর বাধা কোথায়?

অসম্ভব কিছু নয়। অন্যের মনের খবর বোঝা মুশকিল।

এসব বলুন,রগার্স জানতে চাইলো, আপনার সন্দেহ কার ওপর?

ডঃ আর্মস্ট্রং, ওঁকেই আমার সন্দেহ হয় ।

আমার সন্দেহের তালিকায় উনিই কিন্তু শেষ ব্যক্তি ।

কোন যুক্তিতে? মৃদু প্রতিবাদ করলো ভেরা, আমরা জেনেছি, প্রথম দুজনের মৃত্যু হয়েছে বিষ প্রয়োগে । একমাত্র চিকিৎসকদের কাছেই সব সময়ে বিষ জাতীয় ওষুধ রাখা সম্ভব । তার ওপর এও তো হতে পারে, মিস্ রগার্সকে ঘুমের ওষুধের বদলে সরাসরি বিষ খাইয়ে থাকতে পারেন, পারেন না?

হুঁ, আপনার সন্দেহ অমূলক শুধু নয়, যথেষ্ট যুক্তিপূর্ণও বটে ।

আমার আরো বলার আছে আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন, পাগল ডাক্তারকে ওপর থেকে ঠিক বোঝা যায় না । বোধহয় তাদের অতিরিক্ত পরিশ্রমের দরুণ পাগলামিটা চাপা পড়ে যায় ।

আপনার সব যুক্তিই আমি মেনে নিচ্ছি, কিন্তু একটা হিসেবে কোথায় যেন গরমিল থেকে যাচ্ছে । আজ সকালে ডঃ আর্মস্ট্রং যেটুকু সময় একলা ছিলেন, তাতে অতদূর গিয়ে (যা ছুটে গেলেও সম্ভব নয় ।) জেনারেল ম্যাক আর্থারকে খুন করে আবার ফিরে আসা সম্ভব ব্যাপার । অতএব

এরপর এখানে অতএবের কোন স্থান নেই। নিজের যুক্তির সমর্থনে ভেরা বলে হয়তো তখন তিনি সুবিধা মতো সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে যথা সময়ে তিনি তাঁর কাজটা হাসিল করে আবার ফিরে এসেছেন এখানে।

তা সেই সময়টাই বা কখন, এখন একটু খুলে বলবেন?

সেই যে মনে পড়ছে এবার আজ দুপুরে মধ্যাহ্ন ভোজের ঠিক একটু আগে একটু থেমে ভেরা আবার বলে অগ্রণী হয়ে আমাদের সকলকে টপকে তিনি যখন ডঃ ম্যাকআর্থারের কাছে ছুটে গেলেন, তখনি তার কাজ হাসিল হয়ে যায়।

লন্সার্ডের চোখে গভীর বিস্ময়। সত্যি, এ কথাতো আগে কখনো আমার মনে হয়নি। যাই হোক, কাজটা সারতে গিয়ে তাতে অনেক ঝুঁকি নিতে হয়েছিল নিশ্চয়ই। তা আপনার বক্তব্য কি, এবার বলবেন?

কেন ঝুঁকি নিতে যাবেই বা কেন? জানেন তো, ডাক্তার হওয়ার অনেক বাড়তি সুযোগ সুবিধে আছে। যেমন ধরুন মৃত রোগীর নাড়ী টিপে বলে দিলেই হলো, ঘণ্টা খানেক আগে মারা গেছে। ব্যস, তাতেই কাজ হয়ে যাবে। বেদ বাক্য বলে চিকিৎসকদের মন্তব্যটা আমাদের মেনে নিতে হবে। ডাক্তারী জ্ঞান আমাদের নেই, তাই তাদের অঙ্গুলী হেলনে সায় দিতে হবে আমাদের।

অপূর্ব। অপূর্ব আপনার বিশ্লেষণ ক্ষমতা। উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলো লম্বার্ড, বোঝা যাচ্ছে আপনার মাথায় যথেষ্ট পরিমাণ ঘিলু আছে মিস ক্লেথন। আমি ভেবে অবাক হচ্ছি, এতে সব ভাবনা আপনার মাথায় এলো কি করে?

ব্লোরের সান্নিধ্যে এসে অনেকক্ষণ থেকে উসখুস করছিল রগার্স কথাটা বলার জন্য। শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলল সে, আমাদের মধ্যে খুনী কে হতে পারে মিঃ ব্লোর?

তেমন করে তো ভাবিনি এখনো।

মিঃ ওয়ারথের কথা মতো আমাদের মধ্যে থেকে খুনীকে যদি টেনে বার করতে পারতাম, তাহলে

একটু ধৈর্য ধরে থাকো। যথা সময়ে তার স্বরূপ ঠিক প্রকাশ হতে দেখবে। ব্লোর তাকে বোঝায় তুমি কি মনে করো তাকে জানার ইচ্ছে তোমার থেকে আমাদের কিছুমাত্র কম। আমরা সকলেই তার ওপর নজর রাখার চেষ্টা করছি।

আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, কিছু একটা গোপন করতে চাইছেন আপনি। সত্যি করে বলুন তো? আপনি কি খুনীকে চিনতে পেরেছেন?

ঠিক এখনই জোর দিয়ে বলতে পারি না চিনেছি, তবে খানিকটা আন্দাজ করতে পারি। কিন্তু তার নাম এখন জানতে চেও না। কেবল এটুকু বলতে পারি, ভারী ঠাণ্ডা মাথার লোক এই খুনী, খুব ভেবে চিন্তে কাজ করে থাকে সে।

তার মানে কখন যে ঠাণ্ডা মাথায় আমাদেরই কাউকে সে আবার খুন করে যাবে, কেউ আমরা টেরও পাবো না। উঃ এমনি এক দুঃস্বপ্নের ঘোরে বিভোর হয়ে থাকতে হবে আমাদের দিবা রাত্রি।

তা তুমিও তো দেখছি বেশ ভাবনা চিন্তা করছে। খুনী হিসেবে কাকে তোমার সন্দেহ হয় রগার্স?

আমি আর কি বলব স্যার মুখ্য সুখ্য মানুষ, আমাদের সব চিন্তা ভাবনাই এলোমলো, আপনাদের সঙ্গে মিলবে কেন বলুন? না সত্যি আমি কিসসু জানি না। আর জানি না বলেই তো এতো ভয়, এতে আতঙ্ক

রাগে উত্তেজনায় লাল চোখ করে পায়চারী করছিলেন ঘরের মধ্যে ডঃ আর্মস্ট্রং তেমনি উত্তেজিত স্বরে বিকট শব্দ করে বলে উঠলেন তিনি, আমি আর এক মুহূর্তের জন্যও থাকতে চাই না এখানে। যেভাবেই হোক এই দ্বীপ থেকে নিষ্কৃতি পেতে হবে।

তার চোখে চোখ রেখে ঘাড় নাড়লেন ওয়ারথ্রেভ। তারপর মৃদু হেসে বললেন তিনি, নিষ্কৃতি চাইলেই কি পাওয়া যায়? সমুদ্রের চেহারা দেখেছেন! যে ভাবে ফুঁসছে আগামী

চব্বিশ ঘণ্টার পরেও এই অশান্ত সমুদ্র শান্ত হবার নয়। অতএব আজ অহেতুক উত্তেজিত না হয়ে আগামীকালের কথা ভাবুন, যদি কাল অন্তত নিষ্কৃতি পান এই দ্বীপ থেকে।

কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টার আগেই যদি সেই উন্মাদটা খুন করে ফেলে আমাদের? যদি আমরা তার হাতে প্রাণ হারাই?

কখনই না। খুন করা অত সহজ নয়। তাছাড়া আমার এখন অনেক সজাগ। খুনির চরিত্র আমরা জেনে গেছি। এখন আমাদের মারে কে।

আগের তিনজনও কিন্তু মৃত্যুর আগে আপনার মতোই বুক ফুলিয়ে থাকবে

ওঁরা মৃত্যুর আগে একটুও প্রস্তুত ছিলেন না। তাই ওঁদের খুন হওয়াটা একটু আলাদা ধরনের ছিলো। কিন্তু আমাদের অবস্থা ওঁদের থেকে আলাদা। আমরা এখন চারদিকে চোখ কান খুলে রেখেছি, আমরা সজাগ, আমরা খুনির গতিবিধি চিনে ফেলেছি। এখন আমাদের সঙ্গে কোনো রকম ছলচাতুরী করতে পারবে না।

আমরা খুনির ছলচাতুরী জেনে ফেলেছি বলেই হয়তো সতর্ক হতে পারছি, একটু আগে আপনি বললেন, খুনির চরিত্র আমরা জেনে গেছি। কিন্তু খুনি কে তা জানি না এখনো অবধি।

জানেন, হ্যাঁ আপনিও জানেন বৈকি ডঃ আর্মস্ট্রং।

তাহলে আপনিই জানেন দেখছি, জানেন নাকি?

এখনো পর্যন্ত পাওয়া সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে যদি জানতে চান, তাহলে বলবো, আমি কিছুই জানি না। একটু আগে আপনি জানতে চাইলেন, আমি কাউকে সন্দেহ করি কিনা। হা, করি বৈকি। বিশেষ একজনকে, তার নাম আমি বলবো না, আমরা সকলেই চিনি তাকে।

বিস্ময়াবিষ্ট আর্মস্ট্রং ঠিক আন্দাজ করতে না পেরে তাকিয়ে রইলেন ওয়ারথের দিকে।

দোতলায় এমিলি তার ঘরে বসে সময় কাটাতে বাইবেলের পাতা ওল্টালেন, অক্ষরগুলো কেমন ঝাপসা হয়ে উঠলো। অগত্যা বইটা রেখে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার খুলে টেনে বার করলেন তার সেই নোটবই আর পেন্সিলটা। তারপর ধীরে ধীরে লিখতে শুরু করলেন নোট বই

আজ জেনারেল ম্যাকআর্থারের আকস্মিক মৃত্যুটা আমার কাছে একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা বলে মনে হয়েছে। (এখানে বলে রাখা ভাল ম্যাকআর্থারের ভাইপোর সঙ্গে বিয়ে হয়েছে আমাদের ম্যাকআর্থারের) খুব সম্ভব তিনি সত্যিই সত্যিই খুন হয়েছে। ওয়ারথের সুনিশ্চিত বক্তৃতার বোঝা গেলো, তার সন্দেহ খুনি আমাদেরই মধ্যে কেউ একজন হবে। আমি তার সঙ্গে একমত। আর সেই নিষ্ঠুর খুনীকে আমি চিনি। তার নাম

এখানে থামলেন এমিলি, বর্তমান থেকে চলে গেলেন সেই সুদূর অতীতে। তাঁর স্থির দৃষ্টির সামনে অতীতের সব ঘটনাগুলো একের পর এক ঘটে যেতে দেখলেন তিনি। হাতের পেন্সিলটা নিয়ে তিনি তার নোটবইতে কখন যে অক্ষরগুলো সাজাতে শুরু করেছিলেন, তা তার নিজেরই খেয়াল ছিলো না। হঠাৎ যখন হুঁশ হলো, নোটবইটির দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন। আশ্চর্য। এ আমি কি লিখলাম? তার চোখের সামনে ভেসে উঠল একটি নাম সে নাম বেট্রিস টেলর।

ভীষণ ভয় পেলেন তিনি। সেই ভয়ের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য দ্রুত পেন্সিল চালিয়ে কেটে দিলেন নামটা। তারপর নিজের মনে বিশ্লেষণ করতে বসলেন, মনের অগোচরে কেন লিখলাম সেই নামটা? আমি, আমি কি তাহলে পাগল হয়ে গেছি।

বাইরে তখন ঝড়ের তাণ্ডব ক্রমেই বেড়ে চলেছে। সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে বৃষ্টি।

হলঘরে এসে বসেছেন সকলে। কারোর মুখে কথা নেই। ঝড়ো বাতাসের শন্ শন্ শব্দ ছাড়া অন্য কিছু কর্ণগোচর হচ্ছিল না কারোর। সেই সময় চায়ের ট্রে হাতে নিয়ে ঘরে এসে ঢুকলো রগার্স। টেবিলের ওপর ট্রেটা নামিয়ে রাখলো সে।

এমিলির দিকে তাকিয়ে বললো ভেরা, মিস্ ব্লেন্ট, আজ আপনিই আমাদের চা পরিবেশন করুন।

না, আমি পারবো না। কেলীটা যা ভারী, যদি হাত ফসকে পড়ে যায়। তার ওপর মনটা আমার একেই অশান্ত, উলের দুটো গোলা কোথায় যে ফেললাম, খুঁজেই পাচ্ছি না।

শেষ পর্যন্ত ভেরার হাতেই পড়লো সেই ভারী কেলীর ওপর। বাইরে রিমঝিম বৃষ্টির ছন্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে টুং-টাং শব্দটা একটা অদ্ভুত ব্যঞ্জনা এনে দিয়েছিল যেন। ঘরে এখন একটু আগের সেই থমথমে ভাবটা এখন আর নেই। চায়ের পেয়ালায় কথার ঝড় উঠতে দেখা গেলো একটু পরেই। মেতে উঠলেন সকলে নতুন করে আনন্দে গা ভাসিয়ে দিয়ে। বৃষ্টি স্নাত বিকেলে ধূমায়িত চায়ের মধ্যে একটা অদ্ভুত সামঞ্জস্যতা অনুভব করলেন সকলে। বুঝি এমনি এক মুখর আনন্দের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন তারা।

সকলেই চায়ের স্বাদ গ্রহণ করার জন্য চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিলেও ওয়ারগ্রেভ কিন্তু চোখ বুজে বসেছিলেন চেয়ারে। ও রসে বুঝিবা তিনি অনাগ্রহী, আসক্তি নেই তার চায়ে। চা তিনি পান করেন না।

হস্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলো রগার্স, মুখে তার আতঙ্কের ছাপ, হত বিহ্বল দৃষ্টি, এদিক ওদিক, কি যেন খুঁজছে সে, তার আগমনে ঘরের সহজ সাবলীল ভাবটা যেন মুছে গেলো নিমেষে।

কি খুঁজলো রগার্স? চায়ের খালি কাপটা নামাতে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো ওয়ারগ্রেভ, কিছু কি তোমার হারিয়েছে?

যৎসামান্য, মানে বাথরুমের পর্দাটা খুঁজে পাচ্ছি না।

সে কি। এবার প্রশ্ন চোখে তাকালেন ওয়ারথ্রেভ, আজ সকালেই তো বুলতে দেখেছি বাথরুমে।

হ্যাঁ স্যার, আমিও তো দেখেছি।

কি রকম পর্দা বলতো? ব্লোর জানতে চাইলো।

ঘন লাল রঙের সিল্কের পর্দা উধাও।

আরে এমন একটা তুচ্ছ জিনিষ নিয়ে তুমি মাথা ঘামাচ্ছে রগার্স? এ তোমার পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয়। অবশ্য এখানকার সব কিছুতেই তো পাগলামি। তবে নিশ্চিত থাকতে পারো তুমি। ঐ পর্দা দিয়ে কাউকে খুন করা সম্ভব নয়। হারানো পর্দার জন্য চিন্তা করো না।

চিন্তা করবো না বলছেন? কথাটি ঠিক মনে ধরলো না রগার্সের তবু ঘাড় নাড়লো, ঠিক চিন্তা করবো না। তেমনি ঘাড় নাড়তে নাড়তে বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে সে। তারপর ঘরে নেমে এলো অখণ্ড নীরবতা, এ ওর দিকে তাকিয়ে দেখতে থাকলো বিস্ময় ভরা চোখে।

নৈশভোজের পর সকলে আবার ফিরে এলেন বড় হলঘরে। তখনো কথা নেই কারোর মুখে। কেমন যেন একটা অস্বস্তিবোধ কারু করে ফেলেছিল সকলকে। সেই ভাবেই কাটলো রাত নটা পর্যন্ত।

প্রথমে এমিলিই উঠে দাঁড়ালেন, শোবার সময় হলো যাই এবার।

তার দেখাদেখি উঠে দাঁড়ালো ভেরাও, সকাল সকাল উঠতে হবে কাল। আমিও চললাম।

তাদের অনুসরণ করলেন ব্লোর এবং লম্বার্ড। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে গিয়ে তাদের কানে এলো দরজার খিল দেবার শব্দ। হেসে বললেন ব্লোর, আচ্ছা দেখছেন মিঃ লম্বার্ড। আমাদের আর সতর্ক করে দিতে হলো না। ভয় এমনি জিনিস ওঁরা নিজেরাই কেমন নিজেদের নিরাপত্তার ভার নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছেন, দরজার খিল দিতে ভুল করেন নি।

তাঁর কথা যেন শুনতে পায়নি, এমনি একটা ভাব দেখিয়ে নিজের মনেই বলে গেলো, যাক, বাঁচা গেলো আজ আমরা মোটামুটি সজাগ বলেই এখন অনেকটা নিরাপদ ভাবে পারি। তারপর একটু থেমে সে আবার বললো, যে কাজে আসা তা তো তারা নিজেরাই সেরে নিলেন। চলুন এবার তাহলে নিচে যাওয়া যাক।

সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে শুরু করলেন ওঁরা আবার।

আরো ঘন্টাখানেক গল্পগুজব করে পুরুষ চারজন সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে থাকলেন যে যার ঘরে গিয়ে শোবার তোড়জোড় করার জন্য। খাবার ঘরের দরজার আড়াল থেকে তাদের গমনপথের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো রগার্স। ওঁরা কেউই তার সেই গোপন পর্যবেক্ষণ লক্ষ্য করতে পারলো না।

সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌঁছে বাকী তিনজন পুরুষকে সতর্ক করে দিতে ভুললেন না ওয়ারথ্রেভ, ঘরের ভেতর থেকে দরজায় তালা দিতে ভুলে যাবেন না যেন।

সেই সঙ্গে ব্লোর আবার যোগ করলেন, বন্ধুগণ, আপনাদের আরো একটা কথা বলে রাখি, আমাদের খুনী অত্যন্ত চতুর, বাইরে থেকে তালা খোলার উপায় নিশ্চয়ই তার জানা থাকতে পারে। তাই বাড়ির সাবধানতার জন্য দরজার সামনে একটা চেয়ার ও রেখে দেবেন। তালা খুলে অন্ধকারে ঘরে ঢুকতে গিয়ে চেয়ারে হোঁচট খেলেই শব্দ হবে, আপনাদের ঘুম ভেঙ্গে যাবে। তাহলেই খুণীর ইচ্ছাপূরণ আর হবে না কেমন।

একটা তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেলো লম্বার্ডের ঠোঁটে। হ্যাঁ সবজান্তা উপদেষ্টার কথা আপনারা যেন কেউ ভুলবেন না কিংবা অবহেলা করবেন না।

খোঁচাটা হজম করতে হলো ব্লোরকে গম্ভীর হয়ে। অত বড় বড় চোখ করে লম্বার্ডের দিকে তাকালেন ওয়ারথ্রেভ। তারপর তিনি আর দাঁড়ালেন না সেখানে, সোজা গিয়ে ঢুকলেন নিজের ঘরে।

চারজন পুরুষের মধ্যে শেষ মানুষটি তার ঘরে প্রবেশ করা মাত্র খাবার ঘরের দরজার আড়াল থেকে অতি সন্তর্পণে বেরিয়ে এলো রগার্স। চারদিক দেখে নিয়ে সে আবার গিয়ে ঢুকলো নিজের ঘরে। নিজের মনে মাথা দুলিয়ে বললো সে কাল ভোর সকালে উঠতে হবে। তবে আজ রাতেই কালের প্রাতঃরাশের খাবার সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছে। ভোর সকালে উঠেই উনুন ধরাতে হবে। অতিথিরা ঘুম থেকে জেগে ওঠার আগেই, খাবার তো প্রায় তৈরীই আছে শুধু চা তৈরি করতে হবে।

তারপর সে তার সেই ছোট্ট আলমারিটির দিকে তাকালো। তখনো সাতটা পুতুলই অবশিষ্ট রয়েছে। না, এবার আর একটি পুতুলও নিরুদ্দেশ হতে দেবো না। আজ আমি নিজে প্রয়োজন হলে সারা রাত জেগে থেকে পুতুলগুলোকে পাহারা দেবো। দেখি কে আমার চোখকে ফাঁকি দেয়। কার এতো দুঃসাহস আছে। আমাকে ডিঙ্গিয়ে উন্মাদটা তার খুশি মতো যখন তখন কাউকে না কাউকে খুন করবে, আর একটি করে পুতুল উধাও করে ফেলবে। আজ আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে সে

ঘরের আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লো সে অতঃপর।

ভোর হওয়ার ঠিক আগে ঘুম ভেঙ্গে যাওয়া লম্বার্ডের চিরদিনের অভ্যাস। আজও তার ব্যতিক্রম হলো না। ঘুম ভাঙতেই অনুভব করলো সে, গতকাল রাতের তুলনায় আজ বাতাসের সেই দাপট আর নেই। কান পেতে শুনতে গিয়ে বুঝলো সে, বৃষ্টির ফোঁটা পড়ার শব্দও আর শোনা যাচ্ছে না। তাহলে বৃষ্টি কি থেমেছে? কথাটা ভাবতে ভাবতেই ফিরে আবার ঘুমিয়ে পড়লো লম্বার্ড।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের গতি আবার বাড়লো, কিন্তু লম্বার্ডের ঘুম আর যেন ভাঙ্গে না, ঘুম ভাঙলো সেই সাড়ে নটায়। দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সময় দেখেই ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো সে। ঘড়ির টিক টিক টিক ... না, আর দেরী করা ঠিক হবে না। কিছু একটা করা দরকার। আর এখনি, এখন নটা পঁয়তিরিশ।.....

ঘর থেকে বেরিয়ে প্রথমেই সে গেলো ব্লোরের ঘরের সামনে, ন করলো। একটু পরেই দরজা খুলে গেল, দরজার ওপরে দাঁড়িয়ে ছিলেন ব্লোর ঘুম জড়ানো চোখে।

আচ্ছা লোক তো মশাই আপনি। কতো বেলা হয়েছে, সে খেয়াল আছে?

দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকালেন ব্লোর। চোখ থেকে ঘুম তখন তার নিরুদ্দেশ, তার বদলে একরাশ বিস্ময়। কি আশ্চর্য। বেলা এতো গড়িয়ে গেছে? এত বেলা পর্যন্ত ঘুম

আমার, কখনো হয়নি। কিন্তু রগার্সই বা কি রকম লোক বলুন তো মশাই? সে ও তো ডেকে দিতে পারতো।

রগার্স আপনার ঘুম ভাঙাবে? তাহলেই হয়েছে। মুখ বিকৃত করে বললো লম্বার্ড, তার সম্বন্ধে আপনি আমি কতটুকুই বা জানি বলুন।

সে কি রকম? কৌতূহল ভরা চোখে তাকালেন ব্লোর।

কি বলে যে বোঝাব আপনাকে, জানেন রগার্স উধাও? তার পাত্তা নেই এ প্রাসাদের কোথাও। এমন কি, উনুন পর্যন্ত ধরিয়ে যায় নি সে।

সেকি? স্ফাউন্ডেলটা কি তাহলে আমাদের ফেলে সত্যি সত্যি কেটে পড়লো। গায়ে জামা গলাতে গলাতে বললেন ব্লোর, চলুন অন্য আরো অতিথিদের ঘরে। দেখা যাক ওঁরা যদি তার কোনো হৃদিস দিতে পারেন।

না কেউই তার খবর জানে না। আর্মস্ট্রং ওয়ারথেন্ড কিংবা ভেরা, সকলের বক্তব্য একটাই-রগার্সকে তারা শেষ দেখেছেন গতকাল রাতে শুতে যাওয়ার আগে। এখন সকলের লক্ষ্য এমিলির ঘরের দিকে, যদি তার কোনো খবর দিতে পারেন তিনি। না তাঁর ঘরের সামনে গিয়ে আরো বেশী হতাশা হলেন সকলে। দরজা হাট করে খোলা, ঘরে নেই এমিলি।

এরপর একসঙ্গে সকলে গিয়ে ঢুকলেন রগার্সের ঘরে। এলোমেলো বিছানা রাতিয়াপনের স্পষ্ট চিহ্ন চোখে পড়ে। দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম ড্রেসিং টেবিলের ওপর পড়ে রয়েছে ভিজে অবস্থায়।

এর অর্থ হলো, নিজের মনে লম্বার্ড বললো যথারীতি আজ ঘুম থেকে উঠে রোজকার অভ্যাস মতো দাড়ি কামিয়েছে সে।

তাহলে কি সে কোথাও লুকিয়ে ওঁৎ পেতে বসে আছে আমাদের মধ্যে থেকে কাউকে তার চতুর্থ শিকার হিসেবে বেছে নেওয়ার জন্য। ভয়ে ভয়ে নিচু গলায় বললো ভেরা।

অসম্ভব কিছু নয়। লম্বার্ডকে দেখে মনে হলো, খুবই চিন্তিত সে। তাই যদি হয় তাহলে চলুন আমরা এক সঙ্গে এগিয়ে চলি। আমরা এক সঙ্গে থাকলে খুনির বাবারও ক্ষমতা নেই, আমাদের গায়ে হাত তোলে।

আর মিস ব্লেন্টও বা কি রকম মহিলা বলুন তো। বিরক্ত হলেন ব্লোর বলা নেই, কওয়া নেই, সুট করে কোথায় চলে গেলেন। এ এক নতুন ফ্যাসাদ, ওঁকে এখন খুঁজি কোথায় বলুন তো?

নিচে নেমে এলেন সকলে অতঃপর। আর ঠিক তখনই প্রাসাদের খোলা ফটকে পথ দিয়ে এমিলিকে ঢুকতে দেখলেন তাঁরা, আপাদমস্তক তার ঢাকা গরম পোষাকে।

হলঘরের সামনে এসে ওঁদের দেখে মৃদু উত্তেজিত স্বরে বলে উঠলেন এমিলি এই মাত্র সমুদ্র দেখে আসছি। উঃ কি ভয়ঙ্কর রুদ্ধ মূর্তি সমুদ্রের। এই দুর্যোগে লঞ না আসার সম্ভাবনাই বেশী।

অবাক চোখে তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন ব্লোর। তার কথা শেষ হতে না হতেই রাগত স্বরে বললেন তিনি, একা প্রাসাদের বাইরে বেরিয়ে কাজটা আপনি ভাল করেননি মিস্ ব্লেন্ট, বিশেষ করে আমাদের সকলের নামই যখন খুনের তালিকায় ঝুলছে।

ওটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার মিঃ ব্লোর। একটু রুগ্ন হয়েই জবাব দিলেন এমিলি, আপনার মাথা না থামালেও চলবে। আর এও জেনে রাখবেন চারদিক দেখে শুনেই আমি পা ফেলে থাকি।

বেশ তা না হয় মানলাম, এখন বলুন পথে রগার্সকে দেখতে পেলেন?

রগার্সকে। অবাক বিস্ময়ে ব্লোরের দিকে তাকালেন এমিলি, কেন বলুন তো?

কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন ব্লোর বলা হলো না ওয়ারথের উৎসাহসব্যঞ্জক কথা শুনে। খাবার ঘরের দরজা ঠেলে একবার উঁকি মেরে মৃদু হেসে তিনি বলে উঠলেন, ঐ তো ব্রেকফাস্ট কেমন সাজানো রয়েছে।

দরজা ঠেলে প্রথমে খাবার ঘরে প্রবেশ করলেন ওয়ারথ্রেভ, তাকে অনুসরণ করলেন বাকী সকলে। সকলেই দেখলেন, টেবিলের ওপর ছটি প্লেটে সাজানো খাবার। দেখে মনে হলো টেবিলে খাবারের প্লেটগুলো রেখে খাবার জল আনতে গেছে রগার্স।

হঠাৎ ভয়ে আতঙ্কে কান্নার মতো চিৎকার করে উঠলো ভেরা। তারপর ওয়ারথ্রেভের কাঁধে মাথা রেখে ডুকরে কেঁদে উঠলো সে।

সুদূর, হতবাক সকলে, তার হঠাৎ সেই কান্নার মানে খুঁজে পেলেন না কেউ। ভেরার মুখের দিকে প্রশ্ন চোখে তাকিয়ে রইলেন সকলে, তার কান্নার হেতুটা কি জানার জন্য।

সেটা উপলব্ধি করে ভেরা নিজের থেকেই আবার চিৎকার করে আঙ্গুল দেখিয়ে কান্না স্বরে বললো, ঐ আলমারিটার দিকে তাকালেন? দেখতে গিয়ে ভেরার মতো তারাও শিউরে উঠলেন প্রায় একসঙ্গে বলে উঠলেন সকলে একি। সাতটার জায়গায় এখন মোট ছটা পুতুল রয়েছে

বেশী খুঁজতে হলো না। প্রাসাদের পিছনে জ্বালানী কাঠ রাখার গুদামের সামনে রগার্সকে পড়ে থাকতে দেখল সকলে। রক্তাক্ত দেহ, গলাটা ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন, বাঁ হাতের মুঠোয় ধরে রাখা এক টুকরো কাঠ। রক্তরঙে রঞ্জিত কুড়লটা পড়েছিল তার মস্তকহীন ধড়ের পাশেই। সামনে জড়ো করা কাটা কাঠ। উনুন ধরাবার কাঠ কাটতে গিয়ে বুঝি কখন ভুল করে নিজের গলাতেই কুড়লে কোপ দিয়ে ফেলেছে সে। আপাত দৃষ্টিতে তাই মনে হয়। কিন্তু

আমাদের চতুর খুনির আর একবার তার খুনের নেশা চরিতার্থ করতে একটুও অসুবিধে হয় নি, রগার্সের দ্বিখণ্ডিত মৃতদেহের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে বললেন আর্মস্ট্রং দৃশ্যটা ছিলো ঠিক এই রকম, নিচু হয়ে কাঠ কাটছিল রগার্স উনুন ধরাবার জন্য আপন মনে, খুনি যে কখন পা টিপে টিপে নিঃশব্দে তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল। খেয়াল করতে পারেনি সে। তারপর খুনি অতর্কিতে হাত ধরে তার হাত থেকে কুড়ুলটা ছিনিয়ে নিয়ে তারই কুড়ুলের এক কোপে তার ধড় থেকে গলাটা নামিয়ে দিয়েছে।

দূর থেকে চকিতে একবার এমিলির মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে আর্মস্ট্রং এর উদ্দেশ্যে বললেন ডঃ ওয়ারথেন্ড, ডঃ আর্মস্ট্রং আপনার কি মনে হয়, একাজ কোনো মহিলার পক্ষে করা সম্ভব?

হ্যাঁ, সম্ভব বৈকি। উপস্থিত সকলকে চকিতে একবার দেখে নিলের আর্মস্ট্রং। ভাগ্যিস এমিলি ও ভেরা বসেছিলেন দূরে রান্নাঘরে মেঝের ওপর। আর্মস্ট্রং নিজের কথায় জের টেনে আবার বললেন, চোখে লাগার মতো এমিলির দেহের গঠন, ভাল স্বাস্থ্য দেখেই আমি বলছি, এ কাজ তার অসাধ্য নয়। যদিও তাঁর বয়স হয়েছে কিন্তু তিনি যে ভাবে দ্রুত পা ফেলে ফেলে প্রাসাদে এসে ঢুকলেন, তাতে আমার এ কথাই মনে হয়। তাছাড়া মনটা শক্ত থাকলে শারীরিক ক্ষমতার অভাব হয় না।

নিচু হয়ে কুড়ুলটা পরীক্ষা করে উঠে দাঁড়ালেন ব্লোর, আগেই জেনেছি অত্যন্ত চতুর এই খুনি হাতের কোনো ছাপ রাখে নি, কাজ শেষে রুমাল দিয়ে মুছে দিয়েছে।

হঠাৎ মৌমাছির আগমন হতে দেখে সকলে মুখ চাওয়া চাওয়া করলেন, এখানে মৌমাছি এলো কোথা থেকে। এ নিয়ে পুরুষরা যখন আলোচনায় ব্যস্ত, ঠিক তখনি আচমকা রান্নাঘর থেকে গলা ফাটানো হাসির শব্দ শুনে চমকে ফিরে তাকালেন তারা রান্নাঘরের দিকে। সেই পাগল করা হাসি হাসতে হাসতে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলো ভেরা। হাসির উচ্ছ্বাসে তার সারা শরীর ফুলে ফুলে ফেঁপে উঠছিল।

পুরুষদের দেখে হুঁশ হলো ভেরার। হাসি থামিয়ে মায়াবিনীর মতো স্বপ্নালু চোখে লম্বার্ডের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো সে লক্ষ্মীটি মিঃ লম্বার্ড, এই মৌমাছিগুলো কোথা থেকে আসছে, দেখুন আপনি। নিশ্চয়ই এই দ্বীপে কোথাও মৌচাক আছে। আমি সেই মৌচাকে টিল মেরে মদু আহরণ করে আনবো। আঃ চাক ভাঙা মধু খেতে কতোই না মিষ্টি হা-হা-হা-।

তার সেই পাগলামি দেখে সকলেই স্তম্ভিত, কারোর মুখে কথা ফোটে না পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকায়-মেয়েটি কি তাহলে

চুপ করে রইলেন কেন? আমার কথার জবাব দিন? লম্বার্ডের কাছে কৈফিয়ত চাইল ভেরা, আপনারা ভেবেছেন, আমি বুঝি পাগল হয়ে গেছি। না, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ স্বাভাবিক। আ-আমি মৌচাকে টিল ছুঁড়বো, আমি মধু খাবো, চাক ভাঙা মধু। কেন মনে নেই সেই কবিতাটার কথা

মিঃ লম্বার্ড দয়া করে বলুন, কোথায় গেলে আমি পাবো মৌচাক। আমি টিল ছুঁড়বো আমি মধু খাবো, আ-আমি

হা-হা-হা-যেন সে উন্মাদিনীর মতো হেসে চলেছে একটানা। অসহ্য। আর থাকতে পারলেন না আর্মস্ট্রং। এক পা এক পা করে তার সামনে এগিয়ে গিয়ে একটা অদ্ভুত কাজ করে বসলেন, ভেরার ফর্সা গালের ওপর সজোরে চড় মেরে বসলেন। এ যেন কল্পনার বাইরে, চমকে উঠলো ভেরা। গালে হাত বোলাতে বোলাতে এবার সে স্বাভাবিক গলায় বললো, আমার ভুল শুধরে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ।

মুহূর্তে একেবারে বদলে গেলো ভেরা। শান্ত সহজ মেয়ে ভেরা, চোখে নেই চাঞ্চল্য কিংবা বিস্ময়বোধ। পিছু হটে গিয়ে নিজের থেকেই আবার বললো ভেরা দুঃখিত। এখুনি আমি আর মিস্ ব্লেন্ট আপনাদের ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা করছি। তারপর রান্নাঘরের খালি উনুনের দিকে আড়চোখে একবার তাকিয়ে বললো সে, কয়েক টুকরো কাঠ পেলে উনুন ধরিয়ে আপনাদের চায়ের ব্যবস্থা করতে পারতাম।

এমিলিকে সঙ্গে নিয়ে ভেরা রান্নাঘরে চলে যেতেই আর্মস্ট্রং এর দিকে তাকালেন ব্লোর, কি ডাক্তার এটাও কি আপনাদের চিকিৎসা শাস্ত্রের একটা ওষুধ নাকি? বড়! ডোজ! এক চড়েই একেবারে চুপ।

তা চুপ না করলে মেয়েটি যে হিস্ট্রিয়া রোগগ্রস্ত হয়ে পড়তো। তখন আর এক ঝামেলা প্রসঙ্গটাকে চাপা দিয়ে আর্মস্ট্রং সকলকে মনে করিয়ে দিলেন, মেয়েটি জ্বালানি কাঠ চেয়ে গেছে। চলুন যাওয়া যাক। রগার্সের কেটে রাখা কয়েক টুকরো কাঠ বয়ে আনা যাক।

সবাই দুহাতে করে রান্নার কাঠ বয়ে নিয়ে এলেন রান্নাঘরে। চোখ তুলে তাদের একবার দেখে নিয়ে বললেন এমিলি আপনারা ডাইনিং টেবিলের সামনে গিয়ে বসুন সবাই। আধ ঘণ্টার মধ্যেই আপনাদের ব্রেকফাস্ট তৈরি হয়ে যাবে।

লম্বার্ডকে একা পেতেই ফিসফিসিয়ে তাকে বললেন ব্লোর রগার্সের আকস্মিক মৃত্যুতে আমরা যখন সবাই বিচলিত, কেবল একজন কেমন অবিচল থেকে দিব্যি স্বাভাবিক ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন? উনি আবার আমাদের জন্য ব্রেকফাস্ট তৈরী করছেন এখন। বা চমৎকার। আপনার কি মনে হয়?

ঠিক এখনি কিছু বলা মুশকিল।

দেখুন মিঃ লম্বার্ড ওঁর সম্পর্কে আপনি কি ভাবছেন আমি জানি না। তবে এই সব চিরকুমারী মধ্যবয়স্কদের ওপর আমার বিন্দুমাত্র আস্থা নেই। বাইরে থেকে ধর্মের দোহাই দিয়ে সত্যের যতো পরিচয়ই ওরা দিক না কেন, ভেতরে ভেতরে ওরা মহা শয়তান। হেন অসৎ কাজ নেই যে করতে পারে না।

কিন্তু আপনি বোধ হয় একটা ভুল করেছেন মিঃ ব্লোর সৎ অসৎ যাই হোক না কেন ধর্মের নামে বজ্জাতি আর উন্মত্ততা এক নয়।

লম্বার্ডের কথাটা যেন কানেই ঢেকে নি, এমনি ভাব দেখিয়ে বলতে থাকেন ব্লোর, আবার দেখুন আমরা যখন একা একা বাইরে যেতে ভয় পাচ্ছি উনি তখন কেমন নির্ভয়ে বুক ফুলিয়ে বাইরে এক চক্কর দিয়ে এলেন। এর কারণটা বোঝা তো খুবই সহজ মশাই, প্রকৃত খুনীর আবার কিসের ভয়?

হ্যাঁ, ঠিক, ঠিক, মাথা নেড়ে সায় দিলো লম্বার্ড, আশ্চর্য, আপনার মতো এতো গভীর ভাবে আমি কেন চিন্তা করলাম না। তারপর এক গাল হেসে বললো লম্বার্ড, তবে এখন আমি একেবারে নিশ্চিত, সেবারের মতো আবার যে আমাকে সন্দেহ করে বসেন নি, তাতেই আমি খুশি।

আরে মশাই, আমি কি শুধু শুধু সন্দেহ করেছিলাম? আপনার সেই রিভলবারটাই তো-
কার না সন্দেহ হয় বলুন। তবে পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে আর লাভ নেই। আপনার সম্পর্কে
এখন আর আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আশা করি আমার সম্বন্ধেও আপনার ধারণা
এখন পাল্টেছে নিশ্চয়ই।

না পাল্টাবার কোনো প্রয়োজনই মনে করি না। কেন জানেন? বললো লম্বার্ড, আমি
আপনাকে কোনোদিনই সন্দেহ করিনি। অপরাধ নেবেন না, হয়তো ছোট মুখ বড় কথা
হয়ে যাচ্ছে, আপনার মগজে বুদ্ধি সুদ্ধি আছে বলে তো আমি মনে করি না। আর খুন

করতে হলে যথেষ্ট বুদ্ধি থাকার প্রয়োজন। আপনার মতো একজন নিরেট বোকা লোক কি করে ল্যান্ডরকে কাবু করলেন, আপনি জানেন আর ঈশ্বর জানেন?

প্রসঙ্গটা তুলে ভালই করেছেন। খুলেই বলি তাহলে ল্যান্ডরের সত্যিই কোনো দোষ ছিলো না। কিন্তু ডাকাত দলের সংশ্রবে পড়ে শেষ পর্যন্ত তাকে ফাসাতে বাধ্য হয়েছি। তবে জেনে রাখুন তার মৃত্যুর ব্যাপারে বিশ্বাস করুন আমার কোনো হাত ছিলো না। তার ভাগ্য খারাপ, তাই

ভাগ্য তো আপনারও খারাপ মিঃ ব্লোর তা না হলে দীর্ঘ দিন পরে অতীতের সেই সত্য না মিথ্যে ঘটনার জেরই বা টানতে হবে কেন, আর তার জন্য আজ আপনার প্রাণনাশের আশঙ্কাই বা দেখা দেবে কেন বলুন।

আমার প্রাণনাশের আশঙ্কা? আরে ছাড়ুন। আমি এখন খুবই সতর্ক, আমাকে মারার মতো খুণীর জনম এখনো হয়নি।

না জন্মালেই ভাল, আর যদি জন্মে থাকে, মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে আমার ভবিষ্যৎ বাণীটা মনে রাখবেন। বোকারা প্রাণ হারায় সবার আগে। তাই আবার আমি সতর্ক করে দিচ্ছি আপনাকে, আপনার বুদ্ধি বলতে কিছুই নেই, তাই আপনার মৃত্যু আসন্ন, আপনার বেঁচে থাকার দিন প্রায় সীমিত।

আর আপনি নিজেকে যত চালাকই ভাবুন না কেন, আপনিও বাঁচতে পারবেন না।

আমি যে অমর সে কথা আমি বলছি না, মৃদু হেসে লম্বাড বললো তবে তাই বলে আপনার মতো এখানে পড়ে থেকে বেঘোরে প্রাণ দেবো না। খুনী আমাকে স্পর্শ করার আগেই আমি এখান থেকে চম্পট দেবো।

ব্রেকফাস্টের খাবার তৈরী করতে গিয়ে ভেরা তখন আপন মনে নিজেকে দুঃখছিলো। ছিঃ ছিঃ কাজটা আমি মোটেও ভাল করিনি। ওঁরা আমাকে পাগল ঠাওড়ালেন। আমি কি সত্যি পাগল হয়ে গেছি? নিজের একটু বোকামির জন্য সবাই আমাকে পাগল ভাবলেন। না, এখন থেকে মাথা গরম করলে চলবে না, ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করতে হবে, একেবারে ঠাণ্ডা জলের মতো

জলের প্রসঙ্গ উঠতেই মনে পড়ে গেলো সিরিলের কথা। তখন সবাই বলাবলি করেছিল, আমার মাথা নাকি খুব পরিষ্কার তা না হলে সিরিলকে জলে ডুবতে দেখেও মেয়েটি একটু ঘাবড়ায়নি। সবাই আমার প্রশংসা করেছে, আমার জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সিরিলকে বাঁচানোর প্রচেষ্টার মধ্যে।

কিন্তু হুগো, হুগো আমাকে ভুল বুঝলো, কোনো কথা না বলে এমন ভাবে তাকিয়েছিল ওর সেই জ্বলন্ত চাহনি আমি সহ্য করতে পারিনি। অথচ আমি ওর জন্যই, না, ফেলে আসা দিনগুলির কথা আর ভাববো না। অতীতের কথা আর ভাববো না। অতীতের স্মৃতি বড় বেদনাময়।

কি ভাবছে ভেরা? এমিলির কথায় ভেরা ফিরে এলো বর্তমানে, রুটিগুলো যে সব পুড়ে গেলো।

ছিঃ ছিঃ অমন অন্যমনস্ক হওয়া উচিত হয়নি। নিজের ত্রুটি স্বীকার করে নিয়ে কাজে মন দিলো ভেরা এবার। চটপট রুটির চাটুটা উনুন থেকে নামিয়ে রাখলো সে। তৈরি হয়েই ছিলেন এমিলি, এস্ত হাতে চায়ের কেতলীটা চাপিয়ে দিলেন উনুনের ওপর।

এমিলিকে সহজ ভঙ্গিমায় কাজ করতে দেখে কেমন হিংসে হলো ভেরার। আপনাকে দেখে আমার হিংসে হচ্ছে মিস্ ব্লেন্ট। এতো সব ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে গেলো একের পর এক, তবু আপনি কেমন মাথা ঠাণ্ডা রেখে সামনে কাজ করে যাচ্ছেন। কি করে মন মেজাজ ঠাণ্ডা রাখেন বলুন তো? আপনার মরতে ভয় করে না?

ভয় কেন করবে না? আলবাৎ করে। মরার ভয় কার না পায় বলুন? দৃঢ়স্বরে এমিলি বলে, কিন্তু আমি কেন মরতে যাব? আমি কোনো পাপ করিনি। আমি সহজে মরবো না। মরতে হয় আপনারা সবাই মরবেন। আমি শেষ দেখতে চাই। শেষটা না দেখা পর্যন্ত কোনো খুনীই আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না দেখবেন।

ওরা সবাই নিজেকে খুব চালাক বলে মনে করে, কিন্তু ওদের মতো বোকা বোধ হয় কেউ নেই। তা না হলে মরণকে ভয় করে হাত পা গুটিয়ে সবাই বসে থাকে। আরে ভয়কে জয় করতে হয় চোখে চোখ রেখে। মূল্যবান জীবনকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব তো মানুষের নিজেরই। বোকা ম্যাকআর্থার সেই দায়িত্বটা পালন করলো না বলেই তাকে

আজ অসময়ে প্রাণ হারাতে হলো। আর সেই নচ্ছার বেদ্রিস টেবল ছিঃ ছিঃ ঐ জঘন্য বর্বরের কথা আমি আবার ভাবছি কেন? আপদ গেছে, ভালই হয়েছে? একটা অমানুষ? তা না হলে কেউ কি আত্মহত্যা করে?

নতুন রাধুনীদের তৈরী ব্রেকফাস্ট সবাই বেশ তৃপ্তি সহকারে খেলেও একটা দুশ্চিন্তায় তার ছজন যেন ক্রমশঃ কাবু হয়ে পড়েছিলেন এখন তাদের কেবল একটাই চিন্তা, এবার কার পালা? কে বধ হবে।

সমাধানের মার নেই। একটু চালাক চতুর হতে হবে। কিন্তু কথায় আছে, অতি চালাকের গলায় দড়ি। তাছাড়া এখানকার রকম সকম আলাদা, কখন কার ভাগ্যে কি যে ঘটবে আগে ভাগে কেউ টেরও পাবে না। যেমন পায়নি মাস্টার্ন, মিসেস রগার্স, ম্যাকআর্থার।

এখানে আসা অবধি যা যা অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা ঘটছে, এর পরেও যে নিরাপদে থাকতে পিরবো, তার কি নিশ্চয়তা আছে। এই ধরাই যাক না কেন উলের গোলাদুটোর কথা ঘরে রেখে গেলাম। ফিরে এসে দেখি নেই। ভাবতে কেমন লাগে, আমার উলের গোলাদুটোর কি প্রয়োজন হলো খুনীর। উল দিয়ে গলায় ফাঁস। যততো সব আজগুলি চিন্তা। যাই হোক, এখন থেকে অবশ্যই সতর্ক হতে হবে, আগের, চেয়ে একটু বেশী।

এদের বোকা না বলে বলবো গাভি। গাভি না হলে, আমার বানানো গল্প তারা কেমন বিশ্বাস করে নেয়? এতো সহজে কাজগুলো যে হাসিল করতে পারবো, করার আগেও ভাবতে পারিনি।

খাবার ঘরের আলমারিতে ছটা পুতুল দেখে এসেছি, কে জানে কাল সকালে আর একটা যেতে দেখবো কি না।

.

১২.

ব্রেকফাস্টের পর সকলকে ডেকে জানিয়ে দিলেন ওয়ারথ্রেভ একটা জরুরী আলোচনা আছে আপনাদের সঙ্গে। আধ ঘণ্টার মধ্যে আপনারা সবাই চলে আসুন বসবার ঘরে, ওখানেই—

তার প্রস্তাবটা সবারই বেশ মনে ধরলো, তাই সবাই মাথা নেড়ে সাই দিলেন সঙ্গে সঙ্গে।

ভেরাকে বাসন মাজার কাজে সাহায্য করতে গেলো লম্বার্ড।

এমিলিও উঠতে যাচ্ছিল তাদের সাহায্য করার জন্যে। কিন্তু পারলো না বসে পড়লো চেয়ারে কপালে হাত দিয়ে এলিয়ে দিলেন মাথাটা চেয়ারে একটা যন্ত্রণা কাতর শব্দ বেরিয়ে এলো তার মুখ দিয়ে অস্ফুটে।

ছুটে এলেন ওয়ারথ্রেভ, কি হলো মিস ব্লেন্ট।

মাথাটা হঠাৎ কেমন যেন বিমবিম করে উঠলো।

তা তো করবেই। উঠে দাঁড়ালেন আর্মস্ট্রং এক মিনিট, আমি আপনার জন্য একটা ওষুধ

খবরদার। তাঁকে বাধা দিয়ে উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠলেন এমিলি, আপনার ওষুধে আমার কোনো প্রয়োজন নেই, আপনি এখন যেতে পারেন।

এ যে বিনা মেঘে বজ্রপাত। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন ডঃ আর্মস্ট্রং। ফ্যাকাসে মুখ, চোখের চাহনিতে পরাজয়ের গ্লানি, এমিলির দিকে না তাকিয়েই স্ফোভের সঙ্গে বললেন তিনি, আমার সম্পর্কে আপনার যদি সে রকমই ধারণা হয়ে থাকে, তাহলে আমি চললাম। ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন আর্মস্ট্রং ক্লান্ত পায়ে।

তারপর একে একে সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। শুধু একা এমিলি বসে রইলেন চেয়ারে দেহটা এলিয়ে দিয়ে। বাথরুমের দিক থেকে ভেসে আসে মৃদু আলাপন এমিলির কানে ভালই হয়েছে, এখন ওঁর একটু বিশ্রাম দরকার.....।

ভো ভো ভো-ও.....?

চোখ বুজেই এমিলি ভাবেন, শব্দটা যেন মৌমাছির বলে মনে হচ্ছে। ভেরার কথা মনে পড়ে গেলো তার। চাক ভাঙ্গা মধু খেতে চেয়েছিল সে। ফোঁটা ফোঁটা মধু গড়িয়ে পড়বে মৌচাক থেকে আমার মুখে, একটু একটু করে সে মধু খেতে কতোই না তৃপ্তি, ভেবেই কত না সুখ-তখন ভেরার কথাগুলো পাগলের প্রলাপের মতো শোনাতেও এখন মনে হচ্ছে, অনুভূতি ভেরার আমার সবার। কিন্তু ও কার পায়ের শব্দ? চোখ না খুলেই আধো ঘুমের ঘোরে অনুমান করতে চেষ্টা করেন এমিলি, পা টিপে টিপে কে যেন এগিয়ে আসছে। কে, কে ও, তবে কি ও বেট্রিস?

তুমি যাও বেদ্বিস। আমি তোমার দিকে মুখ ফেরাতে চাই না। আমি তোমাকে ঘৃণা করি। কেন জান? আত্মহত্যা করে তুমি অপমান করছো ঈশ্বরকে। তোমার মতো পাপীর মুখ আমি দেখতে চাই না।

আবার সেই মৌমাছির গুণ গুন ভো, ভো, ভেও

আরে এ যে দেখছি, না ওগুলো শুনে মনে হচ্ছে মৌমাছিটা আমার খুব কাছে এসে গেছে। আমার মাথার ওপর একটা চক্র দিয়ে সেটা এখন আমার পিঠ ছুঁয়ে যাবার মতো, উড়ছে-ভো, ভো-ও-ও হুল ফোঁটাবে যা হওয়ার হোক। তবু চোখ খুলে দেখতে চাই না ওই পাপিষ্ঠার মুখ। কিন্তু হলের কি জ্বালা। শেষ পর্যন্ত মৌমাছিটা আমার দিকে ঘাড়ের ওপর হুল ফোঁটালো। উঃ তীব্র যন্ত্রণায় আমার প্রাণটা বুঝি বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো

ওদিকে বসবার ঘরে সবাই তখন অপেক্ষা করছিলেন এমিলির জন্য তাকে আসতে না দেখে অধৈর্য হয়ে ভেরা উঠে দাঁড়ালো। কই মিস্ ব্লেন্ট তো এখনো এলেন না, আমি, ওঁকে ডেকে আনতে চললাম।

গিয়ে কোনো লাভ নেই, বাধা দিয়ে বললেন ব্লোর, এতোগুলো খুনের আততায়ীকে খোঁজার আর প্রয়োজন নেই বলে মনে করি আমি। আততায়ী আর কেউ নয়, মিস এমিলি ব্লেন্ট নিজেই।

খুনের মোটিভ? তার দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকালেন আর্মস্ট্রং।

এ ধরনের খুণীর একটাই তো মোটিভ। বাতিক মশাই স্রেফ বাতিক। ধর্মের নামে বাতিক

আপনার কথা আমি অস্বীকার করবো না, জোরে জোরে মাথা নেড়ে বললেন আর্মস্ট্রং, কিন্তু কেবল মাত্র অনুমানের ওপর ভিত্তি করে কাউকে দোষী চিহ্নিত করা যায় না, তার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত প্রমাণ।

আজ সকালে তার ভাবভঙ্গি আমাদের কারোর কাছেই তেমন স্বাভাবিক বলে মনে হয়নি। ব্লোর, আরো বলেন, তাছাড়া আমরা আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রতিবাদ জানিয়েছি, নিজেদের নির্দেশিত ব্যাপারে কিছু না কিছু একটা বক্তব্য রেখেছি, কিন্তু উনি কোনো জবাব দেননি। এর থেকেই কি প্রমাণ হয় না, উনি প্রকৃতই খুণী, তাই বলার মতো কিছু ওঁর নেই।

না, এখানে আমি আপনার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না মিঃ ব্লোর, তার কথার মাঝে বাধা দিয়ে বলে উঠলো ভেরা, পরে উনি আমাকে ওঁর অতীত জীবনের সব কথাই বলেছেন। উনি নির্দোষ। এর পর এমিলি বর্ণিত বেট্রিস টেলরের কাহিনী সংক্ষেপে বললো ভেরা।

এ তো বেশ সহজ সরল কাহিনী দেখছি। এতে অবিশ্বাস করার কিছু নেই। পরোক্ষভাবে এমিলিকে সমর্থন করে বললেন ওয়ারথেন্ড, তার এই কাহিনী নিঃসন্দেহে বিশ্বাসযোগ্য বলে আমার মনে হয়। তা আপনারা কি বলেন? তারপর ঘড়ির দিকে তাকিয়েই চমকে উঠলেন এগারোটা বাজতে পাঁচ এখন? না, আর তো অপেক্ষা করা যায় না। বরং খাবার ঘরে গিয়েই আমাদের আলোচনা শুরু করা যাক। আর সেখানে মিস ব্লেন্টকেও পাওয়া যাবে, কি বলেন?

হ্যাঁ, তাই চলুন প্রায় সবাই একসঙ্গে বলে উঠলেন। সবাই তখন উঠে খাবার ঘরে চলে এলেন।

তেমনি চেয়ারে হেলান দিয়ে ঠিক একই ভাবে দেহ এলিয়ে দিয়ে বসে আছেন এমিলি। তিনি এমনি গভীর চিন্তামগ্ন যে অতগুলো লোকের পদশব্দে তাঁর চিন্তায় কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি করলো না, কিংবা ফিরে তাকাতে বাধ্য হলেন না।

তৈরি হয়েই এসেছিলেন ব্লোর, তীব্র ভাষায় আক্রমণ করবেন। এমিলিকে, তাই তিনি নিজেই উদ্যোগী হয়ে পা টিপে টিপে এগিয়ে এলেন এমিলির কাছে। নিচু হয়ে তাকে ডাকতে গিয়েই দু পা পিছিয়ে একটা বিকট চিৎকার করে উঠলেন তিনি, হায় ঈশ্বর। এ তুমি কি করলে? এতো তাড়াতাড়ি ওঁকে আমার কাছে টেনে নিলে?

আরো একটি পুতুল, উধাও হলো, রইলো মোট পাঁচ।

ডঃ আর্মস্ট্রং এগিয়ে গিয়ে মৃত এমিলির মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লেন, নাকের কাছে হাত নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করলেন, নিঃশ্বাস পড়ছে কিনা। তারপর উঠে দাঁড়ালেন গম্ভীর মুখে।

ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলো লম্বার্ড, কি ভাবে ওঁর মৃত্যু হলো ডাক্তার?

বিষ ক্রিয়ায়। ওঁর ঘাড়ের কাছে সিরিঞ্জের উঁচ। ফোঁটানোর দাগ দেখতে পেলাম।

ওদিকে জানালার শার্সিতে মৌমাছিটা আছড়ে পড়ছিলো বারবার ভোঁ-ভো, ভো-ও

ঐ তো সেই মৌমাছিটা চিৎকার করে উঠলো ভেরা বলেছিলাম না তুলের বিষে বড় জ্বালা বড় কষ্ট, তারপর পাগলের মতো শব্দ করে হাসতে শুরু করলো ভেরা।

হাতের ইশারায় তাকে থামতে বললেন ডঃ আর্মস্ট্রং আপনি খুব ভুল করছেন মিস্ ক্লেথন। মৌমাছি নয়, অন্য কোনো হিংস্র শ্বাপদ ও নয়। মানুষ, মানুষের হাতেই খুন হয়েছে মিঃ ব্লেন্ট। আমাদেরই কেউ একজন তার শরীরে বিষ ঢুকিয়ে দিয়েছেন ইনজেকশনের সিরিঞ্জ দিয়ে।

কি ধরনের বিষ হতে পারে বলে মনে হয়, আপনার?এই প্রথম কথা বললেন ওয়ারগ্রেভ।

মনে হয় পটাশিয়াম সায়ানাইড । মাস্টানের পানীয়তেও ঠিক এই বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল এই খুনী ।

কিন্তু ঐ মৌমাছিটা? ওটাকে তো আর অস্বীকার করা যাবে না । উড়ন্ত মৌমাছির দিকে তাকিয়ে থাকতে গিয়ে পলক ফেলতে ভুলে যায় ভেরা ।

ওটার সঙ্গে মিস্ ব্লেন্টের মৃত্যুর কোনো সম্পর্ক নেই । দৃঢ়স্বরে বললেন ডঃ আর্মস্ট্রং এটা খুনীর একটা চাল । মৃত্যুর প্রকৃত ঘটনাকে বদলে দেবার জন্য এক্ষেত্রে মৌমাছির সাহায্য নিয়েছে সে ।

খুনী যত চালাকই হোক না কেন শূন্যে হাত পাকিয়ে বললেন ওয়ারগ্রেভ আমাদের বিচার বুদ্ধির কাছে হার মানতে বাধ্য সে । এখন বলুন, আমাদের মধ্যে কে সঙ্গে এনেছেন ইনজেকশনের সিরিঞ্জ ।

আমি হ্যাঁ, আমিই এনেছি । চার জোড়া জ্বলন্ত চোখের চাহনি উপক্ষো করে বললেন আর্মস্ট্রং শুধু এখানে নয়, আমি যেখানেই যাই না কেন, সঙ্গে করে একটা ইনজেকশনের সিরিঞ্জ নিয়ে যাই ।

বেশ তো কোথায় আছে, সেটা একবার দেখাতে পারেন ।

কেন, আমার ঘরে সুটকেসের মধ্যে আছে ।

চলুন ওয়ারথ্রেভ তার পিঠের ওপর হাত রেখে বললেন, আপনার ঘরে গিয়ে সেটা দেখে আসা যাক।

নিঃশব্দে সাবধানে পা ফেলে ফেলে পাঁচজন উঠে এলেন দোতলায় ডঃ আর্মস্ট্রং এর ঘরে। সবার দৃষ্টি স্থির তখন আর্মস্ট্রং এর সুটকেসের ওপর। তন্ন তন্ন করে খুঁজতে গিয়ে তার ব্যবহৃত সব কিছুই পাওয়া গেলো, কিন্তু পাওয়া গেলো না কেবল সেই ইনজেকশনের সিরিঞ্জটা। ক্রোধ সামলাতে পারলেন না আর্মস্ট্রং রাগে চিৎকার করে উঠলেন, মিস ব্লেন্টকে খুন করার জন্যে নিশ্চয়ই খুনি আমার সিরিঞ্জটা লোপাট করে দিয়েছে।

ওদিকে চারজোড়া আগুন ঝরা চোখের দৃষ্টি স্থির নিবন্ধ হলো আর্মস্ট্রং এর ওপর। তারই মধ্যে যতোটা সম্ভব নিজেকে সংযত রেখে বললেন ওয়ারথ্রেভ, আমি আগেও বলেছি, আবার এখনো বলছি, খুনি আমাদেরই এই পাঁচজনের মধ্যে একজন। অর্থাৎ চারজন নিরপরাধ আর একজন অপরাধী। এ অবস্থায় এখন আমাদের সকলের উচিত যে যার নির্দোষিতা প্রমাণ করা। তারা কেন খুনি নয়, যুক্তি তর্ক দিয়ে অবশ্যই বোঝাতে হবে। নিছক কর্তব্যের খাতিরে আপনাকেই প্রথমে জিজ্ঞাসা করছি-এখন বলুন কি কি ওষুধ আছে আপনার সঙ্গে?

বলার মতো তেমন কিছু নয়-এই ধরুন কিছু ঘুমের ট্যাবলেট এক প্যাকেট ব্রোমাইড এক শিশি সোডি বাই কাব আর কয়েকটা অ্যাসপিরিন। এগুলো আছে আলমারির দেরাজে। খুলে দেখতে পারেন আপনারা।

না, তার আর দরকার হবে না। আপনার মুখের কথাই যথেষ্ট। বললেন ওয়ারথ্রেভ, ঘুমের ট্যাবলেট আমার কাছেও আছে দু-একটা। তবে কি জানেন, মাত্রারিক্ত হলে সে ওষুধ আর ওষুধ থাকে না তখন, বিষে পরিণত হয়ে যায়। যাই হোক এবার লম্বার্ডের দিকে ফিরে তিনি জিজ্ঞেস করলেন শুনেছি আপনার কাছে একটা পিস্তল আছে মিঃ লম্বার্ড?

ঠিকই শুনেছেন, কিন্তু তার জন্য কি হয়েছে।

অনেক কিছু হয়েছে, আর হতেই বা কতক্ষণ, যা সব অদ্ভুত ঘটনা ঘটে যাচ্ছে, এখানে তাই আমার বক্তব্য হলো আপনার পিস্তল, ডঃ আর্মস্ট্রং এর ওষুধের বাক্স, আর আমার কাছে যে যে ওষুধ আছে, সবগুলো একটা বিশেষ জায়গায় রেখে আমাদের প্রত্যেকের ঘরে গিয়ে তল্লাসী চালিয়ে দেখবো ডাক্তারের ইনজেকশানের সিরিঞ্জ, ম্যাকআর্থারকে খুন করার জন্য যে অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল সেটা খুঁজে পাওয়া যায় কিনা।

কিন্তু, আমি প্রথমেই বলে রাখছি, প্রতিবাদ করে উঠলো লম্বার্ড, আমি আমার পিস্তল হাতছাড়া করবে না, ওটা আমার কাছেই থাকবে।

হাতছাড়া করার প্রস্তাব তো আমি করছি না। আপনার পিস্তল সহ সব জিনিস থাকবে একটা চাবি লাগানো বাক্সে। আর সেই বাক্সটা যে আলমারিতে থাকবে, তার চাবি থাকবে আপনার কাছে। তার মানে ব্যাপারটা এই রকম দাঁড়াচ্ছে যে, আপনাদের দুজনের সম্মতি ছাড়া কেউ সেই বাক্সটা খুলতে পারবে না। কি রাজি আছেন তো?

হ্যাঁ, এতে আমার সম্মতি আছে।

তাহলে এখন বলুন, আপনার সেই পিস্তলটা কোথায় পাওয়া যেতে পারে?

আমার বিছানা সংলগ্ন টেবিলের ড্রয়ারে। এখুনি নিয়ে আসছি?

আমরাও আপনার সঙ্গে যাবো।

লম্বার্ডের ইচ্ছে নয়, ওঁদের সঙ্গে নেয়। যাই হোক, কোনো রকমে বিরক্তি ভাবটা দমন করে করিডোরের একেবারে শেষপ্রান্তের ঘরে গিয়ে ঢুকলো সে, বাকী চারজন তাকে অনুসরণ করলেন।

বিছানা সংলগ্ন টেবিলের ড্রয়ার খুলতে গিয়ে চকিতে একবার সে তাকালো সকলের মুখের দিকে, ভাবখানা এই যে, নিয়ে যাও পিস্তলটা

কিন্তু শূন্য ড্রয়ার, সেখানে পিস্তলের চিহ্ন দেখতে পাওয়া গেল না।

বিস্ময়ে সবাই হতবাক ।

কি এর পরেও পিস্তল রাখার জন্য আলাদা একটা বাক্সের প্রয়োজন হবে? শ্লেষের সুরে বলল লম্বার্ড ।

তার কথায় কেউ দ্রুতপন্থী করলো না । ভেরা তো কোনো মন্তব্য না করেই বেরিয়ে গেলো লম্বার্ডের ঘর থেকে । তবে ডঃ আর্মস্ট্রং ওয়ারথেন্ড এবং ব্লোর হাল ছাড়লেন না । নতুন উদ্দমে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখলেন লম্বার্ডের ঘর । কিন্তু শুধু পিস্তল নয়, সন্দেহজনক তেমন কোনো জিনিস বা কাগজপত্র পাওয়া গেলো না লম্বার্ডের ঘরে ।

ওয়ারথেন্ড, আর্মস্ট্রং কিংবা ব্লোর এরা কেউই রেহাই পেলেন না । এক এক করে প্রত্যেকের ঘরে তল্লাশী চালানো হলো, সন্দেহজনক কোনো কিছুই পাওয়া গেলো না । সব শেষে অভিযান চালানো হলো ভেরার ঘরে ।

ভেরা জানতো বোধ হয় । তাই সে দাঁড়িয়েছিল দরজার সামনে । ওয়ারথেন্ডের সঙ্গে তার দৃষ্টি বিনিময় হতেই মুখে সামান্য একটু হেসে তিনি বললেন, কি করবো বলুন কর্তব্যের খাতিরে আপনার ঘরেও খুঁজে দেখতে হবে । আমার কথায় আপনি হয়তো মনে মনে রাগ করেছেন । কিন্তু আমরা নাচার । কর্তব্যের খাতিরে

নীলবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো ভেরা। তারপর বাকী সকলে মিলে ভেরার ঘরে তল্লাসী চালালেন, কিন্তু তার ঘরেও লম্বার্ডের পিস্তলের কোনো পাত্তা নেই। ব্যর্থ মন নিয়ে ভেরার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ওঁরা সবাই আবার এসে ঢুকলেন বসবার ঘরে। কিছু পরে ভেরা আসতেই আলোচনা শুরু হলো।

শুরু করলেন ওয়ারথ্রেভ প্রথমে। আমাদের কারোর কাছেই কোনো মারাত্মক অস্ত্র কিংবা বিষ লুকোনো নেই। বাঁচা গেলো, এখন আমাদের কাছে যা ওষুধপত্র আছে সেগুলো একটা বাক্সে পুরে তালা লাগিয়ে বাক্সটা আলমারির ভেতরে তুলে রাখছি। তারপর বাক্স ও আলমারির চাবি দুটো ব্লোর ও লম্বার্ডের হাতে তুলে দেবো। এই কার্যকরী ব্যাপারে আপনাদের কারোর আপত্তি নেই তো?

মৌনতাই সম্মতির লক্ষণ। কাজে নেমে পড়লেন ওয়ারথ্রেভ চটপট। চাবি লাগানো হলো বাক্সে, আলমারিতে। দুজনের হাতে চাবি তুলে দিয়ে তিনি বললেন, তবে এতেই যে সমস্যার সমাধান হলো তা নয়। পিস্তল এখনো বেপাত্তা। কোথায় সেটা, কে বলবে?

একমাত্র মিঃ লম্বার্ডই বোধ হয় বলতে পারবেন। লম্বার্ডের চোখের ওপর স্থির দৃষ্টি রেখে বললেন ব্লোর।

সেই থেকে চিনে জোঁকের মতো আমার পিছনে লেগে আছেন আপনি। রাগে ফুঁসে উঠলো লম্বার্ড, বারবার বলছি, ওটা নিশ্চয়ই কেউ সরিয়ে থাকবে, কথাটা কি কানে যায় নি?

বেশ তো এখন বলুন, শেষ কখন পিস্তলটা দেখেছিলেন আপনি? প্রশ্ন করলেন ওয়ারথ্রেভ।

গতকাল রাতে উত্তরে বলল লম্বার্ড শোকের আগে পকেট থেকে বার করে টেবিলের ড্রয়ারে রেখেছিলাম।

তাহলে এই দাঁড়াচ্ছে আজ সকালেই খোঁয়া গিয়ে থাকবে ওটা।

চুরি গেলেও প্রাসাদের কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছে ওটা, মন্তব্য করলেন ব্লোর।

নাও থাকতে পারে। প্রাসাদের বাইরে কোনো গোপন জায়গায় পিস্তল সহ অন্য সব জিনিসপত্র দেখুন গিয়ে লুকিয়ে রেখেছে নিশ্চয়ই।

পিস্তলের খবর দিতে পারবো না। যেন নিজের মনে বললেন ব্লোর তবে সিরিজের হৃদিস দিতে পারি। আমার সঙ্গে চলুন আপনারা কোথায় সেটা আছে দেখাচ্ছি।

সিরিজটা পড়েছিল খাবার ঘরের জানালা বরাবর ফাঁকা উদ্যানে, আর পাশে পড়ে আছে একটা চীনে মাটির পুতুল, কালো মাণিক। পুতুলের মাথাটা খেঁতলে খুঁড়িয়ে গেছে কোনো কিছু ভারী জিনিসের চাপে।

এ সব হলো অনুমান মশাই, স্রেফ অনুমানের ওপর নির্ভর করে সিরিজটা আবিষ্কার করা, সাফল্যের হাসি ফুটে উঠলো ব্লোরের ঠোঁটে, এই খাবার ঘরেই মিস ব্লেন্ট খুন, হয়েছে একটু আগে অতএব অনুমান করে নিলাম, তাড়াতাড়ি খুনের চিহ্ন লোপাট করার জন্য ঐ জানালাটাই বেছে নিতে পারে আততায়ী, কার্যত আমার অনুমান অক্ষরে অক্ষরে মিলে যে গেলো, সে তো আপনারা নিজের চোখেই দেখতে পেলেন, কি বলেন?

হ্যাঁ, সিরিজ তো পাওয়া গেলো, তা আপনার কি ধারণা পিস্তলটা নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে তাই না? উত্তরের অপেক্ষা না করেই নিজের থেকেই ভেরা আবার বললো, একটু খুঁজে দেখি যদি সেটা পাওয়া যায়।

দাঁড়ান। হাতের ইশারায় তাকে থামাতে বাধ্য করলেন ওয়ারথ্রেভ, আপনি একা একা যাওয়ার মতো এমন মারাত্মক একটা ভুল যেন কখনোই করবেন না। চলুন, আজ আর আপনি একা নন। আমরাও আপনার সাথে আছি, ছিলাম এবং ভবিষ্যতেও থাকবো, দেখি কি করতে পারি আপনাদের জন্য।

তল্লাসীর কাজ চললো প্রায় আধঘণ্টা ধরে। তবে সুবই পণ্ড্রমে পরিণত হলো। কোনো হদিশ পাওয়া গেলো না সেই রিভলবারের।

১৩.

প্রাসাদের বাকী পাঁচজন অতিথি এখন কেউ আর কাউকে যেন বিশ্বাস করে না। পরস্পরের মধ্যে একটা অবিশ্বাসের দানা বাঁধতে শুরু করলো তারপর থেকে। সবাই সবার চোখে খুনী হিসেবে প্রতিপন্ন হতে চলেছে। কেউ কারোর প্রাণ খুলে কথা বলতে চায় না, সবাই সবার কাছে কি যেন হারানোর কথা সাহস করে কেউ বলতেও চায় না, যদি তাদের মধ্যে যেই খুনী হোক না কেন, আচমকা আক্রমণ করে বসে, সেই ভয়ে। সেই নিগার দ্বীপের পাঁচজন অতিথি কার্যতঃ এখন দীপান্তরিত যেন। মৃত্যু ভয়ে আতঙ্কিত। এমন সময় আসে নি বোধ হয় কোনো দিন এর আগে তাদের জীবনে।

ওয়ারথেন্ড এমনিতেই বয়সের ভারে নুইয়ে পড়েছিলেন, তার ওপর আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কায় চব্বিশ ঘণ্টায় তার বয়স যেন আরো বেড়ে গেছে। সব সময় চোখ বন্ধ করে থাকেন তিনি। তাঁর ভয়, চোখ খুললেই যদি আবার কারোর মৃতদেহ দেখতে হয়। কান খাড়া করে রাখতে সাহস পান না যদি আবার কোনো দুঃসংবাদ শুনতে হয়।

সব থেকে করুণ অবস্থা হলো ব্লোরের, মৃত্যু ভয়ে সিটিয়ে আছে সে সব সময়ে। রাতে ঘুম নেই, কোটরাগত চোখ।

ভেরাও যেন কেমন গুম মেরে বসে থাকে সব সময়। কথা বলার সাহস সেও কেমন হারিয়ে ফেলেছে। মৃত্যুর প্রহর গুণতে চায় সে নীরবে নিভৃতে। গোপনে সংগোপনে চলে তার অন্বেষণ, খুনীকে খুঁজে বার করার।

আর আর্মস্ট্রংকে তো মনের দিক থেকে ভয়ঙ্কর ক্লান্ত অবসন্ন দেখাচ্ছিল। ঠায় বসে আছেন চেয়ারে, টেনে যাচ্ছেন একটার পর একটা সিগারেট! ওঁদের মধ্যে কেবল লম্বার্ডকে একটু ভিন্ন প্রকৃতির বলে মনে হলো। ভয় যে সেও কম পায় নি ঠিক তা নয়, তবে এ অবস্থায় তার বুদ্ধি বিভ্রম এখনো হয়নি। চোখ কান খুলে রেখেছে। কোথাও সামান্য শব্দ হলেই ছুটে যাচ্ছে। তারই মাঝে জনে জনে খোঁজ খবর নিচ্ছে, ভরসা দিচ্ছে ভয়ের কিছু নেই, আপনাদের পাশেই আছি আমি।

ওদিকে বেলা বেড়ে চলে যতো, ততোই যেন চল হয়ে ওঠেন আর্মস্ট্রং। সিগারেটে শেষ টান দিয়ে বলে উঠলেন, আসন্ন মৃত্যু ভয়ে এভাবে নিজেদেরকে গুটিয়ে রাখাটা বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না, শুধুই চলে যাচ্ছে সময়। তাই বলি কি সময়টাকে আরো রেখে যদি কিছু একটা করা যায়

কি করা যায়? কিই বা করা যেতে পারে। শুরু হল আর এক প্রথ আলোচনা। এক একবার এক একজন বক্তা, বাকী চারজন তখন নীরব শ্রোতা। দীর্ঘ আলোচনার পর একটা সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছলেন তারা। বাইরে কেউ বেরুবে না একান্ত প্রয়োজন ছাড়া। যদি বা কেউ বেরোয়, বাকী চারজন অপেক্ষা করবে, তার ফিরে না আসা পর্যন্ত।

তোফা! তোফা! হাততালি দিয়ে উঠলো লম্বার্ড, এমন ভাল প্রস্তাব, বুঝি আর হয় না। এ ভাবেই আমরা কাটিয়ে দিতে পারবো কয়েক ঘন্টা। তারপর নিশ্চয় বৃষ্টি থামবে। তখন না হয় নতুন উদ্যম নিয়ে এ দ্বীপ থেকে আমাদের উদ্ধার করার জন্য এখান থেকে সংকেত পাঠাবার ব্যবস্থা করা যাবে। আর কেউ যদি লঞ্চে সমতে উদ্ধার করতে না আসে, তখন নিজেরাই না হয় একটা ডিঙি নৌকা তৈরী করে তাতে চেপে বসবো সকলে, তারপর ভেসে চলবো নিশ্চিত জীবনের আশায়।

কিন্তু সেই সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকলে তবে তো? আর্মস্ট্রং এর মনে গভীর সংশয়।

আলবাৎ থাকবো। দৃঢ়স্বরে বললেন ওয়ারগ্রেভ, চোখ কান খুলে রাখলে মৃত্যু আশঙ্কার কোনো কারণ নেই।

তারপর আবার সবাই নীরবে তলিয়ে গেলেন চিন্তার অতলে। সবার সেই একটাই চিন্তা কি করে জয় করা যায় মৃত্যুকে। মৃত্যু ভয়কে। তবে এঁদের মধ্যে একজন ব্যতিক্রম, মৃত্যু ভয় তার নেই, মৃত্যুর উর্ধ্বে সে, তার ভয় চারজোড়া চোখ কি করে ফাঁকি দিয়ে কাজ হাসিল করা যায়, সন্দেহ এড়ানো যায়.....।

...আমার সন্দেহ আর্মস্ট্রংকেই। ঐ লোকটা আগের চার চারটে খুনের জন্য দায়ী, তবে ব্যাটা অভিনয় ভালই জানে দেখছি। কেমন একটার পর একটা খুন করে, এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন তার কতোই না চিন্তা আমাদের আসন্ন মৃত্যু ভয়ে। কি অদ্ভুত তার চাহনি। ঘোলাটে, উদভ্রান্ত ভাব। এতোগুলো খুন করার পর লোকটা পাগল হয়ে গেলো নাতো।

না, না হয়তো এটাও তার একটা অভিনয়। হ্যাঁ, অভিনয় নয় তো কি? ব্যাটা একটা মিট মিটে শয়তান, দাগী খুনী.....।

.....খুনী, তুমি যতো চালাকই হও না কেন, আমাকে তুমি বোকা বানিয়ে তোমার কাজ হাসিল করতে পারবে না। হয়তো এখন একটু বেকায়দায় পড়েছি, তবে এর থেকেও আরো বেশি কঠিন বিপদের মুখোমুখি হতে হয়েছে এর আগে। সে বিপদ যখন ঠিক কাটিয়ে উঠতে পেরেছি, তখন কেন অহেতুক ভয় করতে যাবো তোমাকে?, কিন্তু ঐ পিস্তলটা? গেলোই বা কোথায়? নিয়েছে আমাদেরই মধ্যে কেউ একজন, তার ঠিকানা কি, কে বলতে পারে...।

....ওরা সবাই অহেতুক ভয় পাচ্ছে, মৃত্যু ভয় দেখাচ্ছে আমাকে। কিন্তু আমি যে আরো কিছুদিন বাঁচতে চাই, এতো তাড়াতাড়ি মরলে আমরা অনেক কাজই যে অসমাপ্ত থেকে যাবে.....

.....মৃত্যু ভাসে বাতাসে। এখনকার বাতাসে ছড়িয়ে আছে মৃত্যুর বীজ। যে কোনো মুহূর্তে সেই বীজ বপন হতে পারে আমরা শরীরে....

.....সহজে কি মৃত্যুকে এড়ানো যাবে? যত সতর্কই হই না কেন, হয়তো মৃত্যুকে ঠেকাতে পারবো না। ঐ শূনি মৃত্যুর পদধ্বনি.....

.....এখনো পাঁচটা বাজতে কুড়ি মিনিট। সময় যেন আর কাটতে চায় না। ঘড়িটা কি বন্ধ হয়ে গেছে? না ঐ তো কাঁটাগুলো ঠিকই তো চলছে টিক, টিক, টিক। মৃত্যুর পরোয়ানা জাহির করতে হবে। মাথায় এক সর্বনাশা আগুন জ্বলছে, বুকের ধুকধুকানি। শেষ বিচারের দিন আসন্ন। কেউ সন্দেহ করেনি তো? এ ব্যাপারে নিশ্চিত বলা যায়। তা সত্ত্বেও আরো বেশী সতর্ক হতে হবে। কিন্তু, এর পর কাকে যেতে হবে? বিচারের রায় কার কার বিরুদ্ধে যাবে....

পাঁচটা বাজতেই উঠে দাঁড়ালো ভেরা, চা করতে চললাম।

দাঁড়ান। হাত নেড়ে বললেন ওয়ারথ্রেভ, আমরাও যাবো আপনার সঙ্গে। দেখবো কেমন করে আপনারা চা তৈরী করেন। তারপর নিজের মনেই বললেন তিনি, একা ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না, সাবধানের মার নেই।

চায়ের আয়োজন হলেও তা না খেয়ে গ্লাসে হুইস্কি ঢাললেন ওয়ারথ্রেভ, ডঃ আর্মস্ট্রং এবং ব্লোর।

ততধিক অন্ধকারের ছায়া নামলো লম্বার্ডের মুখে, রগার্স নেই, জেনারেটর চালানো হয়নি, তার মৃত্যুর পর কারোর খেয়ালও হয়নি।

বসবার ঘরে কয়েকটা মোমবাতি দেখে এসেছি, বললেন ওয়ারথ্রেভ, নিয়ে আসি, ওগুলো দিয়ে কাজ চালানো যাবে আপাতত।

দেখতে দেখতে ছটা কুড়ি বেজে গেলো ।

ভেরার কপালে তীব্র যন্ত্রণা । তার মাথায় কেউ যেন একরাশ বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে, বাথরুমে গিয়ে খুব করে মাথায় জল ঢেলে বোঝাটা হাল্কা করার জন্য উঠে দাঁড়ালো ভেরা । সঙ্গে একটা মোমবাতি নিতেও ভুলল না সে ।

বাথরুমে ঢুকতে গিয়ে তার নাকে ভেসে এলো একটা গন্ধ, সমুদ্রের লোনা জলের গন্ধ । তবে কি গোটা সমুদ্রটাই উঠে এলো বাথরুমে, ভেরা ভাবে

তার সেই ভাবনা ছাপিয়ে যেন ভেসে এলো তার কানের কাছে একটি শিশুর কণ্ঠস্বর—
আন্টি, আমি সাঁতার কাটবো আমাকে সমুদ্রে নিয়ে চলো । নিয়ে চলো না আমাকে ।

পরমুহূর্তেই অনুভব করলো সে, কার যেন নিঃশ্বাসের শব্দ ঠিক ঘাড়ের কাছে । চমকে পিছন ফিরে তাকালো সে, না, কেউ তো নেই । তাহলে তার মনেরই ভুল সমুদ্রের নোনা গন্ধে মনটা কেমন ওলট পালট হয়ে গেছে ।

তার মনটা তখনো যেন একটা কাল্পনিক জগতে ভেসে বেড়াচ্ছিল—অশান্ত সমুদ্র ফেনিল নীল জলরাশি, বাতাসে শীতের তীক্ষ্ণতা, ঝড়ের দাপটে ঢেউগুলো তীরে এসে জলের স্রোতে ঢুকে পড়েছে বাথরুমে । জলের সেই কলকল শব্দ ছাপিয়ে তার কানে ভেসে

আসছে কার যেন পায়ের শব্দটা, ঠিক তার পিছনে এসে থামলোকে হ্যাঁগো তুমি? কিন্তু তুমি তুমি এখানে এলে কি করে হুগো? আমি যে তোমাকে

কিন্তু কে কোথায়? এবারেও আমার দেখার ভুল, শোনার ভুল। হুগো কি করেই বা আসবে এখানে। সে তো এখন আমার কাছে অতীতের স্মৃতি বই আর কিছু নয়। অতীত কি কখনো জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে?

তবু, তবু কেন আমি তোমার হাতের স্পর্শ অনুভব করছি হুগো? আমার পিঠে তোমরা হাত বিলি কাটছে, যেন তুমি আমাকে আদর করছো, তোমার হাতের স্পর্শটা আমার শিরদাঁড়া বেয়ে ওপরে উঠে আসছে। কিন্তু তোমার হাত তো কখনো লোমশ ছিল না।

হঠাৎ কথাটা মনে হতেই প্রচণ্ড ভয়ে, আতঙ্কে জোরে চিৎকার করে উঠল ভেরা।

তার অতি চিৎকার শুনে ওঁরা তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এলেন। লম্বাডুই প্রথমে লাথি মেরে দরজা ভেঙ্গে ফেললো। অন্ধকারে কিছুই চোখে পড়ে না। বাথরুমে ঢুকে ভেরার উদ্দেশ্যে ডেকে উঠলো সে, আপনি কোথায় মিস্ ভেরা? ভয় নেই, এই তো আমরা এসে গেছি। কি হয়েছে আপনার?

ভেরার হাত থেকে মোমবাতিটা পড়ে গিয়ে নিভে গেছে। অন্ধকারে ডুবে আছে বাথরুম। টর্চের আলো ফেললো লম্বাডুই। মেঝের ওপর থেকে মোমবাতিটা কুড়িয়ে নিয়ে আবার জ্বালালো। লম্বাডুইর ডাকাডাকিতে এক সময় ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকালো ভেরা।

প্রথমেই তার চোখ পড়লো ছাদের ওপর। আর সঙ্গে সঙ্গে আবার সে আত্ননাদ করে উঠলো, ওটা, ওটা কি?

ভেরার দেখা দেখি তারাও তাকালেন ছাদের দিকে-ছাদ থেকে সাপের মতো ঝুলছে একটা সামুদ্রিক শেওলা। আর সেটাই খানিক আগে ভেরার পিঠ স্পর্শ করলে তার মনে হয়ে থাকবে কারোর নোমশ হাত বুঝি।

সেটা বুঝতে পেরেই সহসা উন্মাদিনীর মতো শব্দ করে হাসতে শুরু করে দিলো ভেরা, সমুদ্র ঢুকে পড়েছে বাথরুমে, ঘর ভর্তি নীল জল-

ভেরার অমন অবস্থা দেখে ছুটে গিয়ে নিচ থেকে ব্র্যান্ডির একটা ভোলা বোতল নিয়ে এলেন ব্লোর। এগিয়ে গিয়ে ভেরার মুখের কাছে বোতলের মুখটা তুলে ধরতেই ঝাঁপিয়ে পড়লো লম্বার্ড র ওপর, হ্যাঁচকা টান দিয়ে তার হাত থেকে বোতলটা কেড়ে নিলো সে। কিছুতেই খেতে দেবো না। না, কিছুতেই না।

অনুযোগ করলেন ব্লোর, ব্র্যান্ডিটা সন্দেহ করার কিছু ছিলো না।

কি করে বুঝলেন? প্রশ্ন চোখে তাকালেন আর্মস্ট্রং হয়তো আপনি নন, অন্য কেউ তো বোতলে বিষ মিশিয়ে দিয়ে থাকতে পারে। ওপর থেকে দেখে সেটা বোঝার কি উপায় আছে বলুন?

সেই সময় লম্বার্ড এসে ঢুকলো হাতে তার নতুন একটা ব্র্যান্ডির বোতল । ভেরার চোখের সামনে বোতলটি দেখিয়ে হাসলো সে, দেখে রাখুন, একেবারে ব্র্যান্ড নিউ ।

সীলমোহর করা ছিপি খোলা হলো, ঢালা হলো ব্র্যান্ডি একটা গ্লাসে । তারপর গ্লাসটা তুলে ধরা হলো । ভেরার মুখের সামনে । এর চুমুক খেয়েই মুখ ফিরিয়ে নিলো সে । তৃষ্ণা মিটে গেছে তার । মুখ থেকে সরে গেছে সেই ভয়াবহ ভাবটা ।

আত্ম বিশ্বাসের হাসি ফুটে উঠলো লম্বার্ডের ঠোঁটে, ভাগ্য ভাল মিস্ ক্লেথর্নের, মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে এলেন তিনি ।

আমার আনা ব্র্যান্ডিটাও কিন্তু ভালো ছিলো বিষমুক্ত, আবার বললেন ব্লোর ।

সুস্থ হয়ে ওঠার পরেই কি খেয়াল হলো ভেরার, এদিক ওদিক তাকিয়ে বলে উঠলো সেও, মিঃ ওয়ারথ্রেভ কোথায়, তাকে তো দেখছি না-কেন?

সত্যিই তো, আমরা সবাই এলাম, কিন্তু তিনি, তিনি এলেন না তো ।

বড় ভাবনায় ফেললেন তিনি । চলুন, তাড়াতাড়ি নিচে গিয়ে দেখি, উনি কোথায়, কি করছেন ।

এরকম ছুটেই সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলেন সবাই। তারপর সোজা হলঘরে, আর্মস্ট্রং প্রথমে তার নাম ধরে ডাকলেন। কিন্তু কোনো সাড়া শব্দ নেই। আবার ডাকলেন, শুনছেন মিঃ ওয়ারথেন্ড, কোথায় আপনি? সাড়া দিন। এবারেও কোনো উত্তর নেই।

সবাই তখন ছুটলেন বসবার ঘরে। ঢোকের মুখেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন আর্মস্ট্রং, তীব্র আতর্নাদ করে উঠলেন।

কাছে গিয়ে তার দেখতে হলো না। দূর থেকেই সবাই দেখলেন, চেয়ারে বসা ওয়ারথেন্ডের মাথাটা ঝুলে পড়েছে ডান দিকে। পরনে বিচারকের পোষাক, মাথায় পরচুলা, কপালে ক্ষতচিহ্ন, ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝড়ে পড়ছিলো তখনো সেখান থেকে। নিশ্চয় দেহ। পরীক্ষা না করেই বোঝা গেলো, বৃদ্ধ আর জীবিত নেই।

নিয়ম রক্ষার জন্য এগিয়ে গেল ডঃ আর্মস্ট্রং। নিচু হয়ে নাড়ি টিপলেন স্পন্দনহীন। উঠে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন তিনি সব শেষ। গুলি বিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন তিনি।

গুলি, চমকে উঠে লম্বার্ডের দিকে তাকালেন ব্লোর, তাহলে শেষ পর্যন্ত পিস্তলটার হদিস পাওয়া গেলো।

এবার গুলি গুলি পায়ে এগিয়ে এসে ওয়ারথেন্ডের মাথা থেকে পরচুলা তুলে নিতে গিয়ে অবাক হলো ভেরা, এ যে দেখছি মিস্ ব্লেন্ডের হারানো উল কেটে তৈরী পরচুলা।

আর বুকের ঐ যে আলখাল্লায় আঁটা ফিতেটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, বললেন ব্লোর, ওটা বাথরুম থেকে উধাও হওয়া পর্দা দিয়ে তৈরী।

মৃত ওয়ারথ্রেভের দিকে তাকিয়ে আপন মনে সেই কবিতাটা থেকে আবৃত্তি করে উঠলো লম্বার্ড, পাঁচটি কালোমানিক গেলো আদালতে দিতে বিচারে মন, একটি গেলো কারাগারে ফিরলো বাকী চারজন।

হ্যাঁ, এই পৃথিবীটাই তো ঈশ্বরের আদালত। বিচারক স্বয়ং ওয়ারথ্রেভই। নিজের এজলাসে তিনি নিজেই মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিলেন। ভবিষ্যতে আদালতে তার মুখ থেকে আর কোনো খুনী আসামীর ফাঁসির দণ্ডদেশ শোনা যাবে না। আজই তার শেষ বিচার, শেষ রায় দেওয়া, যে রায়ে নিজের মৃত্যুবরণ করলেন বিচারক ওয়ারথ্রেভ।

লম্বার্ডের চোখে স্থির দৃষ্টি রাখল ভেরা, অবিশ্বাসের চাহনি, কথায় বিদ্রূপের সুর আজ সকালে আপনি আপনার সন্দেহের কথা প্রকাশ করে বলেছিলেন, ঐ ওয়ারথ্রেভই নাকি খুনী, উন্মাদ, আগের পাঁচটি খুনের জন্য দায়ী। এর পরেও কি আপনার সেই সন্দেহটা বলবৎ থাকবে মিঃ লম্বার্ড?

১৪.

তারা চারজন ধরাধরি করে ওয়ারগ্রেভের মৃতদেহ দোতলায় তুলে নিয়ে এসে তার ঘরের বিছানায় শুইয়ে দিলো যত্ন সহকারে। সেখান থেকে ফিরে সবাই হলঘরে। আবার সেই আলোচনা-অতঃ কিম-

ওদিকে খিদেও খুব পেয়েছিল সকলের। মুখ-আঁটা চারটে টিনের খাবার আনা হলো রান্নাঘরে থেকে। টিনের মুখ কেটে খেতে শুরু করলেন সবাই। খেতে গিয়ে মন্তব্য করলো ভেরা অদ্যই শেষ রজনী! হয়তো এটাই আমাদের শেষ খাওয়া।

তার মুখের কথাটা লুফে নিয়ে বললেন ব্লোর, কিন্তু আমি, ভাবছি এবার কার পালা?

অনিচ্ছা সত্ত্বেও হাসলেন ডঃ আর্মস্ট্রং, ওসব অলুক্ষণে কথা না বলে আরো বেশী সতর্ক হওয়ার চেষ্টা করুন আপনারা। সাবধান হলে

তার আসমাণ্ড কথার জের টের এবার ব্লোর তার বক্তব্য রাখলেন, যিনি ছিলেন আমাদের প্রধান পরামর্শদাতা, সব সময় সতর্ক থাকার কথা বলতেন আমাদের, তিনিই আজ অসাবধানতার শিকার হলেন।

কিন্তু কি ভাবে এই এমন একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটলো?

খুব সহজ পথেই। ব্যাখ্যা করলো লম্বার্ড, এ সব খুণীর চালাকী, আগে থেকে বৃদ্ধ ওয়ারথের ওপর থেকে আমাদের নজর অন্যত্র ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য ফাঁদ পেতে ছিল সে মিস্ ক্লেথনের বাথরুমে সংলগ্ন ঘরে শেওলা ঝুলিয়ে রেখে। দু-এক দু-চোর এর মত শেওলাটা সাপ ভেবে চিৎকার করে উঠতেই আমরা তার ঘরে ছুটে যাই ওয়ারথের ছাড়া, ঘটনার আকস্মিকতায় আমরা একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম ওয়ারথের কথা। তার সুযোগ নেয় আততায়ী তার পূর্ব পরিকল্পিত কাজ হাসিল করে।

তা না হয় হলো, কিন্তু গুলির আওয়াজ? সেটা কেন আমাদের কানে এলো না?

আসবে কি করে? বাইরে তীব্র ঝড়ো বাতাসের আওয়াজের সঙ্গে মিস্ ক্লেথনের চিৎকারের শব্দে গুলির আওয়াজটা চাপা পড়ে যায়।

তা সেই খুণী শয়তানটা আমাদের চারজনের মধ্যে একজন না হয়ে যেতে পারে না, সকলের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে ছাদের দিকে তাকিয়ে অন্যদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন রাখলেন আর্মস্ট্রং কে, কে হতে পারে সে?

আমি বলতে পারি সবজান্তার হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেলো ব্লোরের ঠোঁটে।

আপনি? ভেরার দিকে ফিরে তাকালেন আর্মস্ট্রং আপনি কিছু জানেন মিস্ ক্লেথন?

না, জানি না। ঘাড় নাড়লেন মিস ক্লেথর্ন। এ প্রসঙ্গে আমিও একজনকে আন্দাজ করেছি।
কারোর দিকে না তাকিয়েই বললেন আর্মস্ট্রং।

আরো একটু খোলসা করে বললো লম্বার্ড, আর আমি তো একজনকে প্রায় চিহ্নিতই করে
ফেলেছি, এখন তাকে হাতে নাতে ধরার যা অপেক্ষা।

মন ভাল নেই ঘুমও পাচ্ছে, উঠে দাঁড়ালো ভেরা, আমি এখন শুতে চললাম।

তারপর একে একে সবাই উঠে পড়লেন। সবার শেষে উঠলেন ডঃ আর্মস্ট্রং, তার
কণ্ঠস্বর কেমন যেন ভারী ভারী শোনালো, হ্যাঁ ঘুমের মধ্যেই নিহিত আছে এক অপার
শান্তি, অনন্ত সুখের সম্ভাবনা

আর সেই সুখ, সেই শান্তির সন্ধানে নিঃশব্দে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন যে যার ঘরের
দিকে।

ভাল করে দরজা বন্ধ করলো লম্বার্ড। ঘরের ভেতর থেকে দরজা ঘেঁষে লোহার চেয়ারটা
রাখতে ভুললো না, দরজা ভাঙতে গেলে লোহার চেয়ারে আওয়াজ হতে বাধ্য, আর
তাহলেই তার ঘুম ভেঙ্গে যাবে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভাবতে বসলো সে। এ এক
উটকো ঝামেলায় পড়া গেলো। দুদিনে ভয়ে আতঙ্কে শরীরটা যেন একেবারে পঙ্গু হয়ে
গেছে। এর শেষ কোথায় দেখা যাক।

পোষাক বদল করে বিছানায় শুতে যাবে, হঠাৎ পলঙ্ক সংলগ্ন টেবিলের ড্রয়ারের দিকে তার চোখ পড়তেই অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো লম্বার্ড অনেকক্ষণ, অবিশ্বাস্য। ড্রয়ারের বাঁদিকে পড়ে রয়েছে তার হারানো পিস্তলটা.....সেই মুহূর্তে তার চোখ থেকে উধাও হয়ে গেলো রাতের ঘুম।

ওদিকে ভেরার চোখে ঘুম নেই। মোমের আলোর দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে ভাবছে সে এখন, এখানে মৃত্যুর হাওয়া, নিঃশ্বাসে বিষ, দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম, তবু এরই মধ্যে রাতটুকুই যা নিরাপদ। চার দেওয়ালের এই নিরাপদ বেষ্টিত মধ্য একবার ঢুকে পড়তে পারলেই হলো, এখানে মৃত্যুর পদধ্বনি শোনা যাবে না, বিষ মুক্ত বাতাসে বুক ভরে নিঃশ্বাস নেওয়া যায়। এখন অন্ধকারই ভাল লাগে, বেশী নিরাপদ বেষ্টিত মধ্য একবার ঢুকে পড়তে পারলেই হলো, এখানে মৃত্যুর পদধ্বনি শোনা যাবে না, বিষ বেশী নিরাপদ বলে মনে হয়। এখন আলো দেখলেই আতঙ্কে বুক কাঁপে, বাইরে বেরুলে আলোয় গায়ে কাঁটা দেয় এক অজানা ভয়ে।

মোমের এই সামান্য আলোটুকু এখন আমার চোখে যেন একটা নরম উয় স্পর্শে রাখে, ভাল লাগে সেই অনুভূতিটা, ভুলে থাকা যায় অতীতের সেই কলঙ্কময় স্মৃতি। স্বপ্ন হলেও মোমের আলোয় আলোকিত ঘরখানি, সে আলোয় স্পষ্ট ঘরের সব কিছু দেখা যাচ্ছে, দরজা জানালা, আসবাবপত্র, সব কিছুই। এক এক করে দৃষ্টি পরিক্রমা শেষে তার চোখ গিয়ে বিদ্ধ হয় ছালের ওপর। আর তখনি তার আর এক দফা চমকানোর পালা-আরে ওটা কি সত্যিই সাপ নাকি?

কিন্তু ভালো করে তাকাতে গিয়ে দেখা গেলো ওটা সাপ নয়, লোহার হুক। ঐ হুকে পাখা ঝুলানো হয়। কিন্তু কি ব্যাপার, এর আগে ওটা তো চোখে পড়েনি একবারও, আর আজই বা হঠাৎ দৃষ্টিগোচর হলো কেন।

আর হুকটাই বা এলো কোথা থেকে? হকের তো মানুষের মতো হাত পা নেই। নিশ্চয়ই আমাদের মধ্যে কেউ না কেউ ওটা লাগিয়ে থাকবে। কিন্তু কি উদ্দেশ্যেই বা...

শত চেষ্টা সত্ত্বেও ঘুমের সঙ্গে আর বোঝাপড়া হলো না ব্লোরেরও, তবে চার দেওয়ালের বন্ধ ঘরে অনেক বেশী নিরাপদ বলে মনে করলেন তিনি।

নিশ্চিত হয়ে তিনি এবার ভাবতে বসলেন ওয়ারথ্রেনের কথা। লোকটার ওপর অনেক অভিশাপ ছিলো, তার মৃত্যুতে কারোর কোনো দুঃখ থাকার কথা নয়, আপদ গেছে। অনেক লোককে বিচারের নামে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়েছে সে, মরে সে তার পাপের পায়শ্চিক্ত করেছে।

পিস্তলটাই বা গেলো কোথায়? সেই পিস্তলই দিয়েই কি ওয়ারথ্রেনের কপাল ফুটা করা হয়েছে। যাই হোক ওয়ারথ্রেনের আততায়ীই যে পিস্তল চুরি করেছিলো, তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই।

তঁর ভাবনায় বাধা পড়লো ঢং ঢং করে পেটা ঘড়িতে বারোটোর আওয়াজ হতে। তার মানে সকাল হতে এখনো ছ ঘণ্টা বাকী। এই ছ ঘণ্টা নিশ্চিত কাটানো যাবে। সকাল হলেই তো আবার মৃত্যু ভয়।

অযথা মোমবাতিটা পুড়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কাল যদি বেঁচে থাকি, যদি মৃত্যু আমাকে স্পর্শ না করে, কিংবা আমার প্রতি করুণা করে আর একটা দিন বেঁচে থাকার অনুমতি দেয়, তাহলে কাল রাতে আবার মোমবাতির প্রয়োজন হবে। কথাটা ভাবা মাত্র ফুঁ দিয়ে মোমবাতিটা নিভিয়ে দিলেন ব্লোর। ঘরের মধ্যে এক বুক অন্ধকার নেমে এলো। ছায়া ঘন অন্ধকার।

সেই আলো আঁধারিতে মনে হলো কারা যেন ঘরের মধ্যে চলা ফেরা করছে। ওরা কারা? এসে দেখছি মিসেস রগার্স আর মাস্টার্ন। বাঃ কি ভাবে দুজনে কেমন হাত ধরাধরি করে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে গিয়ে মিলিয়ে গেলো দেওয়ালের সঙ্গে। আচ্ছা, ওরা কি বুঝতে পেরেছে, আমি জেগে আছি, ওদের অমন সহজ সাবলীল ভঙ্গিমা দেখে আমি অবাক হয়েছি? আর সেই জন্যই কি লজ্জা পেয়ে মুখ লুকালো ওরা। কি জানে—

কিন্তু তুমি আবার কে এসে হাজির হলে বাপু? আমার দিকে একবার মুখ ফেরাও দেখি, দেখি তোমার মুখখানি, আমার নয়ন সার্থক করি।

আমার কথা শুনলো সে, সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফেরালো আমার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলাম। ল্যান্ডার তুমি? কিন্তু তুমি এখানে এলে কি করে। তুমি তো আমার কাছে

অতীত এখন, অতীতের পুরনো ইতিহাস। তুমি কি সেই ইতিহাসের পাঠ শেখাতে এসেছে আমাকে? বলো, তাড়াতাড়ি বল কি বলতে চাও। আমার সময় বড় অল্প। এখানে এখন মৃত্যুর হাওয়া বইছে, সে কোনো মুহূর্তে খুন হয়ে যেতে পারি আমি। অতএব

কি বললে? তোমার স্ত্রী পুত্রের খবর নিতে ছুটে এসেছে আমার কাছে। তুমি আর লোক পেলে না। ওদের খবর আমি রাখতে যাবো কেন? দেখ গিয়ে এতদিনে হয়তো তাদের ভবলীলা সাক্ষ হয়েছে।

কিন্তু পিস্তলটা গেলো কোথায়? কে কে নিতে পারে সেটা?

ছেদ পড়ল তার ভাবনায়। হঠাৎ কান খাড়া হয়ে উঠলো তার। এক জোড়া পায়ের শব্দ হেঁটে বেড়াচ্ছে বারান্দায়, অতি সন্তপণে পা ফেলছে। কিন্তু এতো রাত্রে কার এমন দুঃসাহস হলো ঘরের বাইরে বেরুবার? তবে কি সেই খুনিটা হা, খুনিই নিশ্চয়। তার আবার মৃত্যুভয় কিসের।

একসময় সেই ভুতুড়ে শব্দটা থামলো। তবু কান পেতে রইলেন ব্লোর। না আর কোন শব্দ শোনা যাচ্ছে না, শুধু বাতাসের দাপাদাপি, সেই ঝড়ো বাতাসের হাওয়া লেগে থাকবে প্রাসাদের কোনো ঘরে। দরজার পাল্লা, পালা করে একবার খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে।

তারপরেই আবার শোনা গেল একটা শব্দ। এবার যেন আগের চেয়ে অনেক ধীরে, পায়ের আওয়াজ অনেক মৃদু। শব্দটা যেন আর্মস্ট্রং এর ঘরে, লম্বার্ডের ঘর পেরিয়ে থামলো আমার ঘরের সামনে এসে। তাহলে

নিঃশব্দে বিছানা থেকে নেমে দ্রুত হাতে দরজা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন ব্লোর। চারদিকে সন্ধানী দৃষ্টি বোলালেন, কিন্তু সন্দেহজনক কিছুই চোখে পড়লো না। তবে এবার মনে হলো, শব্দটা নিচের হলঘর পেরিয়ে প্রাসাদের প্রধান গেটের দিকে এগুচ্ছে। নিচে নামতে গিয়েও নামলেন না তিনি। কে জানে, তাকে ঘর থেকে টেনে বার করে আনার জন্য খুনির এটা একটা চাল কিনা। যাই হোক। তার দৃষ্টি এখন ঘাটের দিকে। হঠাৎ তিনি যেন দেখতে পেলেন, গেট পেরিয়ে কে যেন ছুটে প্রাসাদের বাইরে পালিয়ে গেলো। হুঁশ হলো ক্লোরের। এখন আর চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই সব অদ্ভুত কাণ্ডখারখানা একা একা দেখা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। এখন একটা কিছু করা দরকার। হয়তো এখুনি ছুটে গেলে আগন্তুক তথা আততায়ীকে খুঁজে বার করা যেতে পারে। খুব বেশী দূরে যেতে পারেনি বলেই মনে হয়।

ছুটে গেলেন তিনি আর্মস্ট্রং-এর ঘরের সামনে। জোরে জোরে দরজায় ধাক্কা মারলেন তিনি, তার উদ্ভিন্ন কণ্ঠস্বর রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে খান খান হয়ে পড়লো-শুনছেন মিঃ আর্মস্ট্রং। আপনি যদি ঘরে থাকেন তো একেবারেই জন্য বাইরে বেরিয়ে আসুন।

উত্তর নেই আর্মস্ট্রং এর।

দ্বিতীয়বার ডাকলেন, তৃতীয় বারেও কোনো সাড়া পাওয়া গেলো না। আর নয়, এবার তিনি ছুটে চললেন লম্বার্ডের ঘরে। জোরে জোরে দরজায় ধাক্কা দিলেন। দরজা খুলে গেলো। লম্বার্ডকে দরজার ওপারে দেখতে পেয়েই হাঁপাতে হাঁপাতে বলে উঠলেন ব্লোর, অনেক ডাকলুম, কিন্তু আর্মস্ট্রংকে ঘরে পেলাম না। একটা ব্যবস্থা নিতে হয়, বাইরে আসুন আলোচনা করা যাক।

বাইরের পোষাক গায়ে চাপিয়ে একটু পরেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলো লম্বার্ড।

পাশের ঘরটা ভেরার। দরজায় একবার মাত্র ধাক্কা দিতেই সাড়া মিললো। নিচু গলায় তাকে সতর্ক করে দেওয়ার জন্য বললেন ব্লোর, ঘর থেকে একদম বেরুবেন না মিস্ ক্লেথর্ন। সাবধান। সাবধান। যে কোনো মুহূর্তে খুনী আমাদের খতম করে দিতে পারে।

চলুন, এবার আর্মস্ট্রং এর ঘরের দিকে যাওয়া যাক, বলেই ছুটলেন ব্লোর, তার পিছু পিছু লম্বার্ড।

চলতি পথেই ব্লোরের মুখ থেকে সংক্ষেপে আর্মস্ট্রং এর সম্পর্কে সব শুনে লম্বার্ড বলে, তাহলে এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে, আর্মস্ট্রংই এই খুনের নাটকের নায়ক, না ভিলেন বলা উচিত।

হ্যাঁ না কিছুই বললেন না ব্লোর। চুপ রইলেন।

আর্মস্ট্রং-এর ঘরের সামনে এসে থামলেন তারা। ঘর তখনো বন্ধ। তালায় চাবি ঝুলছে না দেখে তারা ধরে নিলেন, চাবি তিনি সঙ্গে নিয়ে গেছেন। এখন তাকে খুঁজে বার করতে হবে। প্রাসাদের বাইরে যাওয়ার আগে ক্লোরের উদ্দেশ্যে বললল লম্বার্ড, একটু অপেক্ষা করুন, আমি ততক্ষণে মিস ক্লেথনকে সাবধান করে দিয়ে আসি আর একবার।

ভেরার ঘরের সামনে এসে গলা চড়ালো লম্বার্ড, শুনুন মিস ক্লেথন, আমরা এখন বেরুচ্ছি আর্মস্ট্রং এর খোঁজে। তাই আপনাকে সাবধান করে দিয়ে যাচ্ছি, কেউ ডাকলে দরজা খুলবেন না যেন। এমন কি আমাদের দুজনের মধ্যে একটা আলাদা করে কেউ ডাকলেও নয়। তবে আমরা যখন দুজেন এক সঙ্গে ডাকবো, তখনি কেবল খুলবেন। মনে থাকবে তো?

হঁ।

চলুন এবার যাওয়া যাক, ক্লোরের উদ্দেশ্যে বললল লম্বার্ড।

যাবো বললেই হলো, একটু ইতস্ততঃ করলেন ব্লোর, পিস্তলটা তো ওঁর কাছেই আছে।

পিস্তলের জন্য চিন্তা করবেন না। ওটা এখন আমার কাছেই আছে। শুতে যাওয়ার সময় ওটা টেবিলের ড্রয়ারের সামনে আবিষ্কার করি।

সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়ালেন ব্লোর, আমি আপনার সাথী হবো না।

সাথী হবেন না কেন? মুখ বিকৃত করে বলে উঠলো লম্বার্ড ভেবেছেন আমি আপনাকে গুলি করে মারবো? মোটেই না। জেনে রাখুন আপনার মতো একটা মাথা মোটা লোককে মারবার জন্য পিস্তলের প্রয়োজন হয় না। আর ন্যাকামো না করে চলুন এবার। বেশী দেরী হয়ে গেলে তাকে আর ধরা যাবে না।

দ্বিধা ভাব কেটে গেলো ব্লোরের। অনুগতের মতো লম্বার্ডের পিছু পিছু প্রাসাদের গেট পেরিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। বাইরে তখন ঘোর অন্ধকার।

অনেকক্ষণ হলো ওঁরা বাইরে গেছেন অথচ এখনো ফেরার নাম নেই। দোটানায় পড়ে অধৈর্য হয়ে উঠলো ভেরা। অহেতুক ঘরের মধ্যে পায়চারি করলো বার কয়েক। জানালার পাল্লা সামান্য একটু টেনে চোখ বুলিয়ে দেখে নিলো সে একবার, না কেউ কোথাও নেই। নিশ্চিত হলো, শক্ত কাঠের দরজা। আর্মস্ট্রং এর মধ্যে সেই দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢোকে।

কিন্তু ওঁরাই বা এখনো ফিরছেন না কেন। রাতের অন্ধকারে গেলেনই বা কোথায়?

ঝন ঝন করে নিচে কাঁচ ভাগার শব্দে ভেরার চিন্তায় বাধা পড়লো। এক অজানা আশঙ্কায় শিউরে উঠলো সে। তার একটু আগের সব সাহস যেন নিমেষে হারিয়ে গেলো। এতো বড় প্রাসাদে সে এখন একা। যদি খুনী এসে এখন তাকে.....

হ্যাঁ, ঐ তো কে যেন সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে আসছে, মৃদু পায়ের শব্দ। ঐ আসছে, কে ও। শব্দটা বন্ধ হয়ে গেলো। তাহলে আমার শোনার ভুল

না, ঠিকই শুনেছি। ঐ তো আবার সেই পায়ের শব্দ। এবার আগের থেকে একটু জোরালো সেই সঙ্গে দুজনের কথোপকথনও ভেসে এলো। তার মানে একজন নয় দুজন আসছে। দরজার কাছে এসে থামলো দুজোড়া পায়ের শব্দ।

শুনছেন মিস ক্লেথর্ন? ঐ তো লম্বার্ডের কণ্ঠস্বর, আমরা ফিরে এসেছি।

তাড়াতাড়ি দরজা খুলুন। এবার বললেন ব্লোর, সাংঘাতিক ব্যাপার।

চটজলদি দরজা খুলে পালা করে দুজনের দিকে তাকিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলো ভেরা, কি দেখলেন বলুন।

আর্মস্ট্রং বেপাত্তা, জবাব দিলো লম্বার্ড হাওয়ার মিলিয়ে গেছেন তিনি।

অসম্ভব। প্রতিবাদ করে উঠলো ভেরা, দেখুন গিয়ে কোথাও না কোথাও তিনি ঠিক লুকিয়ে আছেন।

সারা দ্বীপ আমরা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছি, কোথাও তার চিহ্নটি আমরা দেখতে পাই নি।

এমনো তো হতে পারে ভেরা বলে আপনারা বেরিয়ে যাবার পরেই ফিরে এসেছেন এই প্রাসাদে। এখানেই কোথাও লুকিয়ে আছেন।

না, সে সম্ভাবনার কথাও বাতিল করে দিতে হচ্ছে। এ প্রাসাদের সব জায়গাই আমাদের দেখা হয়ে গেছে। কিন্তু কোথাও নেই তিনি।

জানি না বাপু, ভুতুড়ে প্রাসাদ, এখানকার কোনো ব্যাপারেই আমার বিশ্বাস হয় না।

বিশ্বাস হচ্ছে না? তাহলে শুনুন, খাবার ঘরের একটা শার্সি ভেঙ্গে চুরমার। আর

কি?

আর কি?

খাবার ঘরের আলমারির ভেতরে রাখা চারটের বদলে এখন পুতুল রয়েছে মোট তিনটে।

সেই কবিতাটির কথা যেন মনে পড়িয়ে দেয়—

চারটি কালো মানিক সাগর জলে
নাচে ধিন্ ধিন্,

শ্রীমদে দেব দেবীর গুহাজ নান । শ্রীগাথা ত্রিবিধ । উপন্যাস

একটি গেলো সিঁধু পাখির পেটে
ফিরলো বাকী তিন ।

১৫.

আর একটি সঙ্কটময় রাত্রির অবসান হলো।

প্রাতঃরাশ সারা হলো রান্নাঘরে। লোক তো মোটে তিনজন, কে আবার খাবার ঘরে কষ্ট করে খাবার টেনে নিয়ে যায়।

বাইরের আবহাওয়াটা এখন গতকালের ঠিক বিপরীত। ভোরের নরম রোদে আকাশ ঝলমল করছে। মেঘমুক্ত আকাশ। সমুদ্রের দিক থেকে ভেসে আসছে হালকা বাতাস। কে বলবে কালকের আকাশ ছিলো মেঘে ঢাকা, বাতাসে ছিল ঝড়ের দাপট।

দুর্যোগের রাত তো নয় যেন একটা দুঃস্বপ্নের রাত, শেষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা। সবার মুখে হাসি ফুটেছে, নতুন আশায় বুক বাঁধতে শুরু করেছে সবাই। আশার ছলনায় কি ফল লভিনু। আশার ফল যে আশানুরূপ হয় না, তা জানা সত্ত্বেও ওঁরা ভাবেন আশা থাকে বলেই তো মানুষ আজও বেঁচে আছে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য। আর এই আশাটা না থাকলে কবেই মানুষ পাগল হয়ে যেতো। এ দীপ ছেড়ে পালাবার আশা নিয়েই তো বেঁচে আছি আজও। এখানে কেই বা মরতে চান বলুন।

এবার আমাকেও উঠে পড়ে লাগতে হবে। লম্বার্ড বলে সূর্যের আলোয় হিলিওগ্রাফে সংকেত পাঠাবার চেষ্টা করবো প্রথমে। তাতে সফল না হলে আজ সন্ধ্যায় আগুন জ্বেলে স্টিকলহ্যাভেনের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করবো।

আপনার দুটো পন্থাই যথেষ্ট আশা প্রদ বলে মনে হচ্ছে আমার, তাকে সমর্থন করে বললো ভেরা, মানুষের নজর পড়তে বাধ্য।

তবে অসুবিধেও যে একেবারে নেই তা নয়। লম্বার্ড আরো বললো সমুদ্র এখনো পুরোপুরি শান্ত হয়নি।

এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে, আর একটা রাত কাটাতে হবে এই ভুতুড়ে দ্বীপে।

সবে তো সকাল, রাত নামতে অনেক দেরী মিস ক্লেথর্ন। দেখুন দিনেই না আমরা সাবাড় হয়ে যাই। তাই বলি কি, রাতের ভাবনা রাতেই করা যাবেক্ষণ।

ডঃ আর্মস্ট্রং এর ব্যাপারে আমরা কিছুই ভাবছি না। বাধা দিয়ে বলেছেন ব্লোর তার কি হলো বলুন তো?

যা হবার হয়েছে। তিনি মারা গেছেন। প্রত্যুত্তরে লম্বার্ড বলে কেন খাবার ঘরে মাত্র তিনটে পুতুল অবশিষ্ট থাকতে দেখেন নি। তার মানে, আপনি, আমি আর মিস্ ক্লেথর্ন—

বেশ তো মারাই যদি গিয়ে থাকে, তার মৃতদেহটা তাহলে গেলোই বা কোথায়? একটা ভাল প্রশ্ন করলো ভেরা।

উত্তরটা দিলেন ব্লোর সম্ভবত, মৃতদেহটা খুনী সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়েছে—

রাখুন তো মশাই আপনার সব কাল্পনিক গল্প। ধমকে উঠলো লম্বার্ড কে, কে ফেলতে পারে? আপনি। নাকি আমি? প্রথম খবরটা তো আপনিই দিলেন ডঃ আর্মস্ট্রং তাঁর ঘরে নেই। প্রাসাদের প্রধান ফটক পেরিয়ে তাকে আপনিই বাইরে চলে যেতে দেখেছেন। তারপর ছুটে এসে আমাকে ডাকলেন। আপনার কথা মতো দুজনে মিলে সারাটা নিগার দ্বীপে খুঁজে দেখলাম, কিন্তু তাকে কোথাও পাওয়া গেলো না। এখন আপনিই বলুন, এই অল্প সময়ে তাকে হত্যা করে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেওয়া কি আমার পক্ষে সম্ভব?

অতএব আমি জানি না বাপু, তবে আপনার কাছে পিস্তল আছে বলেই সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক।

কি যে বলেন মশাই? আপনাকে বলিনি পিস্তলটা আমি ফিরে পাই রাতে শোবার সময়। তা এর মধ্যে আপনি সন্দেহের কি এমন কারণ দেখতে পেলেন?

রাতে শুতে যাবার সময় পিস্তলটা ফিরে পাওয়ার গল্পটা বানানোও তো হতে পারে। আমি যদি বলি পিস্তলটা আগাগোড়াই আপনার কাছে ছিলো? তল্লাশীর ভয়ে কোথায় লুকিয়ে রেখে থাকবেন, রাতে শোবার সময় সেটা আবার বার করে রেখেছেন।

চঞ্চল হলো লম্বার্ড, জোরে জোরে মাথা দুলিয়ে বললো, আপনি নেহাতই একটা গবেট?

তার মানে আপনার বানানো গুল্লটা আপনি আমাকে জোর করে বিশ্বাস করাতে চাইছেন?
আরে মশাই, বানানো গুল্ল আরো একটু বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে হয়, তা না হলে
বাজারে চালানো যায় না।

ঠিক আছে, এখন কাজের কথায় আসা যাক। জোর দিয়ে বললেন ব্লোর আমার সাফ
কথা হলো, আপনার কাছে পিস্তলটা থাকা মানেই আমাদের দুজনকে আপনার আঙুলবহ
হয়ে থাকতে বাধ্য করা। সেট আমার চাই না। আগেকার ব্যবস্থা মতো পিস্তলটা আপনি
সেই বাক্সে রেখে দিন। তারপর বাক্সটা আলমারিতে রেখে চাবি যেমন দুজনের কাছে
থাকার কথা থাকবে।

বোকার মতো কথা বলবেন না

অর্থাৎ এ প্রস্তাব আপনি মানতে রাজী নন, এই তো?

হ্যাঁ, মানেটা তো তাই দাঁড়ায়। পিস্তল আমি কিছুতেই হাতছাড়া করবো না।

তা হলে আপনার সম্পর্কে অন্য রকম ধারণা করে নিতে হয়।

কি ধারণা শুনি? আমি মিঃ ওয়েন এই তো। আপনি তো একজন গোয়েন্দা, আপনাকে খুন করার মতলব যদি আমার থাকতো, তাহলে কাল রাত থেকে আজ সকাল পর্যন্ত আপনাকে বহুবার একলা পেয়েছি, ইচ্ছে করলে অনায়াসে তখন কাজটা সেরে ফেলতে পারতাম, কিন্তু কেন পারিনি জানেন?

সে আপনিই জানেন, আপনার ব্যাপার, হয়তো কোনো কারণ থাকতে পারে, যার জন্য আপনি

বোকার মতো আপনারা দুজনে কি ঝগড়া করতে শুরু করে দিয়েছেন, এবার ভেরা চুপ করে থাকতে পারলো না, থামবেন আপনারা।

থামতে যাবো কেন? ভেরার দিকে তাকিয়ে বললো লম্বার্ড। আর বোকামিই বা বলছেন কেন?

কি আশ্চর্য। এটা বোকামো নয়? মিঃ ব্লোরের প্রশ্নের উত্তরটা আপনি জানেন না? সে তো সেই কবিতাটার মধ্যেই আছে। সেই যে চারটি কালো মানিক সাগর জলে নাচে ধিন ধিন্ একটি গেলো সিন্ধুপাখীর পেটে ফিরলো বাকী তিন। কিন্তু এখানে সেই কবিতাটির একটি ব্যতিক্রম আছে বলে আমার ধারণা, অর্থাৎ আর্মস্ট্রং সিন্ধু পাখীর পেটে যায় নি? বেঁচে আছে। মনে হয় এই দ্বীপেরই কোথাও লুকিয়ে আছে সে। যদি বলেন, সেই পুতুলটাই বা গেলো কোথায়? তার উত্তরও আমার জানা হয়ে গেছে, আমাদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য এই প্রাসাদ ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় একটা পুতুল সে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে থাকবে।

গভীর ভাবে চিন্তা করার পর মাথা নেড়ে তার দিকে তাকালো লম্বার্ড, হ্যাঁ, মনে হচ্ছে।
তুমিই ঠিকই বলেছে, তোমার যুক্তিটাই ঠিক। তুমি একজন জিনিয়াস ভেরা-

লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠলো ভেরার মুখ। আড় চোখে একবার লম্বার্ডকে দেখে নিয়েই
মাথা নিচু করলো ভেরা। আসন্ন বিপদে তাদের মনের দূরত্ব কমেছে, এ ওর হৃদয়ের
কাছাকাছি এসে পড়েছে কোন সময়ে, তা আর খেয়াল করতে পারে না কেউ।

ব্লোর কিন্তু তাদের কথা সরাসরি মেনে নিতে পারলেন না। মৃদু প্রতিবাদ করলেন, দ্বীপটা
ছোট, আর এই ছোট দ্বীপে তন্ন তন্ন করে আমরা খুঁজেছি তাকে। কিন্তু কোথাও তার
অস্তিত্ব আমরা দেখতে পাইনি।

শুনুন মিঃ ব্লোর, ফুঁসে উঠলো ভেরা, পিস্তলটার খোঁজেও আমরা চিরুণী চেরা অভিযান
চাליয়েছি। কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। অথচ পরে আবিষ্কার হলো, পিস্তলটা এই দ্বীপেই
লুকনো ছিলো।

এবার লম্বার্ড মৃদু হেসে বললো, তুমি কিন্তুভুল করছ ভেরা, পিস্তলের আকৃতি আর
মানুষের আকৃতির মধ্যে ফারাক অনেক। এ দুটো ব্যাপার এক সঙ্গে গুলিয়ে ফেলার
মতো বোকামো করো না।

আপনি যাই বলুন না কেন, মাথা দুলিয়ে বললো ভেরা, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই দ্বীপেই কোথাও লুকিয়ে আছে সে। এ রকম পাগল এর আগে আমি কখনো দেখিনি। কবিতায় যেমন লেখা আছে হুবহু সেই ভাবেই আমাদের দুজন সঙ্গীকে খতম করলো সে। দম আটকে মারলো মাস্টারকে। চির ঘুমে পাড়িয়ে রাখলো মিসেস রগার্সকে। রগার্সকে গলাটা নামিয়ে দিলো ধড় থেকে আর মিস্ ব্লেন্টকে মারলো মৌমাছির হুল ফুটিয়ে। কি সাংঘাতিক ব্যাপার বলুন তো। আমাদের প্রাণ নিয়ে এ কি সর্বনাশ খেলায় মেতে উঠেছে ঐ খুনে লোকটা।

ভয় নেই, হান্কা সুরে বললেন ব্লোর, এখানে কোথাও চিড়িয়াখানা নেই। তাই ভালুক /৫৪ আমদানি করে তাকে দিয়ে কাউকে মারতে খুনীকে যথেষ্ট কসরত করতে হবে। এই বলে হাসলেন তিনি শব্দ করে।

ভেরা তাকালেন ব্লোর-এর দিকে, কে বললে আপনাকে এখানে চিড়িয়াখানা নেই? গতকাল যে ভাবে আমরা রাত কাটিয়েছি তা তো পশুরই নামান্তর। আমরা পশু না হলে অমন সন্দেহ মানুষ মানুষকে কি করে করতে পারে?

তার সেই কঠিন কথাটা শুনে স্তব্ধ বিমূঢ় হয়ে গেলেন ব্লোর।

সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত পাহাড়ের চূড়ায় বসে এক নাগাড়ে আয়নায় সূর্যের রশ্মি ফেলতে গিয়ে পুরোপুরি ব্যর্থ হলো লম্বার্ড। চারিদিকে কুয়াশা তখন, সেই কুয়াশা ভেদ করে সে রশ্মি স্টিকলহ্যাভেন পর্যন্ত পৌঁছলো কিনা, তা সেখানকার লোকরাই বলতে

পারে। তবে ওপার থেকে একখানা লঞ্চ দূরের কথা একখানা ডিঙি নৌকাও এগিয়ে এলো না তাদের উদ্ধার করার জন্য।

এরই মাঝে পলাতক ডঃ আর্মস্ট্রংকে খুঁজে বার করার জন্য সব রকম চেষ্টাই ব্যর্থ হলো। নিগার দ্বীপের ত্রিসীমানায় তার অস্তিত্ব দেখা গেলো না।

ব্যর্থ কাজের আবর্জনা সরিয়ে অন্য দুজন যখন কপালের ঘাম মুছে ফেলতে ব্যস্ত, ভেরা তখন অস্ফুটে বলে উঠলেন আমি আর প্রাসাদে ফিরে যাচ্ছি না। এখানে এই আকাশের নিচে উন্মুক্ত জায়গায় অনেক নিরাপদ।

কথাটা তুমি মন্দ বলো নি। তাকে সমর্থন করলো লম্বার্ড। এখানে থাকার সুবিধে হলো, চারিদিক খোলা, যেদিক দিয়েই খুন্সী আসুক না কেন, আমাদের দৃষ্টি এড়াতে পারবে না সে।

তাই বলে সারা রাত এখানে পড়ে থাকা যায় না, মাথা নাড়লেন ব্লোর। দিনের বেলায় সেখানেই থাকি না কেন রাতে একটা আস্তানা চাই বৈকি। তাই প্রাসাদে আমাদের ফিরে যেতেই হবে।

আপনারা যান, আমি যাবো না। ওই মৃত্যু পুরীতে, উঃ কি ভয়ঙ্কর ছিলো কালকের রাতটা, ভাবলে গায়ে কাঁটা দিয়ে দেয়, অজানা আতঙ্কে থরথর করে কেঁপে উঠলো ভেরা।

আমার চিন্তা শুধু রাতের জন্য নয়, মিঃ লম্বার্ড, র্লোর বললেন, এখন আমার খুব ক্ষিদে পেয়েছে। পেটে কিছু না দিলেই নয়। আপনার কি অভিমত?

আ-আমি কি আবার বলবো। একটু ইতস্ততঃ করে কোনো রকমে বললো লম্বার্ড, আপনি যান, আমি বরং মিস ক্লেরনের সঙ্গে থেকে যাই।

ঠিক আছে, আপনারা এখানে থাকতে চাইছেন থাকুন। আমি আর বাধা দেবো না। ভেবেছিলাম, এখানে যে কদিন থাকি সবাই এক সঙ্গে থাকবো। তাছাড়া সত্যি কথা বলতে কি আমরা এখন কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছি না। যাই হোক লম্বার্ডের দিকে ফিরে র্লোর বলেন, প্রাসাদে আমি এখন একাই থাকবো। দেখবেন পিস্তলের মুখটা যেন আমার দিকে ঘুরিয়ে দেবেন না, আপনার কাছে পিস্তলটা এখনো আছে। বিশ্বাসঘাতকতা করবেন নানা।

তারপর এক মুহূর্তও আর দাঁড়ালেন না তিনি সেখানে। তাঁর গমন পথের দিকে তাকিয়ে মুখ খারাপ করলো লম্বার্ড, একেবারে জানোয়ার। ক্ষিদে সহ্য করতে পারে না, পেটের টানে চললো এখন প্রাসাদে।

চিন্তায় পড়লো ভেরা, উনি একা গেলেন, কাজটা বোধ হয় ভালো করলেন না।

ভয় নেই, আর্মস্ট্রং এর হাতে কোনো অস্ত্র নেই। আর শক্তিতে ওঁরা দুজনেই সমান। যাই হোক প্রাসাদে আর্মস্ট্রং এর থাকার সম্ভাবনা একেবারেই নেই। আমি জানি সেখানে নেই সে।

কিন্তু অন্য আর কি সমাধান হতে পারে? কাকেই বা সন্দেহ করা যেতে পারে?

কেন, ব্লোরকে।

ওঁ। আপনি কি সত্যিই তাই মনে করেন? শোনো ভেরা ক্লোরের কাহিনী তুমি তো শুনেছো। তোমাকে স্বীকার করতেই হবে, সেটা সত্য কাহিনী হিসাবে যদি ধরে নেওয়া হয়, তাহলে আর্মস্ট্রং এর নিরুদ্দেশ হওয়ার ব্যাপারে আমার কিছু করার নেই। তার কাহিনী আমার কাছে পরিস্কার। কিন্তু সেটা আর্মস্ট্রংকে ঠিক পরিস্কার করতে পারে না। আমার তার মুখ থেকে শুনেছি, পায়ের শব্দ শুনে পেয়েছিল সে, সামনের দরজা দিয়ে একজন লোককে বেরিয়ে যেতে দেখেছে। সমস্ত ব্যাপারটাই মিথ্যে হতে পারে, সাজানো গল্প হতে পারে। হয়তো কয়েক ঘণ্টা আগেই আর্মস্ট্রংকে খতম করে এসেছিল সে নিজেই।

কিন্তু কেমন করে?

তা আমরা জানি না। লম্বার্ড তার কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে, তবে তুমি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করো তাহলে বলবো একমাত্র বিপজ্জনক ব্যক্তি হলো ব্লোর। লোকটার সম্পর্কে আমরা

কতোটুকুই বা জানি। সে তো নিজেই একজন পুলিশম্যান হিসাবে পরিচয় দিয়েছে। এ সব বানানো গল্প, হয়তো সে একজন উন্মাদ, জেদী ব্যবসায়ী, কিংবা সে রকম কিছু। যে কোনো অপরাধমূলক কাজ সে অনায়াসে করতে পারে। আর একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত, এ ধরনের অপরাধ যে কোনো লোকের সঙ্গে করতে পারে সে।

ফ্যাকাসে সাদা হয়ে গেলো ভেরার মুখ। এক নিঃশ্বাসে বললো সে ধরুন যদি সে তার নাগালের মধ্যে আমাদের পায়?

তার থেকে আমি অনেক বেশী সতর্ক, পকেটে রাখা রিভলবারের ওপর চাপড় মেরে কেমন কৌতূহলী চোখ নিয়ে ভেরার দিকে তাকালো লম্বার্ড। নরম গলায় বললো, আমার ওপর তোমার বিশ্বাস আছে, আছে না ভেরা? তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো আমি তোমাকে গুলি করবো না।

উত্তরে ভেরা বলে, একজন না একজন কাউকে বিশ্বাস তো করতেই হবে.....সত্যি কথা আর্মস্ট্রং-হঠাৎ তার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো ভেরা, আপনার কি মনে হয় না, একজন হা কেউ একজন সব সময় আমাদের উপর নজর রাখছে, খতম করার জন্য সুযোগের অপেক্ষা করছে?

ওটা তো তোমার নার্ভাসের লক্ষণ।

তাহলে আপনি সেটা অনুভব করেছেন? অনেক আগ্রহ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে ভেরার গলা কেঁপে ওঠে। ঝুঁকে পড়ে লম্বার্ডের পাশে একটু ঘন হয়ে দাঁড়ালো ভেরা। বলুন, আপনি তা মনে করেন না? একবার আমি একটা গল্প পড়ি-দুই বিচারক একদিন আমেরিকায় ছোট্ট একটা শহরে এলো সুপ্রিম কোর্ট থেকে। তাদের বিচার হলো, একেবারে ন্যায্য বিচার যাকে বলে। কারণ তাদের সেই বিচারক তো এ জগতে ছিলেন না, তিনি ছিলেন.....।

ব্র তুলে বললল লম্বার্ড, তার মানে তুমি বলতে চাইছে, বিচারক নেমে এসেছিলেন স্বর্গ থেকে এঃ? না, না ও সব আধ্যাত্মিক বা ঐশ্বরিক ক্ষমতায় আমি বিশ্বাসী নই। এ সব কাজ মানুষের পক্ষে যথেষ্ট।

নিচু গলায় বলে ভেরা জানেন এক এক সময়ে আমিও ঠিক নিশ্চিত হতে পারি না, মনে হয়.....

তার দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে তার মুখের কথাটা কেড়ে নিয়ে বললো লম্বার্ড। সেটা বিবেকের দংশন....কিছুক্ষণ নীরব থেকে শান্ত গলায় আবার বললো তার মানে আসলে তুমি সত্যিই ডুবিয়ে মেরেছিলে ছেলেটিকে?

না। না আমি তাকে হত্যা করিনি, আমি তাকে মারতে চাইনি। জোর দিয়ে বললো ভেরা, আমার এ কথা বলার কোনো অধিকার নেই।

লক্ষ্মীরে ঠোঁটে একটা সহজ সরল হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেলো। হা, তুমি ঠিক তাই করেছিলে সোনামণি। তবে তার কারণ আমি জানি না। আর কল্পনাও করতে পারি না। তবে সম্ভবত এর মধ্যে একজন পুরুষ থেকে থাকবে। কে, কে সে?

হঠাৎ একটা পরিবর্তন অনুভব হলো ভেরার মধ্যে, তারা কারা মুখ ছেয়ে গেলো একটা চিন্তার ছায়া। ম্লান বিষণ্ণ গলায় বললো সে, হা, তার মধ্যে একজন পুরুষ ছিলো...

ধন্যবাদ, নরম গলায় বললো লক্ষ্মী, হ্যাঁ এই কথাটাই আমি জানতে চেয়েছিলাম।

এই সময় হঠাৎ ভেরা উঠে দাঁড়িয়ে মৃদু চিৎকার করে বলে উঠলো, এ কি? ভূমিকম্প নাকি?

না, না, ভূমিকম্প টম্প নয়, উত্তরে বললো লক্ষ্মী শব্দটা মনে হলো প্রাসাদের দিক থেকেই এলো। আমি ভাবলাম-আচ্ছা তুমি কোনো কান্নার শব্দ শুনতে পেয়েছো? আমি কিন্তু শুনেছি।

প্রাসাদের দিকে তাকালো তারা। হা ঐ প্রাসাদ থেকেই কান্নার আওয়াজটা যেন ভেসে এলো। চলো, প্রাসাদের দিকে যাওয়া যাক।

না, না আমি যাচ্ছি না।

তাহলে তুমি থাকো, আমি চললাম।

ভেরা তখন মরিয়া হয়ে বললো, ঠিক আছে, আমি আপনার সঙ্গে যাবো।

প্রাসাদে যাওয়ার ঢালু পথ দিয়ে এগিয়ে চললো তারা। প্রাসাদের সামনের উঠোনটা দূর থেকে বেশ শান্ত বলেই মনে হলো, দুপুরের রোদের আলো ঝলমল করছিল সেখানে। এক মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে একটু ইতস্তত করলো তারা। তারপর প্রাসাদে প্রবেশ না করে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে হাঁটতে শুরু করলো।

আর তখনি তারা দেখতে পেলো রোরকে। উঠানের পূর্ব দিকে হাত পা ছড়িয়ে চিত হয়ে পড়ে আছে সে, একটা ভারি সাদা মারবেল পাথরের আঘাতে খেঁতলে গেছে তার মাথাটা।

মাথা তুলে ওপরের দিকে তাকালো লম্বার্ড, তারপর জানালার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো সে, আমার ঠিক মাথার ওপরে ঘরটা কার বলো তো?

আমার, নিচু গলায় বললো ভেরা, ঘরের তাকে রাখা ঐ পাথরটা ঘড়ির খাপ.....হ্যাঁ, এখন আমার মনে পড়েছে, সেটা দেখতে কতকটা ভালুকের মতো ছিলো।

ফিলিপস লম্বার্ড তার কাঁধ ঝাঁকালো। এখন বোঝা যাচ্ছে, ঐ প্রাসাদেই কোথাও লুকিয়ে আছে আর্মস্ট্রং। আমি চললাম তাকে খুঁজতে।

কিন্তু তাকে জড়িয়ে ধরলো ভেরা। প্রায় আত্ননাদ করে উঠলো সে। বোকামি করো না। তার কথায় অন্তরঙ্গতার সুর, এখন আমাদের পালা এর পর আমরা। আমরা খুঁজি, এটাই তো সে চায়। সে এখন মুহূর্ত গুনছে আমাদের জন্য। আমাদের খতম করতে পারলেই তার সব হিসেব শেষ।

থমকে দাঁড়ালো ফিলিপ। কি ভেবে বললো সে, এর মধ্যে কিছু একটা রহস্য অবশ্যই আছে।

সে যাই হোক, ভেরা বলেন, আমার অনুমান যে ঠিক, এখন তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে।

মাথা নেড়ে সাই দিলো সে। হ্যাঁ, তোমারি জয়। হ্যাঁ, এ সব কাজ আর্মস্ট্রং এরই কিন্তু সেই শয়তানটা কোথায় বা নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে? আমরা তাকে চিরুণী খোঁজার মতো খুঁজেছি।

সে নিশ্চয়ই আগে থেকেই একটা গোপন আস্তানা ঠিক করে রেখেছিলো।

পুরনো প্রাসাদ হলে তবু কথা ছিলো।

তবু তারই মধ্যে যে তার লুকোবার জায়গাটা ঠিক করে নিয়ে থাকবে।

বেশ তো, লম্বাড বলে, সেই জায়গাটা আমি দেখতে চাই।

মৃদু চিৎকার করে উঠলো ভেরা, হ্যাঁ তা তো তুমি দেখবেই। আর কথাটা সে ও জানে বৈকি। সেখানে সে অপেক্ষা করছে তোমার জন্য।

পকেট থেকে রিভলবারটা অর্ধেক বার করে লম্বাড বলে, জানো, এটা এখনো আমার সঙ্গে আছে।

আর্মস্ট্রং এর থেকে ব্লোর, অনেক বেশী শক্তি ধরে, তুমিই তো বলেছিলে, দৈহিক শক্তি অবশ্যই ব্লোর এর ছিলো, অন্তত তাকে দেখে সেই রকমই তো মনে হতো। কিন্তু কেন বুঝতে চাইছে না, আসলে আর্মস্ট্রং উন্মাদ। একটা বদ্ধ পাগল। আর জানো তো পাগলরা সব সময় সুস্থ মানুষের থেকে শক্তিধর, সেটাই তাদের বাড়তি সুবিধে।

রিভলবারটা পকেটে আবার চালান করে দিয়ে লম্বাড বলে, তাহলে চলো।

অবশেষে বললো লম্বাড, রাত নামলো আমরা কি করবো। ভেবেছো কিছু?

উত্তর দেয় না ভেরা। লম্বাড নিজের থেকেই আবার জিজ্ঞেস করলো, সে কথা ভাবোনি তুমি?

অসহায়ার মতো বললো ভেরা, কিই বা করতে পারি আমরা? হে ঈশ্বর ভীষণ ভয় করছে আমার?

বেশি চিন্তা ভাবনা করেই বললো লম্বার্ড চমৎকার আবহাওয়া, চাঁদ উঠবে। পাহাড়ের চুড়ায় একটা নিরাপদ জায়গা খুঁজে নিতে হবে। সেখানে বসে রাতটা কাটিয়ে দিতে হবে। কেউ যদি আমাদের দিকে এগিয়ে আসে, আমি তাকে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করবো।

থামলো সে। তারপর ভেরার দিকে ভালো করে তাকাতে গিয়ে বললো সে, ইস তোমার অমন হান্কা পোষাকে ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে ভেরা?

ভেরার ঠোঁটে রহস্যময় হাসি। ঠাণ্ডা? মরে গেলে তো আরো বেশী ঠাণ্ডা হয়ে যাবে আমার শরীরটা।

হ্যাঁ, সে কথা সত্যি.....শান্ত গলায় বললো লম্বার্ড। অস্থির ভাবে নড়েচড়ে উঠলো ভেরা।

এখানে আর বেশিক্ষণ বসে থাকলে সত্যি সত্যি আমি পাগল হয়ে যাবো। চলো এবার এগিয়ে যাওয়া যাক।

ঠিক আছে, চলো।

সমুদ্রের ধার দিয়ে উঁচু-নিচু পথ ধরে পাশাপাশি হেঁটে চললো তারা। পশ্চিম দিগন্তে সূর্য তখন ঢলে পড়তে শুরু করেছে। অপরাহ্নের সোনালী রোদটা কেমন যেন স্নান বিষণ্ণ বলে মনে হলো।

হঠাৎ সমুদ্রের ঢেউগুলো গুণতে গিয়ে আক্ষেপ করে ভেরা বললো, দুঃখের কথা, সমুদ্রে স্নান করতে পারলাম না আমরা।

ফিলিপ তখন সমুদ্রের ধারে গভীর মনোযোগ সহকারে কি যেন নিরীক্ষণ করছিলো। হঠাৎ দ্রুত বলে উঠলো সে, ওখানে ওটা কি দ্যাখো তো? ঐ যে ঐ বড় পাথরটার কাছে?

স্থির চোখে সেদিকে তাকিয়ে বলে উঠলো ভেরা, কার যেন পোক বলে মনে হচ্ছে।

স্নানার্থী? হাসলো লম্বার্ড। মনে হয় সমুদ্রের কোনো জঞ্জাল টঞ্জাল কিছু হবে।

চলো, দেখাই যাক না জিনিসটা কি।

কাছেই যেতেই বলে উঠলো লম্বার্ড, তোমার অনুমানই ঠিক, ওগুলো কারোর পোষাকই বটে। আবার দেখছি, একজোড়া বুট জুতোও পড়ে রয়েছে। চলো, আর একটু তলিয়ে দেখা যাক।

সেই পাথরটার দিকে এগিয়ে চললো তারা। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বললো ভেরা, আরে এ তো শুধু পোষাক নয়, পোষাকের আবরণে এ তো একজন মানুষ.....

পাশাপাশি দুটি পাথরের মধ্যে পড়েছিলো লোকটা, ঢেউ-এর ধাক্কায় ভাসতে ভাসতে লোকটা বোধ হয় ঐ পাথর দুটির মাঝখানে আটকে পড়ে গিয়ে থাকবে।

এক সময় সেখানে গিয়ে হাজির হলো লম্বার্ড এবং ভেরা। হাঁটু মুড়ে বুকু পড়লো তারা। মুখে তার এক বিন্দু রক্তও ছিলো না, ফ্যাকাশে বিবর্ণ, জলে ডোবা মুখ, ফুলে ঢোল।

আত চিৎকার করে উঠলো লম্বার্ড, হায় ঈশ্বর। এ যে দেখছি আর্মস্ট্রং.....।

১৬.

হঠাৎ সময়টা যেন থমকে দাঁড়ালো ।...সুন্দ মহাজাগতিক, সব কিছু যেন নিসুন্দ । সময়ের চাকাটাও আর ঘুরছে না.....স্থির । অচল.....যেন হাজার হাজার বছরের পথ চলার ক্লান্তিতে মুখ খুবড়ে পড়ে আছে পথের ধুলোয় ।

না, সেটা কেবল মাত্র একটা কিংবা সেরকম কিছু.....

হাসি হাসি মুখ লম্বার্ডের । বললো সে, তাহলে শেষ পর্যন্ত, এই দাঁড়ালো, তাই না ভেরা?

উত্তর ভেরা বললো, এই দ্বীপে তুমি আর আমি ছাড়া আর কেউ রইলো না.... ।

বলাবাহুল্য । বললল লম্বার্ড, অতএব আমরা এখন জেনে গেছি, আমরা, এখন কোথায় তাই নয় কি?

তা সেই শ্বেতপাথরের ভল্লকের কায়দাটা কি ভাবে কাজে লাগালে?

প্রিয়তমা, কায়দাটা অতি সহজ আর অত্যন্ত ভালোও বটে....

তাদের চার চোখের মিলন হলো আবার ।

নিজের মনে ভাবলো ভেরা, আগে কেন আমি তার মুখটা ঠিক মতো চিনতে পারি নি? একাট নেকড়ে হা উপমাটা ঠিক তাই একটা নেকড়ে মুখ ...তার সেই ভয়ঙ্কর দাঁতগুলো.....।

মুখ খুললো লম্বাড, ককর্শ তার কণ্ঠস্বর বুঝি বা বিপজ্জনকও বটে তবে অর্থপূর্ণ।

এখানেই সব শেষ, বুঝলে।

আমরা এখন সত্যের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি। আর এখানেই শেষ.....।

হ্যাঁ, আমিও তা বুঝেছি শান্ত ভাবে বললো ভেরা।

তারপর স্থির চোখে সমুদ্রের দিকে তাকালো সে। জেনারেল ম্যাকআর্থারও স্থির চোখে তাকিয়েছিলো সমুদ্রের দিকে। কখন, কেবল গতকালই?

কিংবা তার আগের দিন? সেও বলেছিলো, এখানেই সব শেষ.....।

কিন্তু ভেরার কাছে সেই কথাগুলো, সেই ভাবনাগুলো বিদ্রোহ জানালো তার মনে। না, এ কখনোই শেষ হতে পারে না।

নিচে সেই মৃত লোকটির দিকে তাকালো ভেরা। বললো সে বেচারি ডঃ আর্মস্ট্রং.....।

খিঁচিয়ে উঠে বললো লম্বার্ড, এ সব কি? মেয়েলী দরদ?

পাল্টা প্রশ্ন করলো ভেরা, কেন হবেনা? তোমার কোনো দয়া মায়া নেই?

উত্তরে বলল লম্বার্ড, তোমার জন্য আমার কোনো দয়া হয় না। আশাও করো না তুমি?

মৃতদেহটার দিকে আবার তাকালো ভেরা, ওর দেহটা জল থেকে আমাদের সরিয়ে দিতেই হবে। এসো, দুজনে আমরা ধরাধরি করে প্রাসাদ পর্যন্ত নিয়ে যাই।

কি দরকার? যেখানে আছে, নিশ্চিন্তে তাকে থাকতে দাও সেখানে।

যে ভাবেই হোক, তাকে তুলতেই হবে সমুদ্র থেকে।

হাসলো লম্বার্ড। ঠিক আছে, তুমি যা মনে করো-

নিচু হয়ে আর্মস্ট্রং-এর মৃতদেহে হাত দিলো সে। তাকে সাহায্য করার জন্য তার গায়ের ওপর ঝুঁকে পড়লো ভেরা। ভেরা তার সর্বশক্তি দিয়ে মৃতদেহটা তুলে ধরতে সাহায্য করলো লম্বার্ডকে।

জল থেকে ওপরে উঠাতেই হিমসিম খেয়ে গেলো লম্বার্ড । কাজটা খুব সহজ নয় ।

যাই হোক, জল থেকে সমুদ্রতীরে মৃতদেহটা তুললো তারা কোনো রকমে । সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ভেরার দিকে তাকালো সে তুমি এখন সন্তুষ্ট তো?

হ্যাঁ যথেষ্ট বললো ভেরা ।

ভেরার কথা বলার ধরণটা তাকে সতর্ক করে দিলো । ঘুরে দাঁড়ালো সে । এমন কি সে তার পকেটে হাত ঢোকাতেই টের পেয়ে গেলো, পকেট ফাঁকা, রিভলবার উধাও ।

ভেরা তখন তার কাছে থেকে এক কিংবা দুগজ দূরে সরে গিয়ে তার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলো, হাতে রিভলবার ।

মাথা নাড়লো ভেরা । শক্ত হাতে রিভলবারটা চেপে ধরলো সে । ফিলিপ লম্বার্ডের শিয়রে মৃত্যু । এর আগে কখনো এতো কাছে আসেনি মৃত্যু । আর এখনো পর্যন্ত হারও হয়নি তার ।

হুকুম করার ভঙ্গিতে বলল লম্বার্ড, রিভলবারটা আমাকে ফেরত দাও । বলছি ফেরত দাও—

হাসলো ভেরা, তাচ্ছিল্যের হাসি ।

এসো, আবার বললো লম্বার্ড, কাছে এসে রিভলবারটা আমার হাতে তুলে দাও বলছি।

ভেরাকে চুপ করে থাকতে দেখে তৎপর হলো লম্বার্ড, তার মস্তিষ্ক দ্রুত কাজ করে চলে।
কথায় তাকে ভোলানো আর যাবে না, এখন কাজ, শুধু কাজ। কোন পথে, কি ভাবে
এখন তার ভাবনা সেটাই। সারাটা জীবন ঝুঁকি নিয়ে এসেছে সে, সেই ঝুঁকিই নিলো সে
এখানে।

শেষবারের মতো চেষ্টা করলো সে। ধীরে ধীরে শান্ত সংযত গলায় তাকে যুক্তি দিয়ে
বোঝাবার চেষ্টা করলো, শোনো খুকী, মন দিয়ে আমার কথা শোনো-এবং তারপর হঠাৎ
লাফ দিয়ে উঠলো সে, কালো চিতার মতো, যেমন করে হিংস্র পশু ঝাঁপিয়ে পড়ে তার
শিকারের ওপর।

আর তখনি রিভলবারের ট্রিগারটা টিপে ধরলো ভেরা যন্ত্রচালিতের মতো.....।

নিশ্চল মূর্তির মতো লম্বার্ডের দেহটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো কয়েক মুহূর্তের জন্যে,
তারপর ভারি জিনিস পতনের মতো তার দেহটা পড়ে গেলো মাটির ওপর।

অতি সন্তর্পণে এগিয়ে গেলো ভেরা, হাতে তখনো তার সেই রিভলবারটা, সাবধানের মার
নেই। কিন্তু অতো সাবধান হওয়ার প্রয়োজন ছিলো না।

ফিলিপ লম্বার্ড এখন মৃত। গুলিটা গিয়ে বিদ্ধ হয়েছিলো তার ঠিক হৃৎপিণ্ডে।

বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলো ভেরা-এখন সে মুক্ত, স্বস্তি পেতে পারে, এখন মৃত্যু তাড়া করে ফিরবে না। অবশেষে সব ভয় কেটে গেলো।

আর ভয় নেই-তার নার্ভ ফেল করার কোনো কারণ আর রইলো না..।

দ্বীপে সে এখন একা, নিঃসঙ্গ, আর সঙ্গে আছে নয়টি মৃতদেহ। কিন্তু তাতেই বা কি এসে যায়? সে তত বেঁচে আছে...

বসলো সেখানে সে অত্যন্ত সুখে, অপার শান্তি বিরাজ করছে এখন তার সামনে.....কোনো ভয় নেই আর.....

সূর্য তখন অস্ত যেতে শুরু করেছে। লাল আভায় রাঙ্গায়িত পশ্চিম দিগন্ত। ভেরা তখন চলতে শুরু করলো। একটু আগের সেই ঘটনার আকস্মিকতায় চলার শক্তিটুকু যেন হারিয়ে ফেলেছিলো সে। তবে এখন সে অনেকটা নিশ্চিত, নিজের নিরাপত্তা নিজে অর্জন করার আনন্দে বুঝি বা উজ্জীবিত।

এখন তার মনে হলো, খুব ক্ষুধার্ত, ঘুমও পাচ্ছে। সে এখন চায়, প্রাসাদে ফিরে গিয়ে ক্লান্ত শরীরটাকে তার বিছানায় এলিয়ে দেয়, তারপর শুধু ঘুম আর ঘুম.....।

সম্ভবত আগামীকাল তারা আসবে এবং তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, এখানে থাকার জন্য তার কোন চিন্তাই নেই। এখন তার আর এই নিঃসঙ্গতা খারাপ লাগছে না। ওঃ এই নিবিড় একাকীত্ব ও নিঃসঙ্গতার মধ্যেই শান্তির পরশ অনুভব করতে পারছে। এটাই বোধহয় ঈশ্বরের আশীর্বাদ, একান্ত কাম্য ছিলো তার। চলতে চলতে এক সময় প্রাসাদের সামনে এসে ভালো করে তাকালো। এখানে এখন আর কোনো ভয় নেই, মৃত্যুর আশঙ্কা নেই। কোনো আততায়ী তার জন্য ওঁৎ পেতে বসে নেই এখানে। এখন নির্ভয়ে প্রাসাদের দিকে তাকিয়ে দেখতে পারে সে। অথচ একটু আগেও দিবালোকে এই প্রাসাদের দিকে ভালো করে তাকাতে পারেনি এক অজানা আশঙ্কায়, অজানা ভয়ে।

ভয়-ভয় জিনিসটা কেমন যেন অদ্ভুত.....।

যাইহোক, ভয়ের পর্ব এখন শেষ। ভয়টাকে সে জয় করেছে, মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছে। উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে তার থেকে দ্বিগুণ শক্তিশালী একজন পুরুষকে ঘায়েল যে সে করতে পেরেছে, এ জয়ের আনন্দ এখন তার কাছে সব চেয়ে বেশী বলে মনে হলো।

প্রাসাদের ভেতরে এগিয়ে চললো সে। অন্তর্গামী পাকা টম্বারের মতো লাল সূর্যটা তখন পশ্চিমের আকাশটাকে লাল ও কমলা রঙে রাঙ্গিয়ে তুলেছিলো। তার মধ্যে একটা সুন্দর শান্তির স্পর্শ অনুভব করলো সে।

সমস্ত জিনিসটাই হয়তো একটা স্বপ্ন ভাবলো ভেরা।

ক্লান্ত ভয়ঙ্কর ক্লান্ত সে এখন। শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রচণ্ড ব্যথা যন্ত্রণা, চোখের পাতাগুলো বুজে আসছে। এখন আর ভয়ের কোনো চিন্তা নেই, নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারে সে।

নিজের মনে হাসলো সে। প্রাসাদের মধ্যেও যেন একটা অদ্ভুত শান্তি বিরাজ করছিলো।

সাধারণত, ভাবলো ভেরা, যেখানে প্রতিটি ঘরে মৃতদেহ পড়ে রয়েছে, প্রাসাদে সে ছাড়া অন্য কোনো জীবিত প্রাণীর অস্তিত্ব নেই, সেখানে কেউ ঘুমোতে চায় না, যদি মৃত্যু এসে বলে এবার তোমার পালা.....।

রান্নাঘরের দরজার সামনে এসে থমকে দাঁড়ালো সে। টেবিলের মাঝখানে তখনো তিনটি পুতুল পড়েছিলো। হাসলো সে। নিজের মনেই বললো সে, মহাকালের সময় থেকে অনেক পিছিয়ে পড়েছে তোমরা।

টেবিলের ওপর থেকে দুটি পুতুল তুলে নিয়ে জানালা গলিয়ে বাইরে ফেলে দিলো সে। উঠানের পাথরের মেঝের ওপর শব্দ হতে শুনলো।

আমার সঙ্গে তোমরা আসতে পারো। প্রিয়, আমরা জিতে গেছি। আমরা জয়ী। বিড়বিড় করে নিজের মনে বললো সে।

দিনের আলো নিভে আসছে একটা আবছায়া অন্ধকারে ডুবেছিলো ঘরটা।

ভেরা, খুদে নিগারটা তার হাতে তালি দিলো তারপর সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করলো সে ধীরে ধীরে, কারণ হঠাৎ তার পা দুটো ভীষণ ক্লান্ত বলে মনে হলো।

একটা খুদে নিগার ছেলে একা থেকে গিয়েছিলো। কি করে শেষ হলো সেটা? ওহো, হা বিয়ে করে সে আর তারপর কেউ আর সেখানে ছিলো না.....।

বিবাহিত...মজার ব্যাপার, আশ্চর্য, হুগো যে সেই প্রাসাদে ছিলো, এ অনুভূতি কি করেই বা তার হলো.....?

অত্যন্ত বলিষ্ঠ তার সেই অনুভূতিটা। হা ওপর তলায় তার জন্য অপেক্ষা করছে হুগো। নিজেই নিজেকে বললো ভেরা, বোকামো করো না। তুমি এখন এমনি এতাই ক্লান্ত যে, যতো সব উদ্ভট চিন্তা এখন তোমার মনে জাগছে। এ সবই তোমার কল্পনা, এতটুকু মিল নেই বাস্তবের সঙ্গে।

ধীরে ধীরে উপরে উঠে চলে সে। সিঁড়ির একেবারে শেষ ধাপে উঠে আসার পর তার হাত থেকে কি যেন একটা পড়ে গেলো। রিভলবারটা যে তার হাত থেকে পড়ে গেলো নজরেই পড়লো না তার। তার লক্ষ্য এখন কেবল তার হাতের পুতুলটা, সেটাই এখন তার একমাত্র সঙ্গী, তার একাকীত্ব ঘোচানোর প্রতিকী।

প্রাসাদটা কি ভীষণ শান্ত । তবু, একেবারে ফাঁকা প্রাসাদ বলেও মনে হলো না.... ।

উপর তলায় তার জন্য অপেক্ষা করছে হুগো... ।

একটা ছোট, কালোমানিক এখনো অবশিষ্ট । সেই কবিতার শেষ লাইনটা কি যেন ছিলো?
বিবাহিত হওয়া কিংবা সেই রকম কিছু একটা ব্যাপারে, তাই কি?

অবশেষে তার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো সে । ঘরের ভেতরে তার জন্য হুগো যে
অপেক্ষা করছে । এ ব্যাপারে একেবারে নিশ্চিত সে । দরজা খুললো সে । হাঁপাচ্ছে সে ।
বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলো ভেরা.... ।

ওটা কি ঘরের ছাদ থেকে কি যেন ওটা ঝুলছে? দড়ির শেষ প্রান্তে একাট ফাস আগে
থেকেই তৈরী? এবং নিচে একটা চেয়ার? উঠে দাঁড়াবার জন্য । চেয়ারটা লাথি মেরে
সরিয়ে দেওয়া যাক ।..... আর সেটাই তো চেয়েছিলো হুগো...হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে
সেটাই তো কবিতার শেষ তিনটি লাইন....

শেষ কালো মানিক, শেষ প্রাণের কোনো,
মনের দুঃখে দিল গলায় দড়ি,
বাকী রইলো না আর কেউ..... ।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে তার হাত থেকে পড়ে গেলো পুতুলটা। মাটিতে পড়ে গড়াতে গড়াতে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো। যন্ত্রচালিতের মতো সামনের দিকে এগিয়ে চললো ভেরা। এখানেই শেষ ঠাণ্ড, ভিজে হাতটা অবশ্যই সিরিলের, তার কণ্ঠনালী স্পর্শ করলো।

তুমি এখন ঐ পাহাড়টার কাছে যেতে পারো সিরিল।.....

এইভাবেই খুনটা সংগঠিত হয়েছিলো, কতোই না সহজ ছিলো সেই খুন। কিন্তু তারপর থেকেই স্মরণ করতে চেষ্টা করলো সেদিনের সেই ঘটনাটা...

আর নয়। সামনেই মৃত্যুর হাতছানি....

বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করে চেয়ারের ওপরে উঠে দাঁড়ালো সে। ঘুমের ঘোরে, হাঁটার মত আধবোজা চোখে ছাদের দিকে তাকালো সে।...আশ্চর্য, তার হাত একটুও কাঁপলো না দড়ির ফাঁসটা নিজের গলায় পরিয়ে দিতে গিয়ে।

ঐ তো হুগো ওখানে দাঁড়িয়ে দেখলো, সে কি করলো, তাকে কি করতে হলো।

তারপর লাথি মেরে সে তার পায়ের তলা থেকে চেয়ারটা সরিয়ে দিলো.....

স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার স্যার টমাস লেগ উত্তেজিত হয়ে বললেন সমস্ত ব্যাপরটাই অবিশ্বাস্য।

জানি স্যার, শ্রদ্ধার সঙ্গে বললো ইন্সপেক্টর মেইন।

অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার বলে চলেন, একটা দ্বীপে দশ দশটা মানুষ মারা গেলো, আর একজনও কেউ জীবিত রইলো না, আমার মাথায় কিছুই আসছে না।

অবিশ্বাস্য হলে, জোর দিয়ে বললো ইন্সপেক্টর মেইন, এটাই ঘটনা স্যার।

ও সব কথা রাখো। তেমনি উত্তেজিত হয়ে বললেন স্যার টমাস, কেউ না কেউ নিশ্চয়ই তাদের খুন করেছে।

সেটাই তো আমাদের সমস্যা স্যার।

ডাক্তারের রিপোর্ট থেকে কোনো হদিশ পাওনি?

না স্যার। ওয়ারথ্রেভ আর লম্বার্ড গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছে। মিস ব্লেন্ট ও মাস্টার্ন মারা গেছে সাইনাইডের তীব্র বিষক্রিয়ায়। আর মিসেস রগার্স মারা গেছে অতিরিক্ত ঘুমের পিল খেয়ে, রগার্সের মাথাটা তার ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন। ব্লোরের মাথাটা কোনো ভারী জিনিসের আঘাতে খেতলে গেছে। জলে ডুবে মারা গেছে আর্মস্ট্রং। পিছন থেকে কোনো

ভারী জিনিসের আঘাতে ম্যাকআর্থারের মাথার খুলি ভেঙ্গে যায়। আর তাতেই তার মৃত্যু হয়। আর সব শেষে গলায় দড়ির ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে থাকবে ভেরা ক্লেথার্ন।

যতো সব নোংরা ব্যাপার। মিনিট দুই চুপ করে থেকে উত্তেজিত স্বরে আবার বলে উঠলেন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার, তার মানে তুমি বলতে চাও, স্টিকলহ্যাভেনের লোকজনের কাছ থেকে কোনো সাহায্যই পাওনি তুমি? খোঁজ নিয়ে দ্যাখো, তারা নিশ্চয়ই কিছু না কিছু জানে।

সাধারণ মানুষ তারা, কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে ইন্সপেক্টর মেইন, সমুদ্রে বেড়াতে ভালোবাসে। তারা শুধু জানে, ওয়েন নামে একজন লোক ঐ দ্বীপটা কিনে ছিলো, এর বেশী কিছু নয়।

তা ঐ দ্বীপটা কে দেখাশোনা করে, আর কেই বা এ সব ব্যবস্থা করে থাকে?

মরিস, আইজ্যাক মরিস নামে একজন লোক।

এ ব্যাপারে তার কি অভিমত?

কিছুই সে বলতে পারবে না স্যার, কারণ সে তখন মৃত।

ঐ কুচকে উঠলো অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনারের, এই মরিস লোকটা সম্পর্কে তুমি কিছু জানো?

হ্যাঁ স্যার, তাকে আমরা জানি। খুব একটা ভদ্র নয় সে। বছর তিনেক আগে সেই বেনিটোজের শেয়ার কেলেকারীর ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে সে, আমরা নিশ্চিত জানতাম, সে জড়িত ছিলো, কিন্তু আমরা সেটা প্রমাণ করতে পারিনি। তারপর ডোপের কারবারে মিশে যায় সে। সেক্ষেত্রেও তার বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ আমরা খাড়া করতে পারিনি। জানেন স্যার, মরিস খুবই সাবধানী লোক।

আর এখানেও এই দ্বীপটা সংক্রান্ত ব্যাপারেও মরিস জড়িত ছিলো?

হ্যাঁ স্যার, এই দ্বীপটা বিক্রীর সঙ্গে সেও জড়িত, যদিও তৃতীয় পক্ষের হয়ে নিগার দ্বীপটা সে কিনেছে, সেটা পরিস্কার করে দিলেও ক্রেতার নাম সে প্রকাশ করেনি।

আর্থিক দিক থেকে সে কতো বেশী বলীয়ান সেটা আগে জানতে হবে, বুঝলে?

হাসলো ইন্সপেক্টর মেইন। আপনি মরিসকে চেনেন না স্যার। দেশের সব থেকে ভালো একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টকে দিয়ে তার হিসাবের খাতাপত্র পরীক্ষা না করে দেখলে তার আর্থিক অবস্থাটা সঠিক জানা যাবে না। বেনিটোজ কারবারের তদন্ত করতে গিয়ে আমরা দেখেছি, তার কর্মচারীরা তাদের মালিকের মতোই চতুর ও ধুরন্ধর।

ইন্সপেক্টর মেইন বলে চলে, স্টিকলহ্যাভেনের সব ব্যবস্থাই করে এই মরিস লোকটা তাদের বলে, এই নির্জন দ্বীপে মানুষ বসবাসের পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতে যাচ্ছে তারা

এক সপ্তাহের জন্য । আর সে তাদের এও বলে সেখান থেকে কোনো সাহায্যের আবেদন এলে তারা যেন নজর না দেয় ।

অস্বস্তিবোধ করলেন স্যার টমাস লেগ, তার মানে তুমি বলতে চাইছো সেই সব লোকগুলো তার ঐ ধরনের কথায় একটুও সন্দেহ প্রকাশ করেন নি । তার সবকথা তার এক কথায় বিশ্বাস করে নিলো?

ভুলে যাচ্ছেন স্যার, আগে এই নিগার দ্বীপের মালিক ছিলেন একজন আমেরিকান যুবক এলমার বোরসন । সেখানে তিনি প্রায়ই একটা না একটা পার্টি দিতেন । সেই সব পার্টি দেখতে দেখতে তাদের গা সওয়া হয়ে গিয়েছিলো । তাই তারা ধরে নিয়েছিলো, বিভবানের ব্যাপারে তাদের মাথা না ঘামানোই উচিত । আর এই কারণেই বোধহয় মরিসের সেই উপদেশ শুনে কোনো সন্দেহ জাগেনি তাদের মনে । এদিকটার কথাও আপনাকে ভেবে দেখতে হবে স্যার ।

তার যুক্তিটা মেনে নিলেন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার ।

মেইন আরো বলে, ফ্রেড নারাকট তার লঞ্চে করে এই দশজন লোককে সেই দ্বীপে পৌঁছে দিয়ে যান । সেই নারাকট একটু অদ্ভুত কথা শুনিচ্ছে । সে বলেছে, সেই লোকগুলোকে দেখে একটু আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলো সে । মিঃ বোরসনের পার্টির লোকদের মতো ঠিক নয় । লোকগুলো কেমন সরল ও সাধারণ মানুষের মতো, মনে হয়েছিল তার, সেই সঙ্গে একটা চিন্তাও জেগেছিলো, তার মনে । আর বোধহয় সেই কারণেই বোধ হয়

এস. ও. এস সিগনাল পাওয়ার পরেই মরিসের সব উপদেশ উপেক্ষা করে একটুও দেবী না করে সে তার লঞ নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলো নিগার দ্বীপের দিকে।

সে আর অন্য লোকে কবে সেখানে গিয়েছিলো?

এগারো তারিখ সকালে স্টিকলহাভেন একদল স্কাউটের চোখে পড়ে সেই সংকেত। সেইদিন যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা ছিলো না। তাই বারো তারিখের আগে সেই দ্বীপে যাওয়া সম্ভব হয়নি।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার জিঙ্কস করলেন, প্রাসাদে যে গ্রামোফোন রেকর্ডটা তুমি পেয়েছিলে, সেটার কি খবর? ওটা থেকে কোনো ক্লু কিংবা সাহায্য পেলে না?

উত্তরে ইন্সপেক্টর মেইন বলে ওটা নিয়েও আমি মাথা ঘামিয়েছি। সেই রেকর্ডটা যে কোম্পানি সরবরাহ করেছিলো, তারা সিনেমা ও থিয়েটারের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম তৈরী করে থাকে। রেকর্ডটা আইজ্যাক মরিসের ঠিকানায় মিঃ ইউ. এন. ওয়েনের কাছে পাঠিয়ে দেয় তারা। তাদের বলা হয়েছিলো সখের থিয়েটারে সেই রেকর্ডটা নাকি ব্যবহার করা হবে। টাইপ করা স্ক্রিপ্টটা রেকর্ডের সঙ্গেই ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

লেগ জিঙ্কস করলেন, তা সেই রেকর্ডটার বিষয়বস্তুই বা কি ছিলো?

সেই প্রসঙ্গে আম আসছি স্যার, গম্ভীর হয়ে বললো ইন্সপেক্টর মেইন। গলা পরিস্কার করে আবার বলতে শুরু করলো সে, সমস্ত অভিযোগের ব্যাপারে যতদূর সম্ভব আমি খোঁজখবর নিয়েছি। প্রথমে রগার্স দম্পতিদের কথা দিয়েই শুরু করা যাক। ওরাই সর্ব প্রথম সেই দ্বীপে এসে পৌঁছায়। আগে ওরা মিস ব্র্যাভির বাড়িতে কাজ করে? মিস ব্র্যাভি হঠাৎ মারা যান। তার চিকিৎসকের কাছ থেকে তেমন কিছুই জানা যায়নি। সে বলে, রগার্স দম্পতি অবশ্যই তাকে বিষ খাওয়ানি। কিংবা সেরকম কিছু করেনি, কিন্তু তার ব্যক্তিগত বিশ্বাস হলো, মিস ব্র্যাভির হঠাৎ মৃত্যুটা কেমন যেন একটু গোলমালে হয়তো তাদের তরফ থেকে অবহেলা করার দরুণই তার অসময়ে মৃত্যু ঘটে। সে আরো বলে, তবে এই অভিযোগ প্রমাণ করা অসম্ভব ব্যাপার।

এরপর বিচারপতি ওয়ারথের প্রসঙ্গে আসা যাক। তিনি ছিলেন বিচারপতি, ঠিক আছে। তার এই বিচারপতিই সিটনের মৃত্যুদণ্ডদেশ দিয়েছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে, সিটন ছিলেন প্রকৃত অপরাধী, তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করার মধ্যে কোনো ভুল নেই। ফাঁসির পরে অবশ্য সেটা নিয়ে কথা ওঠে, কিন্তু তার আগে সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে দেখা যায়, তার অপরাধ ছিলো সন্দেহাতীত। তখনকার সময়ে দশজন লোকের মধ্যে নজনেরই ধারণা ছিলো, সিটন ছিলো নিরপরাধ। এবং বিচারপতির রায়টা ছিলো প্রতিহিংসা নেওয়ার জন্য।

ক্লেথর্ন মেয়েটির খোঁজখবর নিতে গিয়ে আমি দেখেছি। সে ছিলো একটি পরিবারের গভর্নেস, আর সেই পরিবারের একজন জলে ডুবে মারা যায়। সেই শিশুটিকে স্নান করাতে নিয়ে যায় সে সমুদ্রে। যাই হোক, এর জন্য তাকে অবশ্য দোষ দেওয়া যায় না।

সত্যি কথা বলতে কি ভালো আচরণই করেছিলো সে শিশুটির সঙ্গে তাকে উদ্ধার করার জন্য সাঁতার কেটে এগিয়েও গিয়েছিলো সে। কিন্তু তার দুর্ভাগ্য সমুদ্রের ভয়ঙ্কর স্রোতের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে নি সে, ভেসে গিয়েছিলো শিশুটি।

বলে যাও, দীর্ঘশ্বাস ফেললেন অ্যাসিসট্যান্ট কমিশনার।

হাঁপিয়ে উঠেছিলো মেইন বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে সেই আবার বলতে শুরু করলো, এবার ডঃ আর্মস্ট্রং এর কথা বলি। বহু পরিচিত লোক তিনি। হারলে স্ট্রীটের চেম্বারে তার ভালো পসার ছিলো। তিনি তার পেশায় কোনো অবৈধ কাজকর্ম যে করেছিলেন, সে রকম কোনো রেকর্ড নেই। তবে এ কথা সত্যি যে, ১৯২৫ সালে লেইখামার হাসপাতালে ক্লিজ নামে একটি মেয়েকে অপারেশন করেছিলেন তিনি, অপারেশন টেবিলেই মারা যায় সে। হয়তো তার খুব বেশী অভিজ্ঞতা না থাকার দরুণ অপারেশনে তেমন দক্ষ ছিলেন না তিনি প্রথম জীবনে, তবে এর জন্য কখনোই তাকে অপরাধী হিসাবে সাব্যস্ত করা যায় না। আর অবশ্যই এই মৃত্যুর পিছনে তার কোনো মোটিভ খুঁজে পাওয়া যায় না।

তারপরে মিস্ এমিলি ব্লেন্টের প্রসঙ্গে আসা যাক। বেট্রিস টেইলর নামে এক যুবতী কাজ করতো তার বাড়ীতে। গর্ভবতী হয়ে পড়ে মেয়েটি অবৈধ প্রণয়ে। তাকে বাড়ি থেকে বিতাড়িত করলেন মিস্ ব্লেন্ট, সে তখন জলে ডুবে আত্মহত্যা করলো। ব্যাপারটা ভালো না হলেও মেয়েটির মৃত্যুর জন্য কোন ক্রমেই অভিযুক্ত করা যায় না তাকে।

মেইন তার তালিকা দেখে পড়তে শুরু করলো, তরুণ মাস্টারন ছিলো বেরোয়া গাড়ি চালক। দু-দুবার ড্রাইভিং লাইসেন্স বাতিল করে দেওয়া হয়েছে, আমার মতে তার গাড়ি চালানো নিষিদ্ধ করে দেওয়া উচিত। তার শাস্তি এ রকমই হওয়া প্রয়োজন। কেম্ব্রিজের রাস্তায় দুটি বাচ্চা ছেলে জন কোম্ব ও লুসি কোম্বাসকে চাপা দেয় সে। তার স্বপক্ষে তার কয়েকজন বন্ধু বান্ধব সাক্ষ্য দেয় আদালতে, আর তাতেই জরিমানার হাত থেকে রেহাই পেয়ে যায় সে।

ওদিকে তদন্ত করে জেনারেল ম্যাকআর্থারের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ পাওয়া যায় নি। চমৎকার তার সার্ভিস রেকর্ড। আর্থার রিচমন্ড তার অধীনে কাজ করতো, যুদ্ধক্ষেত্রে মারা যায় সে। জেনারেলের সঙ্গে তার কোনো বিরোধ ছিলো না। সত্যি কথা বলতে কি তারা দুজন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলো।

তা হতে পারে, বললেন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার।

এখন ফিলিপস লম্বার্ডের কথায় আসি। বিদেশে সন্দেহভাজন লোকদের সঙ্গে তার মেলামেশা ছিলো। জেলও খেটেছে বার দুয়েক। ভয়ঙ্কর ছিলো না, একটু বেরোয়া স্বভাবের লোক ছিলো সে। সেই সঙ্গে তার একটু অহঙ্কারও ছিলো। তার পক্ষে খুন জখম করাটা অস্বাভাবিক নয়।

তারপর ব্লোর-এর কথা বলি, একটু ইতস্ততঃ করে মেইন বলে দশজনের একমাত্র সেই বাকী থাকে।

ব্লোর। জোর দিয়ে বললেন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার, সেই শয়তানটা না?

আপনিও কি তাই মনে করেন স্যার?

সব সময়েই আমি তাই মনে করি, বললেন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার, লোকটা দারুন ধুরন্ধর। ধরা ছোঁয়ার বাইরে। আমার ধারণা ল্যান্ডরের মামলায় তার কোনো কারচুপি ছিল নিশ্চয়ই। সেই সময় খুব একটা খুশি হতে পারিনি আমি। আবার আমার কিছু করারও ছিলো না। হ্যারিসকে কাজে লাগালাম। কিন্তু সেও কোনো কাজ করতে পারলো না। কিন্তু তখনো আমার বিশ্বাস, তাকে ধরার মতো ঠিক মতো ফঁদ পাততে পারলে, ও ভাবে সে আমাদের কলা দেখিয়ে পার পেয়ে যেতে পারতো না। সহজ প্রকৃতির লোক ছিলো না সে। একটু থেমে জিজ্ঞেস করলেন স্যার টমাস লেগ, তুমি বলছো আইজ্যাক মরিসও মারা গেছে? তা সে কবে মারা গেলো?

ভেবেছিলাম, আপনি নিশ্চয়ই এ প্রসঙ্গে আসবেন স্যার। হ্যাঁ ৮ই আগস্ট রাতে মারা যায় সে। অতিরিক্ত ঘুমের পিল খাওয়ার দরুনই তার মৃত্যু ঘটে। তার সেই মৃত্যুটা আত্মহত্যা, নাকি দুর্ঘটনা ঠিক বোঝা যায় না।

আমার কি ধারণা জানো মেইন?

সম্ভবত আন্দাজ করতে পারি স্যার।

আর যাই হোক, দারুন উত্তেজিত হয়ে বললেন লেগ, মরিসের মৃত্যুতে একজনের খুব সুবিধে হয়েছে।

মাথা নেড়ে তার কথায় সার দিয়ে বললো ইন্সপেক্টর মেইন, আমি জানতাম স্যার, আপনি ঠিক এই কথাই বলবেন।

টেবিলের ওপর ঘুমি মেরে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার বলে উঠলেন উত্তেজিত হয়ে সমস্ত ব্যাপারটাই অদ্ভুত অবিশ্বাস্য। পাহাড়ে ঘেরা একটা ছোট দ্বীপে দশজন লোক মারা গেলো, অথচ আমরা জানতেও পারলাম না, এর জন্য দায়ী কে, কিংবা কেনই বা হত্যা করা হলো, আর কি ভাবেই বা।

কেশো গলা পরিস্কার করে বললো মেইন, ভালো কথা স্যার, ব্যাপারটা আসলে ঠিক সেই রকম নয়। একজন বিকারগ্রস্ত লোক নিজের হাতে বিচারের ভার তুলে নিলো। আইনের চোখে ধরা ছোঁয়ার বাইরে এমনি দশজন লোককে সংগ্রহ করে সে তারা প্রকৃত অপরাধী নাকি নিরপরাধ, তাতে কিছু এসে যায় না।

স্থির চোখে তাকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বললেন লেগ, তাই নয় কি? আমরা তাই মনে হয়—

চুপ করে গেলো মেইন। সম্মান দেখানোর জন্য তামাশা করতে থাকলো সে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নাড়লেন লেগ।

বলে যাও বললেন তিনি এক মিনিট, ভাবলাম বুঝি বা কোনো ক্ল পেয়ে গেলাম। হারিয়ে গেলো সেটা, বলল, কি যেন বলেছিলে তুমি?

মেইন আবার বলতে শুরু করলো, ধরে নেওয়া যাক, দশজন লোকের বিচার হওয়ার কথা ছিলো। ইউ. এন. ওয়েন তার কাজ শেষ করে যে ভাবেই তোক সেই দ্বীপ থেকে হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়ে থাকবে।

এ যে দেখছি চমৎকার ভোজবাজির খেলা। কিন্তু তুমি তো জানো মেইন, এর একটা ব্যাখ্যা থাকা চাই, যুক্তি থাকা চাই।

স্যার আপনি হয়তো ভাবছেন, লোকটা যদি দ্বীপে না গিয়েই থাকে তাহলে তার সেই দ্বীপ থেকে তার উদ্ধাও হয়ে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। অথচ সেখানকার স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সেই দ্বীপে আদৌ সে যায় নি। অতএব এর একমাত্র ব্যাখ্যা হলো, খুনি ঐ দশজনের মধ্যেই একজন।

মাথা নাড়লেন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার। আন্তরিক ভাবে বলতে থাকে মেইন

হ্যাঁ, সে কথাও আমরা ভেবেছি স্যার। আমরা এর গভীরে প্রবেশ করার চেষ্টা করেছি। শুরুতেই বলে রাখি, নিগার দ্বীপে ঠিক কি ঘটেছিল, এ ব্যাপারে আমরা একেবারে অন্ধকারে পড়ে নেই। ভেরা ক্লেথার্ন ডায়েরী লিখতো এবং এমিলি ব্লেন্টও। বৃদ্ধ ওয়ারথ্রেভ

কিছু নোট লিখে যায়-রসক ঘীন, আইন মাফিক, রহস্যজনক, তবে যথেষ্ট সহজবোধ্য। এবং ব্লোরও কিছু নোট লিখে ছিলো। তবে এই সব ডায়েরী ও নোটের অধ্যুগলোর মধ্যে মোটামুটি ভাবে মিল আছে একটার সঙ্গে একটার। মৃত্যুগুণো হয়েছিলো এই ভাবে, মাস্টার, মিসেস রগার্স, ম্যাকআর্থার, রগার্স, মিস ব্লেন্ট, ওয়ারথ্রেভ। ভেরা ক্লেথনের ডায়েরী থেকে আমরা জানতে পারি, রাতের অন্ধকারে প্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে যায় আর্মস্ট্রং তারপর তাকে অনুসরণ করে ব্লোর ও লম্বার্ড তার খোঁজে। ব্লোরের নোটবইতে একটা নোট লেখা ছিলো, স্রেফ দুটি অক্ষরে-আর্মস্ট্রং নিরুদ্দেশ।

স্যার, এখন সব দিক বিবেচনা করে এর থেকে মনে হয়, এখানে আমরা একটা ভালো সমাধান খুঁজে পেতে পারি। আপনার মনে আছে, জলে ডুবে মারা যায় আর্মস্ট্রং। ধরে নিলাম, আর্মস্ট্রং তখন পাগল হয়ে যায়-হওয়ারই তো কথা, সবাইকে অমন নৃশংস ভাবে খুন করলেও কারোরই বা মাথার ঠিক থাকে বলুন। আর আর্মস্ট্রং খুনী হলেও সেও তো রক্ত মাংসে গড়া মানুষ। তাই মাথা ঠিক না থাকার ফলে বিবেকের দংশনে পাহাড়ের চূড়া থেকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে থাকবে, কিংবা সমুদ্রে সাঁতার কেটে সে তার দেশে পালিয়ে আসতে গিয়ে গভীর জলে তলিয়ে গিয়ে থাকবে। আর তাতেই তার মৃত্যু ঘনিয়ে এসে থাকবে।

সমাধানের সূত্রটা ভালো, কিন্তু ধোপে টিকবে না। না, স্যার তা হয় না। প্রথমেই পুলিশ সার্জেন্টের সাক্ষ্য দেখুন। ১৩ই আগস্টের সকালে সেই দ্বীপে গিয়ে হাজির হয় সে। আমাদের সাহায্যে লাগাতে পারে এমন বিশেষ কোনো তথ্য আমরা দেখতে পাই না। তার রিপোর্টে তার বলার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো তাদের সবার মৃত্যু ঘটে কম করেও

অন্তত ছত্রিশ ঘণ্টার মধ্যে। তবে আর্মস্ট্রং সম্পর্কে একেবারে নিশ্চিত সে। সে বলেছে, আর্মস্ট্রং এর দেহ জলে ভেসে যাওয়ার আগে আট দশঘণ্টা জলের মধ্যে ছিলো সে। এর থেকে এখন ধরে নেওয়া যেতে পারে রাত দশটা এগারোটায় সময় প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে গিয়ে থাকবে আর্মস্ট্রং, কেন এমন হলো। দেহটা যেখানে ভেসে যায়, সেই জায়গাটা আমরা দেখেছি দুটো পাথরের মাঝখানে মৃতদেহটা আটকে গিয়ে থাকবে, সেখানে তার পোষাকের কিছু অংশ, চুল ইত্যাদি ছড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। ১১ তারিখের রাত এগারোটা নাগাদ মৃতদেহটা নিশ্চয়ই সেখানে ভেসে এসে থাকবে সামুদ্রিক ঝড়ের টানে। তারপর ঝড় থেমে যায়, সমুদ্রের উত্তাল ঢেউও তখন শান্ত স্তিমিত, আর জলও তখন সমুদ্র তীর থেকে অনেক নিচে নেমে গিয়ে থাকবে।

আপনি হয়তো বলতে পারেন, এটা আমার ধারণা, সমুদ্রে যাওয়ার আগে তিনজনকে শেষ করে গিয়ে থাকবে আর্মস্ট্রং। কিন্তু তা নয় এই যুক্তিতে যে, সমুদ্রের ধার থেকে আর্মস্ট্রং এর মৃতদেহ অশান্ত সমুদ্র থেকে টেনে তুলে নিয়ে আসা হয় ওপরে। নরম বালির ওপর তার মৃতদেহ টানাটানির স্পষ্ট দাগ আমরা দেখেছি বালির ওপর। অতএব একটা ব্যাপারে আমি একেবারেই নিশ্চিত, আর্মস্ট্রং এর মৃত্যুর পর একজন কিংবা দুজন অবশ্যই জীবিত ছিলো তখন।

একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলো সে; আর এর থেকে ঠিক কি মনে হয় জানেন স্যার ১১ তারিখের সকালের অবস্থা এইরকম-আর্মস্ট্রং নিরুদ্দেশ (জেলে ডুবে যায়)। তখনও তিনজন লোক বেঁচে ছিলো; লম্বার্ড, ব্লোর এবং ভেরা ক্লেথার্ন। লম্বার্ড গুলিবিদ্ধ, তার মৃতদেহ আর্মস্ট্রং এর কাছে সমুদ্রের ধারে পড়ে ছিল। ভেরা ক্লেথার্নকে তার

শয়নকক্ষে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলতে দেখা যায়। রোর এর মৃতদেহ উঠানে পড়ে থাকত দেখা যায়, তার মাথাটা খেঁতলানো ভারী পাথরের আঘাতে হবে হয়তো, আর পাথরটা যে ওপরের জানালা গলিয়ে ফেলা হচ্ছেছিল সেটা অনুমান করে নেওয়ার স্বপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি আছে।

তা সেটা কার ঘরের জানালা? সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার।

ভেরা ক্লেথর্নের। এখন স্যার, তাদের প্রত্যেকের ব্যাপারটা আলাদা আলাদা ভাবে বিশ্লেষণ করা যাক। প্রথমে ফিলিপ লম্বার্ড থেকে শুরু করছি। ধার নেওয়া যাক মিস ক্লেথনের ঘরের জানালা গলিয়ে পাথর ফেলে রোরকে হত্যা করেছে লম্বার্ড। তারপর ভেরাকে ঘুমের পিল খাইয়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন করে তার গলায় ফাঁস লাগিয়ে দেয়। সবশেষে সমুদ্রতীরে গিয়ে নিজেই নিজেকে গুলিবিদ্ধ করে থাকবে।

কিন্তু তাই যদি হয়, তার কাছ থেকে রিভলবারটাই বা কে নিয়ে গেলো? কারণ প্রাসাদের দোতলায় ওয়ারথের ঘরের ভেতরে রিভলবারটা পড়ে থাকতে দেখা যায়।

রিভলবারের ওপর কার হাতের ছাপ ছিলো?

হ্যাঁ, স্যার ভেরা ক্লেথর্নের।

কিন্তু লম্বার্ড তখনো জীবিত ছিলো—

স্মার, আপনি কি বলতে চাইছেন জানি, ভেরা ক্লেথই খুনী এই তো। লম্বার্ডকে গুলিবিদ্ধ করার পর রিভলবারটা হাতে নিয়ে প্রাসাদে ফিরে যায় সে, মার্বেল পাথরটা ব্লোর এর ওপর নিক্ষেপ করার পর নিজে সে তার গলায় ফাঁস লাগায়।

এই পর্যন্ত সব ঠিক আছে। তার শয়নকক্ষে একটা চেয়ারের ওপর শ্যাওলার ছাপ পাওয়া যায়, এবং তার জুতোতেও দেখে মনে হয়, সে তার গলায় ফাঁস লাগিয়ে বুলে পড়ার জন্য সেই চেয়ারটা ব্যবহার করে থাকবে। চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে গলায় ফাঁস লাগানোর কাজ শেষ হওয়ার পরেই পা দিয়েই চেয়ারটা সরিয়ে দেয় এবং বুলে পড়ে সে।

কিন্তু চেয়ারটা ছুঁড়ে ফেলার মতো অবস্থায় ছিলো না। অন্য সব চেয়ারগুলোর মতো সেই চেয়ারটাও সময়ে দেওয়ালের পাশে হেলান দিয়ে রাখা ছিলো। ভেরা ক্লেথনের মৃত্যুর পরে সেই কাজটা অন্য কেউ করে থাকবে।

এরপর স্বভাবতই আমাদের সব সন্দেহ গিয়ে পড়ে ক্লোরের ওপর। তবে এর মধ্যেই একটা কিন্তু থেকে যায়, আপনি যদি বলেন, লম্বার্ডকে গুলি বিদ্ধ করে ভেরা ক্লেথনকে আত্মহত্যা করতে প্ররোচিত করার পর প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে যায় সে, তারপর উঠোনে নেমে একটা ভারী মার্বেল পাথরের আঘাতে নিজেই নিজেকে হত্যা করেছে সে। সেক্ষেত্রে আপনার কথা আমি বিশ্বাস করবো না। আপনার এ যুক্তি আমি মেনে নিতে পারি না। কারণ পুরুষরা এভাবে কখনো আত্মহত্যা করতে পারে না। তাছাড়া সে

ধরনের মানুষই ছিলেন না ব্লোর। ব্লোরকে আমরা বেশ ভালো করে জানি ন্যায় বিচার নিয়ে মাথা ঘামানোর মতো লোক সে কোনদিনও ছিলো না।

এ ব্যাপারে, বললেন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার, আমি তোমার সঙ্গে একমত।

ইন্সপেক্টর মেইন তখন বলে, তাহলে স্যার, এর থেকে ধরে নেওয়া যেতে পারে, ঐ দ্বীপে নিঃশব্দই অন্য আর কেউ তখন জীবিত ছিলো। সমস্ত ব্যাপারটা শেষ হয়ে যাওয়ার পর যে কিনা সব কিছু ভালো করে সাজিয়ে গুছিয়ে রেখে গেছে। কিন্তু এখন কথা হচ্ছে, এতো সব ঘটনা ঘটে যাওয়ার সময় কোথায় ছিলো সে, আর কোথায়ই বা যেতে পারে সে? অথচ স্টিকলহাভেনের লোকেরা সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে, উদ্ধারকারী দল সেই দ্বীপে পৌঁছানোর আগে সেখানে থেকে কেউই চলে যেতে পারে না। কিন্তু সে ক্ষেত্রে আবার থামলে সে এখানে।

সেক্ষেত্রে, জিজ্ঞেস করলেন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার, কি হতে পারে?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা দোলালো সে। তারপর সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললো, কিন্তু সে ক্ষেত্রে কে, কে তাদের খুন করলো?

এমমা জেন জেলে ডিঙির মালিক স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে যে মূল্যবান নথিটি পাঠিয়েছিল সেটা এখানে তুলে ধরা হলো।

যৌবনের শুরু থেকেই আমি বুঝে গেছি, আমার প্রকৃতি রাশি রাশি বিতর্কে ভরা। তাহলে প্রথম থেকেই শুরু করি, সংশোধনের অসাধ্য একটা রোমান্টিক ভাবপ্রবণতা। এই যে বোতলবন্দী করে একটা অতি প্রয়োজনীয় নথি সমুদ্রে ফেলে দেওয়া, এর মধ্যে একটা অদ্ভুত রোমাঞ্চ ছিলো, ভেতরের অভিযানের কাহিনী গুলো, যখন কেউ পড়বে তার সেই শিশুসুলভ মনোভাবটা কল্পনা করার মধ্যে একটা অন্য মাদকতা আমি অনুভব করতে পারছি। আমার মনে রোমাঞ্চ জাগায় আর সেই কারণেই আমি অবলম্বন করি এই পন্থাটা স্বীকারোক্তি লেখা, সেটা বোতলবন্দী করা, পরে বোতলের মুখটা সীল করে সমুদ্রের ঢেউতে ভাসিয়ে দেওয়া। আমার ধারণা আমার এই স্বীকারোক্তি কারোর না কারোর হাতে গিয়ে পড়বে। (আবার নাও পড়তে পারে) এবং তারপর (কিংবা আমি কি নিজেই নিজের ঢাক পেটাচ্ছি?) মানুষ নিগার দ্বীপে সেই অনির্ণীত হত্যা রহস্যের ব্যাখ্যা খুঁজে পাবে।

রোমান্টিকতার সঙ্গে আরো একটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমি জন্মাই। মৃত্যু দৃশ্য দেখা কিংবা মৃত্যু ঘটানোর মধ্যে অবশ্যই আমার একটা পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার প্রবণতা ছিলো, সেই নিষ্ঠুরতার মধ্যে একটা অদ্ভুত রোমা অনুভব করতাম আমি তখন। মনে আছে ছেলেবেলায় বাগানের পোকা মাকড় মেরে দারুণ মজা পেতাম। সেই ছেলেবেলা থেকেই খুনের নেশায় পেয়ে বসলো আমাকে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা বৈপরীত্যও এসে ভর করলো আমার সেই খুনের নেশার মধ্যে। ন্যায় বিচারের একটা বলিষ্ঠ প্রবণতা দেখা দিলো। নিরপরাধ ব্যক্তি আমার হাতে প্রাণ

হারাবে, এ যেন ভাবাই যায় না। সব সময় আমার চিন্তা ছিলো সত্যিকারের দোষী ব্যক্তির যেন শাস্তি হয়।

আমার মনে হয়, একজন মনস্তত্ত্ববিদ ঠিক বুঝতে পারবে, আমার মানসিকতা ঠিক কিরকম ছিলো সেই সময়। আর সেই মানসিকতাই কি পরবর্তী কালে আইনকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করতে সাহায্য করেছিল আমাকে। নিজেকে একজন পেশাদার আইনজ্ঞ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরে সহজাত প্রবৃত্তির দিক থেকে যথেষ্ট সন্তুষ্ট হলাম।

কোনো অপরাধ আর সেই অপরাধের শাস্তি সব সময় আমাকে মুগ্ধ করতো। সব রকমের গোয়েন্দা ও থ্রীলার গল্প পড়ে আমি উপভোগ করি। অবসর সময়ে নিজের ঘরে বসে একা একা বিচিত্র সব খুনের পরিকল্পনা করতাম।

তারপর যখন আদালতের আইন কার্যকর করার মহান দায়িত্ব আমার ওপর ন্যস্ত হলো, তখন আমার মনের সেই সুপ্ত পাশব প্রবৃত্তির আরো বেশী করে চরিতার্থ করার প্রেরণা পেলাম। বেচারী অপরাধী আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে মৃত্যু ভয়ে কাঁপছে, বিচারকের মুখ থেকে তার আসন্ন মৃত্যুর পরোয়ানা শোনার জন্য বিচারকের মুখের দিকে গভীর আগ্রহ নিয়ে প্রতীক্ষা করে থাকার দৃশ্যটা দেখে আমি খুব মজা পেতাম। তবে মনে রাখবেন নিরপরাধ কোনো ব্যক্তিকে আসামীর কাঠগড়ায় দেখলে আমি কখনোই খুশী হতে পারতাম না। অন্তত এ ধরনের দুটি মামলার শুনানী মূলতুবি রেখে জুরিদের আমি বলেছি, আজ কোনো কেস নেই। যাই হোক, পুলিশের সততা এবং দক্ষতার জন্য আমি

তাদের ধন্যবাদ জানাই বেশীর ভাগ অপরাধী যাদের বিচারের জন্য আমার সামনে হাজির করা হতো, তারা সবাই দোষী সাব্যস্ত হয়।

এই রকমই একটা কে ছিলো এডওয়ার্ড সিটনের। লোকটার সুন্দর চেহারা এবং সুন্দর ভদ্র আচরণ জুরিদের ভুল পথে চালিত করে এবং প্রভাব ফেলে তাদের মনে। কিন্তু কেবল মাত্র সাক্ষ্য প্রমাণেই নয়, অপরাধ জগতে আমার দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, লোকটা সত্যি সত্যি অপরাধ করেছে, খুনী না হয়ে যেতে পারে না সে। তার বিরুদ্ধে আনা খুনের অভিযোগ মিথ্যে নয়, একজন বয়স্ক মহিলাকে খুন করে সে, যিনি বিশ্বাস করতেন তাকে।

ফাঁসুড়ে বিচারক হিসাবে আমার খ্যাতি বা দুর্নাম ছিলো একটা সে যাই হোক, মামলার সব দিক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করে তবেই আমি আমার শেষ রায় জানালাম, আমার বিচার ছিলো অত্যন্ত কঠোর, কোনো অপরাধীকেই আমি রেহাই দিতাম না। আমাদের অনুভূতিপ্রবণ, উকিল ব্যারিস্টারদের সওয়াল জবাবে জুরিরা যাতে বাধিক্যে কাতর না হয়ে পড়ে, কিংবা আসামী পক্ষের উকিল যাতে তাদের প্রভাবিত করতে না পারে, তার জন্য সব রকম চেষ্টা চালিয়ে যেতাম। এর জন্য আমি তখন প্রকৃত ঘটনা ও সাক্ষ্য প্রমাণের প্রতি জুরিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতাম, তাতে কাজ হতো, ওরা তখন আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠতো, তাদের স্বাভাবিক মতামত ব্যক্ত করতে, অপরাধীর মতামত ব্যক্ত করতো, অপরাধীর সম্পর্কে আইনের সুবিচার করতো।

বেশ কয়েক বছর থেকে নিজের মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করি, নিজের প্রতি আস্থা, নিয়ন্ত্রণ সব যেন হারিয়ে ফেলছিলাম, তখন আমার কেবলি ইচ্ছা হতো, বিচারের প্রহসন ছেড়ে দিয়ে নিজের হাতে আইন তুলে নিতে, নিজের খুশিমত অপরাধীকে শাস্তি দিতে।

আজ আমি অকপটে স্বীকার করছি, আমি চেয়েছিলাম, নিজেই একটা খুন করি। এ যেন নিজেকে প্রকাশ করার জন্য, স্বীকৃতি লাভের জন্য শিল্পীর সেই চিরন্তন চাওয়া, চেষ্টা করলে অপরাধ জগতে আমিও একজন শিল্পী হতে পারি। কিন্তু আমার সব জল্পনা কল্পনা অনুমান প্রচণ্ড ভাবে ধাক্কা খেলো আমার বিবেকের কাছে, আমার পেশার কাছে। বিচারকের কি খুনী হওয়া সাজে?

তবু মন মানে না। কেবলি তাগিদ খুন, হা খুন আমাকে করতেই হবে। তার থেকেও বড় কথা হলো, সে খুন যেন সাধারণ না হয়। সে খুন অবশ্যই যেন অদ্ভুত হয় একটু বিচিত্র ধরনের, সাধারণের থেকে একটু আলাদা রকমের। কিন্তু আমার বিবেক আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয়, ন্যায়বিচার যেন হয়। নিরপরাধ কেউ যেন অযথা শাস্তি না পায়।

তারপর হঠাৎ, হা হঠাৎই একদিন সেই খুনের পরিকল্পনাটা আমার মাথায় এলো। একজন চিকিৎসকের সঙ্গে কথা হচ্ছিল আমার, একজন অনামী ডাক্তার কথায় কথায় বললো সে, এমন এক একটা খুন আছে, কোনো আইনই স্পর্শ করতে পারে না খুনীকে।

তার জানা একটা উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি বললেন, হঠাৎ তার এক রোগিনী মারা গেলেন। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হতো তার। নিশ্বাসকার্য স্বাভাবিক করার ওষুধ নাকে

শৌকাতে গিয়ে একটু অবহেলা করার দরুনই এই মৃত্যু। ওষুধ দিয়েছিল এক দম্পতি, তারই দেখাশোনা করতো সেই বৃদ্ধা মহিলাটিকে। বৃদ্ধা মারা যাওয়ায় কিছু টাকা তারা পেয়েছে। কেবল মাত্র এই মোটিভকে কেন্দ্র করে তাদের দোষী হিসাবে চিহ্নিত করা যায় না। হয়তো অভিযোগ উঠতে পারে, ওষুধ শৌকাতে গিয়ে একটু অবহেলা হয়ে গেছে, তা এমনতো হতেও পারতো তিনি নিজে খুঁকতে গিয়েও। এই অজুহাতেই রেহাই পেয়ে গেলো দম্পতিটি। আইনের ধরা ছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেলেন তারা।

সেটাই হলো সমস্ত ব্যাপারটার সূত্রপাত। সহসা দেখতে পেলাম, আমার পথ পরিষ্কার। আমি তখন বন্ধপরিকর একটা খুন নয়, এক সঙ্গে অনেক অনেকগুলো খুন। ছেলেবেলায় সেই কবিতাটির কথা আমার মনে পড়ে গেল দশটি কালো নিগার ছেলের কবিতা।

শুরু হলো গোপনে অপরাধীদের সংগ্রহ করা.....

কি ভাবে সংগ্রহ করা হলো, সেই বিস্তারিত বলে অস্থা সময় নষ্ট করবো না। কারোর সঙ্গে দেখা হলে একটা নির্দিষ্ট রুটিন মাফিক কথাবার্তা বলার রেওয়াজ ছিলো আমার। এভাবে একটা বিস্ময়কর ফল পেয়ে গেলাম। নার্সিং হোমে থাকার সময় ডঃ আর্মস্ট্রং এর কেসটা পেয়ে গেলাম। যে নার্সটি আমার দেখাশোনা করতো, তার সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে সে আমায় খবর দিলো, ডঃ আর্মস্ট্রং ছিলো মাতাল, মদ্যপ। একদিন মাতাল অবস্থায় একজন রুগীকে অপারেশন করতে গিয়ে মেরে ফেলে সে। ব্যস পেয়ে গেলাম আর একজন অপরাধীর নাম।

ক্লাবে একদিন পুরনো মিলিটারির খোশগল্প শুনতে গিয়ে জেনারেল ম্যাকআর্থারের অপরাধ কাহিনী শুনলাম। সম্প্রতি আমাজন ফেরত একজন নোক লম্বার্ডের অপরাধ কাহিনী শোনাল। ম্যাজোরকায় এক রাগী মেমসাহেবের মুখ থেকে পিউরিটান এমিলির কাহিনী শুনলাম। আর আন্টনি মাস্টার্স হলো আমার নিজের আবিষ্কার, যেমন করে আর পাঁচজন অপরাধীকে খুঁজে বার করা হয়। জীবন সম্পর্কে তার কোনো দায়িত্ববোধ ছিলো না, সে ছিলো সম্পূর্ণ অপদার্থ। এ ধরনের লোককে আমি সমাজে অত্যন্ত বিপজ্জনক বলে মনে করি, এর বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই। প্রাক্তন ইন্সপেক্টর ব্লোর স্বাভাবিকভাবেই এসে যায় আমার অন্বেষণ পথে। ল্যান্ডর কেসের মামলার ব্যাপারে আইনের পেশায় নিযুক্ত আমার কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে আলোচনার ফাঁকে ব্লোর-এর নামটা ওঠে। পুলিশ হচ্ছে আইন ও শৃঙ্খলার বাহক, পেশাগত মর্যাদায় পুলিশের কথাই শেষ কথা এবং সত্য বলে ধরে নেওয়া হবে। কিন্তু পুলিশের লোক হয়েও ব্লোর ছিলো মিথ্যা ভাষণের প্রতিভূ। তাকে ক্ষমা করা যায় না।

অবশেষে পাওয়া গেলোলা ভেরা ক্লেথনের কেস। আমি তখন আটলান্টিক পাড়ি দিচ্ছি। একদিন গভীর রাতে ধূমপান করে আমি ও হুগো হ্যামিল্টন নামে একটি সুদর্শন যুবক বসে আছি। পরিচয় হলো যুবকটির সঙ্গে। যুবকটির জীবন মোটেই সুখের নয়। সে তার দুঃখ ভুলতে মাত্রাতিরিক্ত মদ গিলেছিল। ফলের খুব একটা আশা না করেই শুরু করলাম কথাবার্তা। তার সঙ্গে তার কথা শুনে আমি তো অবাক। এখনো মনে আছে তার সেদিনের সেই কথাগুলো। সে বলেছিলো, আপনি ঠিকই বলেছেন। খুন মানেই বেশীর ভাগ লোকে যা ভাবে ঠিক তা নয়, খাবারে আর্সেনিক মিশিয়ে দেওয়া কিংবা উঁচু পাহাড় থেকে কাউকে ঠেলা মেরে ফেলে দেওয়া। সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে পড়ে আমার দিকে

এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে আরো সে বলে, আমি একজন নারী খুনীকে চিনি, আমি আপনাকে বলছি? তাকে আমি বেশ ভাল করেই জানি। আরো কি জানেন, এক সময় তাকে পাওয়ার জন্য আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। ঈশ্বর আমাকে সাহায্য করুন। বলছি বড় দুর্ভাগ্যই বটে। জানেন, কম বেশী আমার জন্যই অমন নিষ্ঠুর কাজ সে করেছিল...তবে তাই বলে এই নয় যে, আমি কখনো সে রকম স্বপ্ন দেখেছিলাম নারী মাত্রই শয়তান দানবী পুরোপুরি দানবী একজন চমৎকার, সাদাসিধে হাসিখুশীতে ভরা মেয়েকে আপনি দানবী হিসেবে চিন্তাই করতে পারেন না, পারেন কি? সেই নারী একদিন এক দুধের শিশুকে স্নান করাতে নিয়ে গেলো এবং আমাকে পাওয়ার জন্য তাকে জলে ডুবিয়ে হত্যা করলো একজন নারী যে এমন একটা নিষ্ঠুর কাজ করতে পারে, আপনি চিন্তা করতে পারেন?

আমি তাকে বললাম, আপনি নিশ্চিত, এ কাজ সে করেছে?

হ্যাঁ আমি একেবারে নিশ্চিত, উত্তরে সে দৃঢ়স্বরে বলে কেউ তা ভাবেওনি। কিন্তু আমি জানি ফিরে এসে আমি যখন তার দিকে তাকালাম.....সে তখন বুঝে গেছে, আমি তার সব ছলাকলা বুঝে গেছি তবে সে কথা উপলব্ধি করতে পারেনি তা হলো সেই নিষ্পাপ শিশুটিকে আমি ভালবাসতাম.....।

তারপর সে আর কিছু বলেনি, তবে যেটুকু সে বলেছিল, তাতেই যথেষ্ট, এ পর্যন্ত যে সব তথ্য সংগ্রহ করেছি আমার পরিকল্পনার রূপরেখা টানা তখন আটকায় কে।

তখন দরকার আমার দশম শিকার। পেলাম তাকে, নাম তার মরিস। কুখ্যাত লোক সে। আফিম কৌকেনের ঢালাও, চোরাই ব্যবসা তার। আমার এক বন্ধুর মেয়েকে আফিম কৌকেনের নেশায় আসক্ত করে ফেলে সে। মাত্র একুশ বছর বয়সে আত্মহত্যা করে মেয়েটি।

আমার এই পরিকল্পনার ব্যাপারে অন্বেষণ চালানোর সময় ধীরে ধীরে সেটা আমার মনের মধ্যে গাঁথে যায় পাকাপাকি ভাবে। আমার প্ল্যান তখন সম্পূর্ণ। বাস্তবে সেটা রূপায়িত করার আগে গেলাম একদিন হারলে স্ট্রীটে এক ডাক্তারের কাছে চেক আপ করানোর জন্য। আমি তাকে বললাম, আগেই আমার একটা অপারেশন হয়ে গেছে। শুনে সেই ডাক্তার বলে তাহলে আপনার দ্বিতীয়বার অপারেশন অর্থহীন। আমার চিকিৎসক খোলাখুলি ভাবে আমাকে জানিয়ে দিলেন একটা অপ্রিয় সত্য কথা হা, এই রকমই একটা সত্য ভাষণ শুনতে অভ্যস্ত আমি।

আমার সিদ্ধান্তের কথা আমি ডাক্তারকে বলিনি যে, আমার মৃত্যু যেন ধীরে ধীরে বিলম্বিত না হয়, আমি চাই স্বাভাবিক মৃত্যু। না আমার মৃত্যু হওয়া উচিত কোনো এক উত্তেজনা মুহূর্তে। মৃত্যুর আগে আমি বাঁচতে চাই।

এখন আসল কাজ হলো নিগার দ্বীপে অপরাধ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা। সেই দ্বীপটা সংগ্রহ করার কাজে মরিসকে ব্যবহার করা খুবই সহজ ব্যাপার। এ সব ব্যাপারে একজন বিশেষজ্ঞ সে। আমার সাম্ভাব্য যে কজন শিকারের খবর সংগ্রহ করেছিলাম তাদের প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা টেপে ফেললাম। আমার কোনো প্ল্যানই ভেঙে যায় নি।

আমার সব অতিথিরাই আটাই আগস্ট এসে হাজির হলো নিগার দ্বীপে। আমিও মিশে গেলাম তাদের দলে।

এখানে আসার আগেই মরিসের সব হিসেব নিকেশ হয়ে গিয়েছিল। পেটের অসুখে ভুগছিল সে। লগুন ত্যাগ করে আসার আগে আমি তাকে একটা ক্যাপসুল দিয়ে বলি, আমার নিজের গ্যাস্ট্রিক পেনে যথেষ্ট উপকার পেয়েছি এই ক্যাপসুল ব্যবহার করে। দ্বিধাহীন চিন্তে যে সেটা গ্রহণ করে নেয়। একটু স্নায়ুবিদ রোগাগ্রস্ত লোক সে। লোকটা যে এ ব্যাপারে কোনো নথিপত্র রেখে যেতে পারে, সে রকম ভয় আমার ছিলো না। সে ধরনের লোকই নয় সে।

নিগার দ্বীপে কার বিরুদ্ধে কি রকম মৃত্যুর পরোয়ানা জারি করা হবে, এ নিয়ে আমি বিশেষ চিন্তা ভাবনা করেছিলাম। আমার অতিথিদের অপরাধের তারতম্য বিচার করে আমি ঠিক করে ফেলি, যার অপরাধ সব থেকে কম, তাকে আগে মরে যেতে হবে, কারণ আমি চাই না মৃত্যু ভয়ে অহেতুক বেশী মাথা ঘামাক সে, আর একটা ঠাণ্ডা মাথায় খুনের জন্য আতঙ্কে সিটকে উঠুক সে।

অ্যান্টনি মাস্টার্ন এবং মিসেস রগার্সকে সবার আগে মরতে হলো, একজন সঙ্গে সঙ্গে আর একজন ঘুমের মধ্যে শান্তিতে। মাস্টার্নকে আমি জানি, নৈতিক দায়িত্ববোধ বলতে তার কিছু ছিলো না। যা আমাদের সবারই আছে। মিসেস রগার্স, আমার কোনো সন্দেহ নেই, তার স্বামীর প্ররোচনায় অভিনয় করতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি।

তারা দুজন কি ভাবে মৃত্যুর মুখোমুখি হলো, বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই না এখানে। এ কাজ পুলিশের, সহজেই অবিস্কার করতে পারবে তারা। বাড়ির পোকা মাকড় মারার জন্য অতি সহজেই পটাশিয়াম সায়ানাইড সংগ্রহ করা যায়। সংগ্রহের কিছু অবশিষ্ট ছিলো আমার সঙ্গে। গ্রামাফোনে সেই সব ভয়ঙ্কর উক্তিগুলো উচ্চারিত হওয়ার পর অতিথিদের মনে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, সেই ফাঁকে প্রায় একটা খালি গ্লাসে একটু পটাশিয়াম সায়ানাইড ফেলে রাখি।

সেই সময় আমি আমার প্রতিটি মুখের দিকে তাকিয়ে নিরীক্ষণ করেছিলাম। এবং আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে আমার কোনো সন্দেহ ছিলো না, প্রত্যেকেই অপরাধী।

ইদানীং আমার মাথার যন্ত্রণার দরুণ ঘুমের ওষুধ ক্লোরাল হাইড্রেট খেতে হতো আমাকে, আর সেই ট্যাবলেট আমার কাছেই ছিল। রগার্স যখন তার অসুস্থ স্ত্রীর জন্য ব্র্যান্ডি নিয়ে এসে টেবিলের ওপর রাখে। সেখান দিয়ে যেতে গিয়ে ব্র্যান্ডির গ্লাসে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিই, তাতেই কাজ হয়ে গেলো। রগার্সের স্ত্রীর ঘুম আর ভাঙলো না। ব্যাপারটা খুব সহজেই মিটে গেলো, সেই সময় কারোর মনে কোনো রকম সন্দেহই জাগলো না।

নিঃশব্দে মৃত্যু এসে বললো জেনারেল ম্যাকআর্থারকে এবার তোমার পালা। না, কোনো জ্বালা যন্ত্রণা ছিলো না সেই মৃত্যুতে। তবে টেরেস ছেড়ে চলে যাওয়ার সময়টা খুব সাবধানে বেছে নিতে হয়েছিল আমাকে, কিন্তু সব কিছুই সফল হয়েছিল।

আমার অনুমান মতো খুনির সন্ধান সারাটা দ্বীপ তন্ন তন্ন করে খোঁজা হলো, এবং আবিষ্কার করা হলো, আমরা সাতজন ছাড়া অন্য আর কেউ ছিলো না। সঙ্গে সঙ্গে একটা সন্দেহের আবহাওয়া সৃষ্টি হলো নিগার দ্বীপে। আমার প্ল্যান মারফিক তখন আমার একজন সহকারীর প্রয়োজন হয়ে পড়লো। ডঃ আর্মস্ট্রংকেই বেছে নিলাম। ফাঁদে পড়ার মতো লোকই বটে সে। আমার নাম যশ এবং একবার চোখের দেখায় আমার চিন্তা সে। আমার মতো লোক যে খুনি হতে পারে সেটা ছিলো তার ধারণার অতীত। তার সব সন্দেহ গিয়ে পড়েছিল লম্বার্ডের ওপর। এবং তার এরকম একটা ধারণার প্রতি আমার যে সমর্থন ছিলো সেই রকম ভান করতে থাকি। আমি তাকে আভাষে জানালাম, খুনি কে হাতেনাতে ধরার একটা মতলব আমার মাথায় এসেছে।

প্রত্যেকের ঘরে তল্লাসি চালানো হলেও তাদের কারোরই দেহ তল্লাসি হয়নি তখনো পর্যন্ত।

দশই আগস্ট সকালে খুন করলাম রগার্সকে। উনুন জ্বালাবার কাঠ কাঠছিলো সে তখন পিছন ফিরে, তাই সেখানে আমার উপস্থিতি একেবারেই টের পায়নি, তার পকেটে খাবার ঘরের চাবির সন্ধান পেলাম।

রগার্সের দেখা না পেয়ে বিভ্রান্ত সবাই তার খোঁজে বেরিয়ে পড়তেই সেই সুযোগে অতি সন্তপণে লম্বার্ডের ঘরে ঢুকে তার রিভলবারটা হস্তগত করলাম। তার কাছে সেটা যে থাকার কথা আমি জানতাম। সত্যি কথা বলতে কি মরিসের সঙ্গে তার সাক্ষাতকারের সময় সে যেন এ ব্যাপারে সেরকম পরামর্শই দেয় তাকে।

ব্রেকফাস্টের সময় মিস্ ব্লেন্ডের কফির কাপে কফি ঢালতে গিয়ে ঘুমের ওষুধ ক্লোরালের শেষ ডোজটুকু মিশিয়ে দিলাম। খাবারঘরে তাকে রেখে আমরা বেরিয়ে এলাম। একটু পরেই সেখানে ফিরে গেলাম সে তখন প্রায় অচেতন্য, এর ফলে তাকে সায়ানাইড ইনজেকশন দেওয়াটা খুব সহজ হয়ে গেলো। মৌমাছি ওড়ানোর ব্যাপারটা নিছক একটা ছেলেমানুষী ছাড়া আর কিছু নয়। তবু আগেই বলেছি, ছেলেবেলায় পড়া সেই কবিতা দেখছেন না খুনগুলো আগাগোড়া কেমন কবিতার ছন্দ ও নিয়ম মেনে হয়ে আসছে। তা এক্ষেত্রেই বা তার ব্যতিক্রম হতে যাবে কেন?

ঠিক এর পরেই, কি ঘটবে আমি আগেই মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম। আমি নিজেই সেরকম একটা প্রস্তাব দিয়েছিলাম, আমরা সবাই কঠোর অনুসন্ধান চালানোর কথা বললাম। আগেই আমি সেই রিভলবারটা লুকিয়ে রেখেছিলাম নিরাপদ জায়গায়। সায়ানাইড কিংবা ঘুমের ওষুধ কোনো কিছুই আমার কাছে আর ছিলো না।

এরপর আমি নিজে উদ্যোগ নিয়ে বললাম আর্মস্ট্রংকে, এখুনি আমরা আমাদের মতলবটা কার্যকর করতে চাই। ব্যাপারটা খুবই সহজ, আমি নিজেই হবো পরবর্তী শিকার। সম্ভবত তাতে খুনির ওপর নজর রাখবো।

আর্মস্ট্রং খুব আগ্রহ দেখালো আমার সেই মতলবে। সেদিন সন্ধ্যায় অভিনীত হলো সেই অভিনব নাটক। কপালে সামান্য একটু লাল মাটির প্লাস্টার, একটা লাল পর্দা, এবং উলের একটা পোলো, তাতেই নাটক মঞ্চস্থ হলো। মোমবাতির মৃদু আলো বড় বেশী

কাঁপছিল, এবং অনিশ্চিতও বটে, খুব কাছ থেকে যে আমাকে পরীক্ষা করবে, সে হলো ডঃ আর্মস্ট্রং।

অতি নিখুঁত ভাবে কাজটা করে গেলো, মিস্ ক্লেথন তার ঘরের ঝুলন্ত শ্যাওলা দেখে চিৎকার করে বাড়ি মাত করে তুললো, অনেক চিন্তা ভাবনা করে তার ঘরে শ্যাওলা ঝুলিয়ে রেখে এসেছিলাম আগেই। তার চিৎকার শুনেই সবাই দোতলায় তার ঘরের উদ্দেশ্যে ছুটলো। এই সুযোগে রং টং মেখে খুনির পোজ দিয়ে ফেললাম।

কাল্পনিক মৃত অবস্থায় আমাকে দেখে তাদের মনে যে প্রতিক্রিয়া হলে সেটা ছিলো একান্ত কাম্য। পেশাদার অভিনেতার মতো অভিনয় করলো ডঃ আর্মস্ট্রং। তারা আমাকে ধরাধরি করে নিয়ে গেলো ওপর তলায়। আগেই আর্মস্ট্রং আমাকে পরীক্ষা করে তাদের জানিয়ে দিয়েছিল, আমি মৃত। তারা আমার মৃতদেহ আমার বিছানায় শুইয়ে দিলো। আমার ব্যাপারে কাউকেই চিন্তিত বলে মনে হলো না, তারা নিজেরা সবাই মৃত্যু ভয়ে আতঙ্কিত এবং সবাই এ ওর ভয়ে শঙ্কিত। ব্যবস্থা মতো রাত সোয়া দুটোর সময় আমি ও আর্মস্ট্রং মিলিত হলাম বাড়ির বাইরে। আমি তাকে কাছেই একটা পাহাড় চূড়ায় নিয়ে গেলাম। আমি তাকে বললাম, কেউ বাড়িতে প্রবেশ করলে আমরা এখান থেকে স্পষ্ট দেখতে পাবো, তবে বাড়ি থেকে কেউ আমাদের দেখতেও পাবে না। তবু তা সত্ত্বেও স্মরণ করিয়ে দিতে হবে তাকে, ছেলেবেলার সেই কবিতাটা যদি সে মনে রেখে থাকে। সিন্ধু পাখী হজম করলো একজনকে.....।

ব্যাপারটা ছিলো খুব সহজ। পাহাড়ের চূড়ার ধারে গিয়ে হঠাৎ আমি চিৎকার করে উঠে তাকাতে বললাম তাকে ঐ দেখ, ওটা একটা গুহা না? সঙ্গে সঙ্গে ঝুঁকে পড়লো সে। কাজটা দ্রুত সারাতে হলো। ভয়ঙ্কর একটা ধাক্কা দিলাম তাকে, সঙ্গে সঙ্গে ভারসাম্য হারিয়ে ফেললো সে এবং নিমেষে পাহাড়ের চূড়া থেকে তার ভারি দেহটা পড়লো নিচে। বাড়ি ফিরে এলাম। আমার শব্দ নিশ্চয়ই শুনে থাকবে ব্লোর। আর্মস্ট্রং এর ঘরে ফিরে আসার কয়েক মিনিট পরে আবার ফিরে চললাম, তার আগে বেশ কয়েবার পায়ের শব্দ করলাম যাতে কেউ না কেউ শুনতে পায়। সিঁড়িতে নামার পথে দরজা খোলার শব্দ হলো। সামনের দরজা দিয়ে বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় পিছন থেকে তারা নিশ্চয়ই অন্ধকারে আমার ছায়ামূর্তিটা দেখে থাকবে আমাকে আর্মস্ট্রং ভেবে।

তারা আমাকে অনুসরণ করছে দেখে তখন দেওয়াল ঘেঁষে পা টিপে টিপে বাড়ির পিছন দিকে এসে সাবধানে পাঁচিল টপকে খাবার ঘরের কাছে এলাম। জানালা আগে থেকে খুলে রেখেছিলাম। জানালা বন্ধ করে শার্সির কাঁচ ভেঙ্গে খাবার ঘরে ঢুকে পড়লাম। তারপর ওপরতলায় গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে যথারীতি আবার আমার বিছানায় শুয়ে পড়লাম মরার মতোন।

অনুমান করে নিলাম তারা আবার তল্লাসি চালাবে সারা বাড়িটায়, তবে আমার মনে হয় না, মৃতদেহগুলো খুব কাছ থেকে পরীক্ষা করে দেখবে। তবে হয়তো নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্য তারা মৃতের চাদর সরিয়ে দেখতে চাইবে, চাদরের আড়ালে আর্মস্ট্রং তার দেহটা ঢেকে রেখেছে কি না। আর ঠিক সেই রকমটিই ঘটতে দেখা গেলো।

হ্যাঁ, ভাল কথা, লম্বার্ডের ঘরে রিভলবারটা আবার রেখে দেওয়ার কথাটা বলতে একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। কারোর হয়তো জানার আগ্রহ হবে, সেটা কোথায় আমি লুকিয়ে রেখেছিলাম। বিস্কুটের টিনে ভর্তি ছিলো ভাড়ার ঘর। একেবারে নিচের একটা বিস্কুটের টিনের ঢাকনা খুলে রেখে দিই রিভলবারটা এবং ঢাকনা লাগিয়ে তাতে অ্যাডহেসিভ টেপ লাগিয়ে দিই।

লাল পর্দাটা লুকিয়ে রাখি ড্রইংরুমের একটা চেয়ারের আবরণের নিচে আর উলের গোলাটা লুকিয়ে রাখি চেয়ারের জর্দা কাটা ছোট একটা গর্তে।

এরপর আমার ছকে বাঁধা পরিকল্পনা মাফিক দেখলাম তারা তিনজনে প্রত্যেকে প্রত্যেকের ভয়ে দারুণ ভীত, সবাই সবাইকে সন্দেহ করেছে মনে মনে, কিন্তু কেউ কাউকে অপরাধী সাব্যস্ত করতে পারছে না, প্রমাণের অভাবে। তাদের মধ্যে একজনের হাতে আবার একটা রিভলবার। ঘরের জানালা দিয়ে আমি তাদের লক্ষ্য করলাম। ব্লোর যখন একা এদিক এগিয়ে এলো, আমি তখন একটা বড় সাইজের মার্বেল পাথরের টেবিল ক্লথ হাতে নিয়ে প্রস্তুত হলাম। এবার ওর যাওয়ার পালা, ওর আর বেঁচে থেকে কোনো লাভ নেই। একেবারে জানালার নিচে আসতেই ওকে লক্ষ্য করে মার্বেল পাথরের ঘড়িটা সজোরে নিক্ষেপ করলাম। অব্যর্থ লক্ষ্য, বিদায় নিলো ব্লোর, চির দিনের মতো...।

তারপর আমার জানালার সামনে দাঁড়িয়ে থেকেই দেখলাম, লম্বার্ডকে গুলি করলো ভেরা ক্লেথ, দক্ষ, তৎপর এবং দুঃসাহসী যুবতী। লম্বার্ড ও ক্লেথর্নকে একসঙ্গে দুজনকে মেলামেশা করতে দেখে সব সময় আমার মনে হতো, মেয়েটি যেন লম্বার্ডের বেশ

মানানসই। তবু সেই অপ্রিয় ঘটনাটা ঘটে যাওয়ার পরই আমার নাট্য মরে শেষ অভিনয়ের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য তৎপর হলাম। মঞ্চ সাজালাম ভেরার ঘরে।

এটা একটা মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা নিরীক্ষা। অবচেতন মনে ভেরার নিজের অপরাধের জন্য টেনশন ও নাভাসের ফলস্বরূপ হঠাৎ একজনকে গুলি বিদ্ধ করা তার আত্মহত্যার জন্য সম্মোহিত করার পক্ষে এ দুটি কারণই যথেষ্ট নয় কি? আমার ধারণা এমনটি হওয়া উচিত। এবং হলোও তাই, আমরা অনুমানই ঠিক ওয়ার ড্রোবের পাশে ছায়া ঘন আঁধারের সামনে দাঁড়িয়ে আমার চোখের সামনে ভেরা ক্লেথর্নকে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে পড়তে দেখলাম।

তখন বাকী রইলো মঞ্চের দৃশ্য। এগিয়ে গেলাম। ভেরার পায়ের তলা থেকে চেয়ারটা সরিয়ে দেওয়াল ঘেঁষে রেখে দিলাম। রিভলবারটার খোঁজ করলাম বাইরে এসে সিঁড়ির একেবারে ওপর ধাপের উপর, সন্ধান পেলাম সেটার। সেখানে রেখে দিয়েছিল ভেরা। রিভলবারের ওপর তার হাতের ছাপ রাখার জন্য সব রকম সতর্কতা অবলম্বন করলাম।

অতঃ কিম।

এই লেখাটা শেষ করবো। লেখাটা বোতলবন্দী করে সীমোহর আঁটতে হবে বোতলের মুখে, এবং তারপর বোতলটা সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে হবে।

আমার যতদূর ধারণা নিগার দ্বীপের রহস্যের সমাধান কখনো হবে না, রহস্যই থেকে যাবে চিরদিনের মতো, অবশ্য আমি জানি, পুলিশ আমার থেকেও চালাক, যাইহোক, এই সব খুনের তিনটি কু রয়েছে। একঃ পুলিশ বেশ ভাল করেই জানে, এডওয়ার্ড সিটন অপরাধী। অতএব তারা জানে, কোনো কারণেই দ্বীপের দশজন লোকের মধ্যে একজনও খুনী হতে পারে না এবং এর পরেই ধরে নিতে হয় যে, প্রচলিত মত বিরোধ থাকলেও অথচ যা সত্য তা হলো যুক্তিগ্রাহ্য হিসাবে সেই লোকটিই খুনী। দ্বিতীয় ক্লু নিহীত রয়েছে ছেলেবেলায় সেই কবিতার সপ্তম পংক্তিতে। আর্মস্ট্রং এর মৃত্যুর কারণ জলে ডুবে, সে ছিলো ভাল সাঁতারু, তবে মনে হতে পারে লাল সিঙ্কু পাখীর আক্রমণের টাল সামলাতে না পেরে জলে ডুবে তার মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু এটা কি একটা ভোজবাজী বা প্রতারণা নয় কি? হ্যাঁ, সে রকমই একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় তার মৃত্যুর মধ্যে-আর্মস্ট্রং প্রতারণা এবং মৃত্যুর কোলে ঠেলে দেওয়া হয় তাকে। আর এই কুকে কেন্দ্র করেই পুলিশী তদন্ত শুরু করা যেতে পারে। সেই সময় দ্বীপে মাত্র চারজন জীবিত ছিলো, আর সেই চারজনের মধ্যে একমাত্র আমিই সেই সম্ভাব্য ব্যক্তি যে কিনা আস্থার সঙ্গে তাকে গভীরে অশান্ত সমুদ্রে সাঁতার কাটার জন্য অনুপ্রাণিত করে থাকতে পারে। আর তৃতীয় সূত্রটা নিছকই সাংকেতিক। আমার কপালে মৃত্যুর পরওয়ানা আঁকা ছিলো। বুলেটের চিহ্ন। আমার কাল্পনিক চিহ্ন। আমার কাল্পনিক মৃত্যুটা কতটা বিশ্বাসযোগ্য পুলিশ একটু ভাল করে তদন্ত করলেই হয়তো প্রকৃত সত্য উদঘাটন করতে পারবে।

আমার মনে হয়, আরো একটু বলার আছে।

বোতলবন্দী আমার এই স্বীকারোক্তিটা সমুদ্রে নিক্ষেপ করার পর ফিরে যাবো আমার ঘরে এবং বিছানায় বিছিয়ে দেবো আমার দেহটা। আমরা চশমার ফ্রেমে সরু কালো ইল্যাস্টিক সুতো লাগানো থাকবে। সেই চশমার ওপর আমার দেহের সম্পূর্ণ ভার পড়ে থাকবে। সুতোর এক প্রান্ত দরজার হাতলে করে জড়িয়ে রাখবো রিভলবারে। এতে কি ঘটবে আমি কি ভাবছি জানেন।

রুমালে হাত জড়িয়ে নিয়ে আমি আমার কপালে তাক করে রিভলবারের ট্রিগার টিপবো। হাতটা আমার দেহের পাশে এলিয়ে পড়বে। ইল্যাস্টিকের পাশে এলিয়ে পড়বে। ইল্যাস্টিকের সুতোয় টান পড়বে, এর ফলে সুতোয় বেঁধে রাখা রিভলবারটা ছিটকে গিয়ে দরজার হাতলে আছড়ে পড়বে এবং সঙ্গে সঙ্গে সুতো বন্ধন মুক্ত হয়ে ছিটকে পড়ে যাবে। ইল্যাস্টিক সুতোটা তখন রিভলবার মুক্ত হয়ে নিরীহ হয়ে ঝুলতে থাকবে আমার চশমার ফ্রেমে। আর রুমালটা পড়ে থাকবে ঘরের মেঝের ওপর, কোনো মন্তব্য ব্যতিরেকেই।

আমার বিছানায় আমি আবিষ্কৃত হবো, আমার সহ শিকারদের মতো আমার মৃত্যুর কারণ নথীভুক্ত হবে কপালে গুলিবিদ্ধ হয়ে। আমার মৃতদেহ যখন পরীক্ষা করা হবে তখন মৃত্যুর সঠিক সময় নির্ধারিত হবে না।

ঝড় যখন থেমে যাবে তখন ওপারের মূল ভূখণ্ড থেকে নৌকো আসবে। আসবে লোকেরা এই দ্বীপে, এবং তারা আবিষ্কার করবে দশটি মৃতদেহ এবং নিগার দ্বীপের সমাধানের অযোগ্য একটি সমস্যা।

শ্রীমদ্‌দেবদেবী গুণজ নান । শ্রীমদ্‌দেবী গুণজ নান । উপন্যাস

স্বাক্ষর :

লরেন্স ওয়ারথেন ।